অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ।

সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

কলিকাতা,

২৯ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন "অর্চ্চনা-সমিতি" হইতে

সহকারী-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

আদি দম্পতী।

আদি নাই, অন্ত নাই, এক সীমাশূন্য প্রকাশ। মধ্যস্থলে আদি দম্পতী— ানে এই অর্দ্ধনারীশ্বর। কোথায় মধ্য? এই আকাশ, আদি নাই, ন্ত নাই, যেখানে দেখিবে, সেই স্থানই মধ্য। তখনও জল নাই, স্থল নাই, রতল নাই—শুধু প্রকাশ। চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, অগ্নি নাই, আছে এই াশ। এই প্রকাশ কিরূপ—তাহা প্রকাশ করিবে কে?

প্রকাশের মূর্ত্তি এই আদি দম্পতী। অগ্রে পুরুষ পরে প্রকৃতি। ইহারাই প্রেমিক। কেহ কাহারও অধীন নহে, কেহ কাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে অধীনতা স্বাধীনতা একত্র মিলিত হইয়াছে। মিলন দেহের হয় না—মিলন হয় ইচ্ছার। এক ইচ্ছা দুই দেহে খেলিতেছে। কোথাও বিরোধ নাই—দুই ইচ্ছার মিলনে এই আদি দম্পতী স্থির। চলন পর্য্যন্ত নাই। এক সীমাশূন্য জ্ঞান —এক সীমাশূন্য আনন্দ ইহাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিভোর। পুরুষ প্রকৃতি বোধ নাই—কে পুরুষ, কে প্রকৃতি কেহ যেন কাহাকেও দেখে নাই। পূর্ণ দর্শনে কিছুই দেখা হয় না। এক দিবিব আয়ত চক্ষু ঐরূপ দিবিব আয়ত চক্ষুপানে চাহিয়া আছে—চারিচক্ষু মিলিত হইয়াছে—কত আগ্রহে উভয় উভয়কে দেখিতেছে—অনন্তকাল ধরিয়া দেখি- তেছে যেন তবুও দেখা হয় নাই। মনে হয় কিছুই যেন দেখিতেছে না। শুধুই নীল নলিনাভ নয়ন যুগল আনন্দে ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হয় এক- দেখে নাই। পূর্ণ আনন্দে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়া থাকে না। তখ ক যখন আনন্দময় উপাস্য মূর্ত্তিতে তন্ময় হইয়া যায়, তখন পূর্ণ আপন দেখিয়াও দেখে না। যখন অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে,

অয়ি দেবি বেদমাতা বাণীবিধায়িনি!
বেদব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকি, হোমর
কেহ মুক্তা কেহ মণি রতন সম্ভারে
সাজায়েছে বরবপু। মধুর নিক্কনে
তাঁদের আহ্বান গীতি গগনে পবনে
ধ্বনিতেছে সারা বিশ্বে। সে চরণ তলে
দীন ভক্ত কয়জন উপনীত আজি—
গোটাকত ঝরা ফুল—দরিদ্র সম্বল—
নাহি গন্ধ, নাহি শোভা, ক্ষীণ কণ্ঠে গান—
তবু অঞ্জলির তরে আনিয়াছে তারা
বুকভরা আরাধনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আশা—
সসীম মানববক্ষে অসীম অনন্ত—
কায়মন তব অগ্রে দিবে বলিদান—
লহ মাগো লহ পূজা—দীনের অর্চ্চনা।

তখন প্রথমে কিছু বুঝিতেও পারে না। পরে অন্যের ইচ্ছা তাহার মধ্যে উদয় হইয়া উহার ইচ্ছা জাগ্রত করে। ব্যথিত সাধককে তাহার উপাস্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় অবহেলে তাহার উত্তর দেয়—কারণ তাহার, চক্ষুত উপাস্যের উপরেই আছে। ইচ্ছাশূন্য অবস্থায় সমস্ত ইচ্ছা আনন্দে ডুবিয়াছিল, যেমন কেহ জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরের ভ্রূ কত সুন্দর?" ইহার উত্তর দিতে তাহার আর কি বিলম্ব হইবে? এই অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান দুই থাকিলেও এক হইয়াছিল।

শুধু আনন্দ, শুধু প্রকাশ, কোন চলন নাই। অকস্মাৎ চলন হইল, অকস্মাৎ ইচ্ছা জাগিল—"অহং বহুস্যাম"। প্রকৃতি পুরুষের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রে হাসিল। পুরুষও প্রকৃতির দিকে ঘুরিল। এস্থানে অগ্রে প্রকৃতি পরে পুরুষ হইল। প্রথমকার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। স্বভাবও বদলাইল।

ছিল অগ্রে চৈতন্য পরে শক্তি—হইল অগ্রে শক্তি পরে চৈতন্য। ছিল উভয়েই প্রেমিক—ছিল স্বাধীনতা অধীনতার একত্র মিলন, হইল অধীনতা প্রবল। পুরুষ প্রকৃতির গোলাম হইয়া গেল। ছিল ঈশ্বর হইল জীব।

জীব প্রকৃতির দাস হইল। নিজের প্রেমিক ভাব একেবারে ভুলিল। প্রেমে গোলামি নাই। পুরুষ গোলামি করিল—কামুক হইয়া গেল—কামুক কামিনীর সন্তোষে ব্যস্ত—কামকিঙ্কর নিজ শক্তির হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা।

এতদিন কোনও অভাব ছিল না এখন শত অভাব জাগিল। কোনও ধনরত্ন আবশ্যক ছিল না এখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধনরত্নে কুলাইল না। কামুক কামিনীর দাস হইয়া কাঞ্চনের দাস হইল। বড় দুঃখী হইয়া গেল। আদি গৃহস্থ ভারী সংসার করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি আর পূর্ব্বের মত প্রকাশময়ী নহে।—আনন্দময়ী নহে। যখন কোন চলন ছিল না তখন বড় সুন্দর ছিল। সে রূপের বর্ণনা হয় না। কোনও খেলা থাকে না আপন গরবে আপনি দাঁড়াইয়া থাকে—আপন গরবও বুঝে না। কোন

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই—সব কথা বন্ধ ; যদি কথা কয় সে যেন কিসে জড়িত কথা—আধ ফোটা আধ ঢাকা আধ প্রকাশ আধ অপ্রকাশ—কথাও যেন একজনের নহে, কথাও অর্দ্ধনারীশ্বর।

কিন্তু এখনকার দৃশ্য অন্যরূপ। পুরুষের অগ্রে আসিয়া প্রকৃতি নিজের প্রেম ভুলিল—আগে পুরুষকে ভুলাইতে চাহিত না—উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আপনা হইতে ভুলিয়া থাকিত—হাসি, হাবভাব, থাকিয়াও ছিল না—দরকার হইত না। এখনও প্রকৃতি হাস্যময়ী কিন্তু সে হাস্য কামুককে ভুলাই-বার জন্য। এখনও প্রকৃতি হাবভাবময়ী কিন্তু সে হাবভাব গোলামকে চির-দিন গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য। বিচিত্র রচনা প্রকৃতি করিতে লাগিল—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বিচিত্র বেশ।—বেশভুষা শুধু পুরুষ ভুলাইতে—রমণী শত শত অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া রাখে শুধু পুরুষ ভুলাইতে—শত শত বিচিত্র বস্ত্রে সাজ সজ্জা করে, কামুক মাতাইতে। পুরুষও প্রকৃতি হইতে কাম শিক্ষা করিয়া কাম দিয়া কামিনীকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কামুক কখন কামিনী মোহিত করিতে পারে না। যে কামজয়ী পুরুষ, যে কামনা শূন্য পুরুষ, একদিন প্রকৃতিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—আজ আর কিছুতেই সে কামিনীর মন পাইল না, গোলামি করিয়াও মন পাইল না ; ইহাই পুরুষ প্রকৃতির বিকৃতি—আদি দম্পতীর স্বরূপ বিচ্যুতি। জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি।

সব গিয়াছে—সে প্রেম নাই—সে প্রকাশ নাই, আছে কেবল স্মৃতি। এই স্মৃতি অসময়ে উপকার করিল। জীব কিছুতেই সুখ পায় না। কতই করে প্রাণের তৃপ্তি মিলে না। সুখের আস্বাদন না থাকিলে কি কেহ সুখের জন্য লালায়িত হয়? সুখের আস্বাদন ছিল বলিয়াই আজ জীব দুঃখী। একদিন সুখ কি বুঝিয়াছিল, একদিন দশ ইন্দ্রিয় শূন্যে শূন্যে বাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকিত ইহা বুঝিয়াছিল, একদিন মন কোনও কামনা করিত না—একদিন চিত্ত বাসনায় ব্যাকুল ছিল না। একদিন সংযমী জীব প্রকৃতির সহিত জড়িত ছিল, প্রতি লোমকূপে রমণানন্দ অনুভব করিত—সে ইন্দ্রিয় যে অঙ্গ স্পর্শ করিত সেই

ইন্দ্রিয় সেই সেই অঙ্গেই জড় প্রায় পড়িয়া থাকিত—চক্ষু চক্ষুতে মিলিত—কোন চলন নাই, হস্ত গলদেশে জড়িত, কোন চঞ্চলতা নাই—আছে এক পূর্ণ আনন্দ। সে রূপে কোটি কাম পুড়িয়া মরিয়াছিল—জীব সেই সুখের দিন স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইল।

কিরূপে সেই অবস্থা লাভ হইবে জীব এই চিন্তায় ব্যস্ত। ক্রমে প্রকৃতি দেখিয়া ভয় পাইল—আর ভাল করিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিতে পারে না—কামভাবে শত লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়—প্রকৃতি দেখিয়া ভয় পায় পাছে স্ত্রী-পিশাচী রক্ত শোষণ করে। "দিনকা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী" কখন "পলক্ পলক্ লোহ চোষে," কখন এই বাঘিনী প্রাণে মারিয়া ফেলে, এই ভয়ে প্রকৃতি দেখিলে রাম রাম করিতে থাকে—সর্ব্বদা মা মা বলিয়া মা'র শরণ লইতে লাগিল। দেখিল মা মা বলিলে যেন এই কাম কতক দমিত হয়—অতিশয় প্রবল হইতে পারে না। জীব প্রকৃতি মাত্রকেই মা বলিতে শিক্ষা করিল। মা বলিয়া শরণাপন্ন না হইলে মুক্তি নাই ইহা বুঝিল।

জীবের প্রথম সাধনা মা বলিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসা। অনুরাগ ভজনের প্রথম-অঙ্গ কাত্যায়নী পূজা। ব্রাহ্মী স্থিতির প্রথম কার্য্য "যা হি শক্র মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং"।

মা বড়ই সুন্দর। একদিকে হস্তে অসি মুণ্ড—ভয়ভীত সাধকের কাম শত্রু বিনাশের চিহ্ন, অন্য দিকের হস্তে বর ও অভয় ভীত সাধককে অভয় দিয়া বর দিবার জন্য। একদিকে লোল রসনা বিকট দশন কামাসুরের রক্তপান জন্য। অন্যদিকে মা বড় আনন্দময়ী।

মা কত সুন্দর কে বর্ণন করিবে—শঙ্কর একদিন পাগল হইয়া বলিয়াছিল—

"অরুণাধরজিতবিম্বাং জগদম্বাং গমনবিজিতকাদম্বাং।
করুণায়ত সুকদম্বাং পৃথুলনিতম্বাং ভজেশ হেরম্বাং॥
শ্যামলিমসৌকুমার্য্যাং সৌন্দর্য্যানন্দসম্পতুন্মেষাম্।
তরুণিমকরুণাপূরাং মদজলকল্লোললোচনাং বন্দে॥
দয়মান দীর্ঘনয়নাং দৈশিকরূপেণ দর্শিকাভ্যুদয়াম্।
বামকুচনিহিতাং বীণাং বরদাং সঙ্গীতমাতৃকাং বন্দে॥

মা বড় করুণাময়ী, কাহাকেও উপেক্ষা করে না। মল-লুলিত বপু বালক পড়িয়া পড়িয়া যখন চীৎকার করে, মা ছুটিয়া আসিয়া একবারে সেই মল-লুলিত-বপু শিশুকে কোলে তুলিয়া লয়—একেবারে স্তনদুগ্ধ দিয়া শিশুকে শান্ত করে—শিশুর সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। এমন দয়া কার আছে? যাহারা মায়ের দয়া অনুভব করিয়াছে—তাহারাই বলিয়াছে—

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাতঘ্নী তৎসমা নহি।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥

যেমন উচিত হয় মা তাহাই কর—এও বুঝি বলিতে হয় না। মা সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী, আমি অজ্ঞান।—অজ্ঞানে কত কি করি, মা জানিয়াই সমস্ত ক্ষমা করে।

সে পূর্ণজ্ঞানময়ী। আমি মনে করি আমার কার্য্য বুঝি সে দেখিতে পায় না। তাকে ফাঁকি দিতে চাই, তাই আপনি ফাঁকে পড়ি। নতুবা যাহার চক্ষু আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, সে কি আমার কার্য্য দেখে না? আমি যদি শুধু মনে রাখি, আমি যদি শুধু বুঝিয়া দেখি যে সে সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন কি আমি আর কিছু অন্যায় করিতে পারি? অন্যায় না করিলেই আমার নিষ্কাম কর্ম্ম হয়। কেননা মা আমায় দেখিতেছে, আমি শুধু মাকে সন্তোষ করিবার জন্য কর্ম্ম করিতেছি। ইহাতেই আমার কর্ম্মবন্ধন ছুটিয়া যায়। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি তাহাকে বিস্মৃত হই, তখন প্রাণে বড় জ্বালা হয়।

লোকে বলে তারে কাতর হইয়া ডাকিতে হয়। হায়! আমি তার জন্য কতটুকু কাতর হইব? কিন্তু সে আমার জন্য সর্ব্বদা কাতর—কত কাতর বলাত যায় না। কেননা যে সব দেখিতে পায়, যে সব জানে, যার অনন্ত ভালবাসা, যার অনন্ত হৃদয়, সে যখন আমার কুপথে যাইতে দেখে, সে যখন দেখে আমি আপন দোষে শত শত যাতনা ভোগ করিতেছি, সে তখন আমার জন্য কতই ব্যাকুল হয়। যে সর্ব্বজ্ঞ—তাহারই ব্যাকুলতা অধিক। আমি যদি এইটুকু মনে

রাখি সে আমার জন্য বড়ই ব্যাকুল, আমি ভাল হইলে, আমি তার কাছে গেলে, তার সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়, তখন আমি বড়ই অস্থির হইয়া তাহার কাছে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে থাকি।

"ভালবাসার অনুভব" ইহার নাম ভক্তি। তাহার ভালবাসা অনুভব করিলে তারে ভক্তি না করিয়া কি থাকা যায়? ভগবান্! ভগবান্! ভগবান্! কোথায় ভগবান্? তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বে একবার তাহার স্বভাবটী আলোচনা করিতে হয়। সে সৎ, সে চিৎ, সে আনন্দময়ী। অপরিবর্ত্তনীয় কি কোথাও দেখিয়াছ? সব ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—ফুল শুকাইয়া যায় ও পত্র ঝরিয়া পড়ে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, মানুষ গরিব, হয়, ধনবান হয়, সুখী হয়, দুঃখী হয়—বালক হয়, বৃদ্ধ হয়, সুরূপ কুরূপ হয়। রাজ্য হয়, যায়, ধন আসে, যায়, জগৎ সৃষ্ট হয়, লয় হয়—কিন্তু পরিবর্ত্তন হয় না এমন কি বস্তু দেখিয়াছ?

আছে একটী বস্তু—এটী মা'র স্বভাব মা'র ভালবাসা এই ভালবাসার পরিবর্ত্তন নাই। ভালবাসার পরিবর্ত্তন যদি থাকিত তাহাকে ভালবাসা বলা যাইত না। ভালবাসা বস্তুই সৎ। ইহা পূর্ণ তথাপি প্রাণমেই যেরূপেই প্রকাশ হ'ক ইহা "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল"। এই ভালবাসা যাহার স্বভাব সেই তোমার উপাস্য, নমস্য। এই ভালবাসা যাহাতে ফুটিয়াছে সেই তোমার দেবমন্দির। জীব! তুমি ভালবাসা বস্তুটি বুঝিয়া দেখ, ইহাই সৎ ও ইহাই আনন্দ। কিন্তু ইহা হইলেও পূর্ণ হইল না। চিৎ অংশটুকু অনুভব করা চাই।

আর একবার সেই আদিদম্পতী সেই অৰ্দ্ধনারীশ্বর চিন্তা কর। চৈতন্যই দ্রষ্টা, জড় দৃশ্য। পুরুষ আপন প্রকৃতিকেই দেখে। এ ভিন্ন দর্শন নাই। পুরুষ আপন প্রকৃতিকে দেখিতেছে। যখন এই দেহ দেখিতেছ, সেখানে তুমি পুরুষ, তুমি চৈতন্য, এই দেহ জড়, ইহাই প্রকৃতি। চক্ষু একটা যন্ত্র মাত্র ইহাও প্রকৃতি, ইহাও পুরুষের দৃশ্য। পুরুষ ভিন্ন দ্রষ্টা কোথায়?—সাজে প্রকৃতি, পুরুষ সাজে না। পরিবর্ত্তন হয় জড়ের, চৈতন্য

অপরিবর্ত্তনীয়। তুমি চৈতন্য, তুমি পুরুষ, প্রকৃতিতে অভিমান কর বলিয়াই দুঃখী। প্রকৃতিকে অগ্রে করিয়াছ বলিয়াই দুঃখ। প্রকৃতির অগ্রে যাও প্রকৃতিকে বশ কর, আবার নিজের অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব প্রাপ্ত হইবে। দেখ শিবত্ব কিরূপ। স্থির হইয়া পুরুষ প্রকৃতির পদতলে দলিত হইতেছে; আপন হৃদয়ে প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে পুরুষ অচঞ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—বলপূর্ব্বক রোধ করিতে পারে না। আপন প্রকৃতিকে ছাড়িবারও শক্তিনাই। বিশালবক্ষ পাতিয়া শবের মত পড়িয়া রহিয়াছে যেমন দুষ্টা স্ত্রী স্বামীকে ভুলাইয়া কত কি করে সেইরূপ স্ত্রী, পুরুষের বক্ষের উপর বহির্মুখে ছুটিতেছে। কি যে সে তাণ্ডব—বর্ণনা করা যায় না। পুরুষ পদতলে দলিত হইয়া, প্রকৃতির হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া প্রকৃতির চিন্তাই করিতেছে। জীব যখন উগ্রভাবে প্রকৃতির চিন্তা করিতে পারিল, তখন অজ্ঞাতসারে আপনার দ্রষ্টাভাব, আপনার চৈতন্য স্বরূপ, ধীরে ধীরে জাগাইল। দ্রষ্টাভাবে পৌছিলে আপনার বল বৃদ্ধি হইল—ধারণা, ধ্যান সমাধিরূপ সংযম অভ্যস্ত হইল।

পুরুষের উগ্রচিন্তায় প্রকৃতির চমক হইল। এ চমকে প্রকৃতি বহির্মুখে ছুটিতে পারে না, এ চমকে অন্তর্মুখী হইল। চঞ্চলে স্থির দেখা দিল। কাজ করিতে করিতে করে না মনে হয় কে যেন টানিতেছে, কে যেন স্মরণ করিতেছে। পূর্ব্ববিস্মৃত অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব—পূর্ব্বের প্রেমবিভোরতা স্মৃতিপথে দেখা দিতে লাগিল। আকাশে বিদ্যুতের খেলার মত ঐ ভাবে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। প্রকৃতির এই ভাবে পুরুষেরও আনন্দ বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে প্রকৃতি আরও ধীর, আরও স্থির, আরও ব্যাকুল।

সহসা পদতলে দৃষ্টি পড়িল—"হরি হরি"! আমি একি করিয়াছি! আমার মনোভিরাম পুরুষ আজ পদতলে। লজ্জায় প্রকৃতি জড়সড় হইল। আপন লোলজিহ্বা কর্ত্তন করিল। কামিনী কুলবধূ হইল। আর পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আদি দম্পতী।

মধুর মুরলী। রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই মুরলী বাজিয়া উঠিল। এই প্রকৃতি মুরলী ধ্বনি শুনিয়া পাগলিনী। যমুনা মুরলীর রবে উজান বয়—গোপীকা এই বংশীর রবে কুল ত্যাগ করে। কোথা সংসার—আজ প্রকৃতি পুরুষের পশ্চাতে ছুটিল—কুলমান দৃষ্টি নাই গুরুগঞ্জনা চন্দন অঙ্গভূষা।

আবার কুলবধূ স্বামী পাইল—আবার আদি দম্পতী মিলিত হইল—অর্দ্ধনারীশ্বর একত্র হইল। প্রেমব্রত উদ্‌যাপন* হইল। জীব গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব ভুলিল—সেই সীমাশূন্য সুখ—সেই সীমাশূন্য আনন্দ—সেই আনন্দে সর্ব্ব সৃষ্টিব্যাপার ডুবিয়া রহিল। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি, ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই জীবন্মুক্তি।

এই জীবন্মুক্তি সকলের লক্ষ্য। তাই আজ এইজন্যই শক্তি পূজা। শক্তি পূজা না হইলে সচ্চিদানন্দের দর্শন মিলিবে না। শক্তিই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—ব্রহ্মবিদের সর্ব্বস্ব, ভিখারী শিবের হৃদয়লক্ষ্মী। শক্তি ছাড়া হইলেই শিব শব।

বেশী বলিবার নাই। আগেই তুমি—"তুমি তুমি" করিয়া তুমি হইলেই প্রকৃতি পুরুষের প্রেমমিলন। তখন জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। খেলা করে প্রকৃতি, দেখে পুরুষ। চলন হয় শক্তির—স্থির সেই জ্ঞান আনন্দময় পরমপুরুষ চৈতন্য। আনন্দে বহু নাই—প্রথমে সব লয় লইয়া গেল, রহিল প্রকৃতি, রহিল শক্তি—ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। শেষে শক্তি, শক্তি মনে মিশিল। রহিল সচ্চিদানন্দ পুরুষ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।
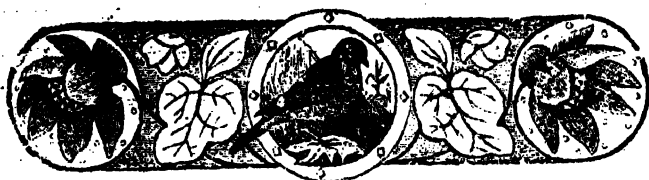
ভ্রম-সংশোধন।

(গল্প)

১

যখন পিতা বেণীমাধব পুত্র নলিনের, দরিদ্রকন্যা শান্তির সহিত বিবাহ না দিয়া অন্যত্র সম্বন্ধ স্থির করিলেন, তখন নলিন বিবাহ দিবসে বাটী হইতে পলাইবার সঙ্কল্প করিল। সে তাহার মনের অভিলাষ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিল না। আজ বিবাহের দিন উপস্থিত; পালাইবার জন্য নলিন প্রস্তুত হইয়াছে। মনে বড় ইচ্ছা একবার শান্তির সহিত দেখা করিয়া যায়। এই ভাবিয়া ধীরে-ধীরে তাহাদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কত পরিচিত পুষ্করিণীর ধারে ধারে, কত তাল এবং আম্র-বনের মধ্যদিয়া সে তাহার ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইল। যাহাকে দেখিবার জন্য এত লালসা সে যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া আপন গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিল।

শান্তি বলিল "নলিনদাদা, আজ তোমার বে, তুমি যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?"

নলিন বলিল "আমি বিয়ে কোর্‌ব না শান্তি, আমি বাড়ী হইতে পালাইতেছি।"

শান্তি বলিল "ছিঃ! নলিন দাদা ও কথা বলোনা বিয়েতে কত আহ্লাদ, ও কথা শুন্‌লে লোকে বল্‌বে কি।"

নলিন বলিল "আমার বিয়েতে কি তোমার আনন্দ হয় শান্তি?"

শান্তি। "হয় বই কি, আমরা টুকটুকে বউ দেখব।"

"তুমি ও কথা বলোনা শান্তি, তোমার জন্যই আমি গৃহ ছাড়িতেছি।"

বালিকা চমকিত হইল। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "সে কি নলিন দাদা আমি তোমার কি করিয়াছি?"

নলিন বলিল "কি করিয়াছ আমার, তাকি তুমি জাননা শান্তি? তবে শুন আমার প্রতিজ্ঞা যদি তোমার সহিত বিবাহ না হয় তবে জীবনে আর বিবাহ করিব না, আজিকার মত বিদায়;— আর কিছু না বলিয়া নলিন তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আরক্তিম মুখমণ্ডলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বালিকা শান্তি পথপানে চাহিয়া রহিল।

২

পানকৌটীর বোসেদের বাটী আজ মহাসমারোহ। বাবুর প্রথম মেয়ের বিবাহ, কাজেই জাঁকজমক কিছু বেশী। যে দিকেই দেখ মনে হইবে যেন আনন্দের উৎস উছলিয়া উঠিতেছে। সকলেরই মুখমণ্ডল সুখে উৎফুল্ল রহিয়াছে। কিন্তু মনোরমার মুখ এত মলিন কেন? বিয়ের কনে বিশেষত বাঙ্গালীর ঘরের ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা তাহার ত আনন্দে ফাটিয়া পড়িবার কথা।

কিন্তু "যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া পড়শীর ঘুম নেই" এমন হইল কেন? প্রকৃত কথা এই যে, হরেন্দ্র নাথ মনোরমাদের বাটীতে থাকিত। হরেন্দ্র মনোরমার ভ্রাতা রমেশের সমপাঠী; প্রথম শ্রেণীতে এম এ, পাশ করিয়া বি, এল পড়িতেছিল। মনোরমার ইচ্ছা হরেনের পত্নী হইবে। রমেশেরও তাহাই ইচ্ছা; কিন্তু পরগৃহ-পালিত নিঃস্ব যুবকের সহিত, মনোরমার পিতা মাতা আপনাদের প্রিয়তমা কন্যার অদৃষ্ট-বন্ধনে একান্ত মতবিরুদ্ধ ছিলেন।

কাজেই ধনীপুত্র নলিনের সহিত অদ্য তাহার বিবাহের কথা। হত-ভাগ্য হরেন্দ্র নীরবে সে দৃশ্য দেখিতেছিল। যে রমণীকে দেবীজ্ঞানে এত

দিন হৃদয়ের পূজা দিয়া আসিতেছিল আজ তাহাকেই হৃদয়ের পর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এতদিন যাহা হৃদয়ে জড়িত হইয়া আসিয়াছে একদিনে তাহা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করা কি অল্প আয়াস সাধ্য? হরেন পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কতবার নিভৃতে নয়নের নীর নয়নে মুছিতেছিল। দুইটী হৃদয় এইরূপ নিভৃতে রক্তসিক্ত হইতেছিল। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে, বুক ফাটিলেও মুখ ফুটাইবার উপায় ছিল না।

৩

রাত্রি দশটা। লগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়। সকলেই উদ্বিগ্ন। পুরোহিত কর্ত্তাকে বরের বাটীতে সংবাদ লইতে বলিলেন। বর পক্ষ হইতে সংবাদ আসিল যে, বরের হঠাৎ কলেরা হইয়াছে। আজ কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। হঠাৎ সেই আনন্দময় বিবাহবাসরে যেন একটী বিষাদের ছায়া পতিত হইল। বাটীর মধ্যে গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। কন্যাযাত্রীরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ বা গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইল। বোসজা মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বিবাহের সকল আয়োজন পণ্ড হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। সকলের মুখেই নিরানন্দের চিহ্ন বর্ত্তমান। কেবল একজনের মুখে আনন্দের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই একজন আর কেহই নহে, সে বসুজার প্রিয়তমা কন্যা "মনোরমা।"

* * * * * * * * * *

লগ্ন উত্তীর্ণ হইতে পাঁচ মিনিট বাকি—কর্ত্তা ডাকিলেন "রমেশ"—রমেশ আসিল। কর্ত্তা বলিলেন "তাইত রমেশ সব প্রস্তুত এখন করা যায় কি, বড়ই লোক হাঁসান হইল।" রমেশ বলিল "এক উপায় আছে আপনি যদি অনুমতি করেন ত বলি।" কর্ত্তা উৎসুকে কহিলেন "শীঘ্র বল রমেশ, তা না হইলে কুল মান রাখা দায় হইবে।" রমেশ,—"আমি বলি কি, আপনি হরেনের সহিত মনোরমার বিবাহ দিন।"

কর্ত্তা বলিলেন "তাইত রমেশ, চেষ্টা করে শেষে কি এই হ'ল, সকলই অদৃষ্ট; আমার ত আর মাথার ঠিক নেই। তুমি বাপু তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে যা হয় করে ফেল।"

তখন আর সময় ছিল না। কাজেই কঠোর ভবিতব্যে সকলকেই সম্মত হইতে হইল। সেই পূতলগ্নে প্রজাপতি দুইটী রক্তসিক্ত হৃদয় শাস্ত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। আনন্দের ক্ষীণরেখা উল্লাসে পরিণত হইল।

৪

ঠিক সেই দিবস সন্ধ্যাকালে পিতামাতাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া নলিন কলিকাতায় গমন করিলেন। দুই চারিদিন কলিকাতায় আসিয়া সঙ্গে যাহা ছিল সর্ব্বস্ব খরচ হইয়া গেল। অদৃষ্টের ফলে কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া ধনী-সন্তান নলিন উদরান্নের জন্য লালায়িত হইলেন। ভাগ্যক্রমে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আপনার দুঃখ জানাইয়া গৃহ-শিক্ষকের একটী চাকুরী পাইলেন। বরদা বাবু অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। নলিনকে বিশেষরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। নলিন তাঁহার ছোট ছেলেটিকে পড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে নলিনের দুঃখের দিন কাটিতে লাগিল।

৫

আজ বরদা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। নলিন আজ বড় ব্যস্ত। বিবাহের সকল কার্য্যই সে একলাই করিতেছে। বরদা বাবু সকল ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। উদারপ্রকৃতি বরদা বাবুর, পুত্রের বিবাহে, এক কপর্দ্দকও লইবার বাসনা ছিল না, অপিচ এক দরিদ্র কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য তিনি আপন ব্যয়ে কন্যার অভিভাবকগণকে কলিকাতায় আনাইয়া এক সুসজ্জিত বাটীতে রাখিলেন। তাঁহার এই উদারতায় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

* * * * * *

বিবাহ বাসরে খুব ঘটা। অতি সুন্দর কারু-কার্য্য-খচিত দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া সুন্দরশ্রী বর বিবাহসভা আলোকিত করিয়া বসিয়াছে। চারিদিক সুন্দর আলোক-মালায় ও সুরভি পুষ্পে শোভিত। মনে হইতে-ছিল যেন ইন্দ্র-সভায় এক মহাযজ্ঞের অধিবেশন হইতেছে। বলা বাহুল্য এ সকলি বরদা বাবুর খরচ এবং বরপক্ষের সকল সমারোহের অনুষ্ঠান-কারী আমাদের সেই নলিন। নলিনের আজ আর আনন্দ ধরে না, নলিনই সকলকে আদর অভ্যর্থনা করিতেছে ও মধুর বচনে আপ্যায়িত করিতেছে।

লগ্ন উপস্থিত। ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া বরকে স্ত্রী আচারের জন্য বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। বিবাহ সভায় সকলে উৎসুকনয়নে দণ্ডায়-মান রহিল। সকলেরই এক প্রতীক্ষা—কতক্ষণে বর নববধূকে লইয়া বিবাহ আসরে অধিষ্টান করিবে। সকলেই কন্যার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের কথা শুনিয়াছিল। এক্ষণে সেই রূপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বর যখন কন্যাকে লইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল, তখন কন্যার রূপ দেখিয়া সকলেই মোহিত হইল। নলিন অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কতক্ষণ তথায় উপস্থিত ছিল না। সে যখন ব্যগ্রভাবে বধূ দেখিতে আসিল তখন সম্মুখে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। সে দেখিল দিব্য স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী দিব্য রক্তাম্বরে বিবাহ সভা উজলিয়া রহিয়াছে। তাহার নয়নদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত। কেশকলাপ কুঞ্চিত ও সুচিকন, তাহার ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম ও নাসা সুগঠিত, ওষ্ঠাধর সুরক্তিম। তাহার বর্ণ বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি-সম্পন্ন, বাহুদ্বয় সুগোল, অঙ্গুলি চম্পককলি সদৃশ ও ক্ষুদ্র পদদ্বয় অলক্তকরাগরঞ্জিত। নলিন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন সে রূপ দেখিয়া তাহার তৃষা মিটিল না। যেন কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া সে সে রূপ দেখিয়াছে তথাপি নয়ন তৃপ্ত হইল না।

তাহার সমস্ত জীবনটুকু যেন নয়নে অধিষ্ঠান হইয়া সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিল। নলিনের সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল তাহার পদনিম্নে ধরাতল ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ সেই বিবাহবাসরে নলিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৬

বরদা বাবু বলিলেন "নলিন সে দিন তুমি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইলে কেন?" নলিন বলিল, আমার পূর্ব্বে মূর্চ্ছা রোগ ছিল।" বরদা বাবুর পুত্রের বিবাহের পর নলিন যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। নলিনের মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছে। নলিন ভাবিতে লাগিল "আমি যাহার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিলাম, সে আমার হইল কই? সে ত পরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া সুখী হইল; তবে পিতার একমাত্র সন্তান, আমি কেন পিতামাতার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়া এরূপ দুঃখে জীবন কাটাই?"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় নলিন তাহার পিতাকে এই পত্র লিখিল।

"বাবা, আমি আপনার অযোগ্য সন্তান। আপনার মনে ব্যথা দিয়া আমি কিরূপ কষ্ট পাইয়াছি তাহা পত্রে কি জানাইব। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে এই মূহুর্ত্তে আপনার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু আপনি হতভাগ্যকে ক্ষমা করিবেন কি? কি করিলে আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে - লিখিবেন, আমি তাহাই করিব।" ইতি

কলিকাতা ১২—লেন	}	আপনার হতভাগ্য পুত্র, নলিন।

এই পত্র পাঠ মাত্র পুত্রশোকবিমূঢ় বেণীমাধব বাবু সস্ত্রীক বরদাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট ও অনুতপ্ত পুত্রকে হৃদয়ে পাইয়া যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। কাতরা জননী পুত্র মুখ চুম্বন করিয়া অবিরল ধারে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বেণীমাধব বাবু সেই দিনই পুত্রকে লইয়া স্বদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু

বরদাবাবু নলিনকে অতিশয় ভালবাসিতেন। এক্ষণে তাহাকে ধনী বেণী-মাধব বাবুর পুত্র জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এই ঘটনায় উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। বরদা বাবু অতিশয় সমাদরে বেণীমাধব বাবুকে দুইদিন আতিথ্যগ্রহণ করাইলেন। যাইবার সময় বরদাবাবু বেণী-মাধব বাবুকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ নিভৃতে কোন বিষয় প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন।

* * * * * * *

বরদাবাবুর কন্যা সরলাকে লইয়া নলিন বাসর ঘর আলো করিয়া বসিয়াছে—কত সুন্দরী রমণী বেশভূষায় আপন সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া হাসির লহর তুলিতেছে। কেহ গান করিতেছে। একজন বলিল "বর একটা গান গাওনা ভাই?" অমনি বড় শ্যালিকা বলিল "না গো গান থাক বরের শরীর ভাল নয়, একটু ঘুমিয়ে নিক্।" অপর একজন বলিল "বাসরে একটা রাত, ঘুমিয়ে যদি কাটিয়ে দিলে, তবে আর বিয়েতে সুখ কি!"

এক গা গহনা পরা শান্তি বলিল "কি নলিন দাদা তখন বলেছিলুম তুমি টুকটুকে বউ বিয়ে কর—আমরা দেখ্‌ব—তখন কত কি পাগলামি করে-ছিলে--এখন কেমন ঠাকুরঝিকে মনে ধরেছে ত? যেমন টুকটুকে বউ চেয়েছিলুম ঠিক তেমনই হইয়াছে।"

নতমুখে নলিন বলিল—"শান্তি আর আমায় লজ্জা দিও না। আমি জীবনে মস্ত ভুল করিয়াছিলাম, তাহার জন্য বিস্তর কষ্ট পাইয়াছি।"

শান্তি বলিল "সে ভুল শুধরাইল কে নলিন দাদা?"

নলিন বলিল "তোমার ঠাকুরঝি।"

শান্তি হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত।

রাঠোর-বালক।

প্রথম সর্গ।

বসন্তের পূর্ণচন্দ্র ছড়াইছে দীপ্তি
ঘননীল নভঃস্থলে। তারকার রাজি
অগণিত প্রজাবৃন্দ, আশে পাশে বাসে;
নভঃরাজ্য সুসজ্জিত, উপস্থিত রণ
তেজঃপুঞ্জ সৈন্যরাশি উগারে কিরণ-
প্রাণপণে রক্ষিতে এ নীলিমা-সাম্রাজ্য
হইয়াছে একপ্রাণ এক আত্মা সবে।
কোথা হ'তে আসিতেছে শত্রু অজানিত
বিষম ক্ষমতাশালী। রক্ষিবে নিশ্চয়
নহেত সম্মুখরণে আত্ম বলিদান।

পলায়ন নভঃসেনা শিখেনি ত কভু,
সম্মুখে তাদের গতি,—দেখেনি ত কভু
স্থানভ্রষ্ট লক্ষ্যহারা কোন সহচর
ছুটিতেছে জ্ঞানহীন রক্ষিতে জীবন—
কেবল সদলবলে অগ্রসরি যায়
আজন্ম অবধি এরা। আজও পালিবে
চিরন্তন কুলধর্ম্ম রহিবে অটল।
পরাক্রমী শত্রুরণে পূত বংশরীতি
করিবে না কলঙ্কিত। যতক্ষণ দেহে
থাকে প্রাণ অস্ত্র ধরি নাশিবে অরাতি।

আসিয়াছে শনৈশ্চর, সামন্ত প্রধান
লয়ে অগণিত সৈন্য। রেখাকারে বেড়ে
বিরাজিছে অনুচর। পূর্ণ দীপ্তিমান
শোভে গুরু বৃহস্পতি ; প্রদীপ্ত নয়নে
উৎসাহিছে সেনাবৃন্দ রণরঙ্গে মাতি।
প্রবীণ আচার্য্য শুক্র, ধীর বিচক্ষণ
স্থিরভাবে নিরখিছে গতি সবাকার।
সেনাপতি সুপণ্ডিত আর কত শত
ভাতিছে চৌদিকে সবে স্বজন সহিত
বেষ্টিয়া অম্বর-পতি পূর্ণ দলবলে।
মিবার প্রদেশ নিম্নে। পর্ব্বতে পর্ব্বতে
তুঙ্গ শৃঙ্গ উপত্যকা নির্ঝর সহিত
নীরব নিস্তব্ধ স্থির। সুদৃঢ় বেষ্টনে
চারিপাশ সুবেষ্টিত। থরে থরে থরে
অদ্রির উপর অদ্রি অদ্রি তদুপর
মিশিয়াছে নীলাম্বরে। ভগ্ন দুর্গ কত
হেথা সেথা শৃঙ্গে শৃঙ্গে। নির্জ্জন আঁধার—
কচিৎ ডাকিছে শিবা ভীতিপ্রদ স্বরে।
প্রতিধ্বনি মিশিতেছে পবনে পবনে
সমস্ত মিবার দেশ নীরব আঁধার।
একধারে হাহাকারে চিতোর নগরী—
দৃঢ় হর্ম্মে্য ভীমদুর্গে বর্ত্মে উপবনে
উল্লাসিত নাগরিক উল্লাস সঙ্গীতে
ছিল মুখরিত সদা। বাসন্তী পূর্ণিমা—
ঘন হিন্দোলের দোল—আবীর উচ্ছ্বাস
লালে লাল প্রজাগণ সহাস্য আনন—

পুরে পুরে পুরনারী কলকণ্ঠ ধ্বনি
উন্মত্ত চারণদের বিজয় সঙ্গীত--
পরিণত জনশূন্য নিরালা নিস্তব্ধ,
বিবাহ উৎসব গৃহ নীরব শ্মশান।

এই সে মিবার দেশ বাপ্পা প্রতিষ্ঠিত
কি উদ্যম কি উৎসাহ দেবসুধা স্পর্শে
বলীয়ান্ ক্ষত্রবীর স্থাপিল ধরায়
অবিনাশী সূর্য্যবংশ; নশ্বর জগতে
একমাত্র আকিঞ্চন্। দূরে আরাবলি
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রোধিয়াছে কুটিল কৌশল
ক্রুরকর্ম্মা রাজবুদ্ধি। ধর্ম্ম অসি সনে,
সত্য কোষে বদ্ধ সদা, রক্ষিছে স্বদেশ।
তাইত বিরাজে হেথা একলিঙ্গ রূপে
ভোলানাথ আশুতোষ সরল দেবতা।

কতশত মহাতীর্থ পর্ব্বত কন্দরে,
বালুভূমে, নদীতটে—কে করে গণনা
দেবশিশু দেব নারী করিয়াছে লীলা
দেহী রূপে অবতরি। প্রতি রজঃকণা
দেব রক্তে পবিত্রিত। সাম্রাজ্য মহান্,
কোথায় তুলনা তার এ মহী মণ্ডলে,
হামীর, সংগ্রাম, পুত্ত, বীরপরাক্রমে
করিয়াছে উদযাপন হৃদি-রক্ত-দানে
কতকোটী মহাব্রত, সে মহিমা গানে
সুদূর প্রদেশে আজ হিয়া ওতপ্রোত। [ক্রমশঃ]

শ্রীউমাচরণ ধর।

ধন এবং মুদ্রা দুইটি বিভিন্ন পদ। ধন বাঞ্ছনীয় পদার্থ, মুদ্রা তাহার চিহ্ন—তাহার আহরক। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ ধন এবং মুদ্রা এই দুইটি শব্দকে একার্থবাচক বিবেচনা করি। টাকা কড়ি মোহর প্রভৃতিকে অশিক্ষিত লোক একমাত্র ধন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দুইগোলা ধান্যের অধিকারী অপেক্ষা বোধ হয়, সাধারণ লোকে পাঁচ শত টাকার অধিকারীকে অধিক ধনবান্ বলিয়া পরিগণিত করে। গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে (Merchantile Theory) নামক বাণিজ্যনীতির বশবর্ত্তী হইয়া বিলাতী বণিকেরা ধন এবং মুদ্রা এই দুইটি পদের অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়া প্রমাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শব্দরত্নাবলীতে ধন (ধন+অন ঘে) শব্দের অর্থ আছে 'স্নেহপাত্রম্'। রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে জীবনোপায়, ভোগ্য, ব্যবহার্য্য প্রভৃতি ধনশব্দের পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। (Prof. Marshal) অধ্যাপক মার্শাল বলেন, যাহা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের অভাব মোচন করে তাহাকে ধন (Wealth) বলে। অবশ্য প্রত্যেক জাতির নিকট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ধন বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। প্রাচীন জগতে ক্রীতদাস ধনতালিকার অন্তর্নিহিত ছিল। ভারতেও "ত্রয় এব ধনা রাজন্ ভার্য্যাদাসস্তথা সুতঃ।" ভার্য্যা দাস এবং পুত্র ধন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ছিল।

মুদ্রাশব্দের অর্থ কিন্তু বিভিন্ন। মুদ্রা (মুদ+রক, ঘে, আপ) অর্থে "স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত মুদ্রা"। টাকা কড়ি মোহর পয়সা প্রভৃতিকে

মুদ্রা কহে। মুদ্রাদ্বারা মানবের এক প্রধান অভাব মোচন হয়। সুতরাং ইহাও ধনশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু মুদ্রাই এক মাত্র ধন ইহা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা মুদ্রার দাস হইয়া কেবল মাত্র সুবর্ণরজত সংগ্রহেই তৎপর হইয়া অন্যান্য সুখকর বস্তুলাভে বিমুখ হয়েন।

মানবের প্রধান অভাব আহার্য্য। যাহার আহার্য্য আছে সে দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া জঠরক্লেশে কালকবলিত হইবে না। কিন্তু যাহার ভাণ্ডার শস্যাদিশূন্য মন্বন্তরকালে সে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? রজত-মুদ্রায় ত ক্ষুধার উপশম হইবে না। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া স্বর্ণেও কাহারও রসনা সরস হইবে না। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাদি কিনিতে পাওয়া যায় না যে, রজত সাহায্যে এরূপ ধনী আহার্য্য আহরণ করিবে।

তবে কি মুদ্রার প্রয়োজন নাই? অবশ্য আছে। মুদ্রাদ্বারা আমরা সুখকর বস্তু সংগ্রহ করিতে পারি, মুদ্রা সাহায্যে আমরা ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদানদ্বারা স্ব স্ব কর্ম্মপ্রসূত দ্রব্যাদি আপন উপকারে আনিতে পারি। মুদ্রার সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইতে পারে না। আধুনিক সভ্য জগতের দেশীয় বিদেশীয় বাণিজ্যাদি মুদ্রার সাহায্যেই হইয়া থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে সকল প্রদেশেই ধনদ্রব্যাদি পাওয়া যায় সুতরাং দ্রব্য বিনিময়ের প্রধান সহায় মুদ্রা।

ইংরাজিতে বলে, Necessity is the mother of invention অভাবই উদ্ভাবনের জনয়িতা। মুদ্রা প্রচলনপদ্ধতি না থাকিলে ধান্যোপাদকের বস্ত্রাভাব হইলেই দেখিতে হইত, কাহার বস্ত্রের আধিক্য এবং ধান্যের অভাব আছে। অন্বেষণ করিতে করিতে হয় ত বেচারাকে শীতে মরিয়া যাইতে হইত। যদ্যপি ধান্যাভাবগ্রস্ত লোক পাওয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত তাহার নিকটে অতিরিক্ত বস্ত্র পাওয়া যাইত না। অথবা যাহার অতিরিক্ত বস্ত্র আছে হয়ত তাহার ধান্যও আছে,—তাহার অভাব সৈন্ধব লবণ। মুদ্রার উদ্ভাবনে কিন্তু মনুষ্যকে আর এ সকল সমস্যায় পড়িতে হইল না। বুদ্ধিমান্ নর দেখিল যদি এমন একটা সাধারণ দ্রব্য সকলে মূল্যবান বলিয়া মানিয়া

লয় যাহার বিনিময়ে সে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য হস্তান্তরিত করিতে পারে এবং পুনরায় যাহার বিনিময়ে সে তাহার আবশ্যক পদার্থ আহরণ করিতে পারে, তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণে তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়। কাজেই মনুষ্যের সভ্যতা এবং বুদ্ধির উন্নতির সহিত এইরূপ মুদ্রা-সাহায্যে ক্রয় বিক্রয় প্রথার সৃষ্টি হইল। আধুনিক সভ্যজগতের উন্নতির মূল শ্রমের শ্রেণীবিভাগ (Division of labour)। কৃষক কেবল শস্যই উৎপাদন করে, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নেই জীবনযাপন করে। একই রকমের কার্য্য অনবরত করিতে করিতে হস্ত-পদাদির একপ্রকার পারদর্শিতা জন্মে। আমি যাহা করিতে দুইদিন শ্রম করিব, যাহা সুসম্পন্ন করিতে আমি দশটি প্রমাদ ঘটাইয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইব, দক্ষ শিল্পী হাসিতে হাসিতে আমার সহিত গল্পগুজব করিতে করিতে দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত করিয়া দিবে। মুদ্রার প্রচলন না থাকিলে কিন্তু এক জন ব্যক্তিকেই হয়ত সকল কার্য্য করিতে হইত। (Gibbon) গিবন বলেন—যেমন আমাদিগের মনোভাব বুঝাইবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ আমাদিগের সম্পত্তি ও অভাব নিরূপণ জন্যই মুদ্রার মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আজকাল সকল সভ্যপ্রদেশেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য প্রকার মুদ্রার সহিত অস্মদ্দেশেও ঐ দুই ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। মিতাক্ষরায় পাওয়া যায়—

সৌবর্ণীম্ রাজতীম্ তাম্রীমায়সীং বা সুশোভিতাম্" ইত্যাদি। মুদ্রা-প্রণয়নে স্বর্ণ রজতের উপযোগিতার কথা পরে বলিব। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ ভাবিবেন না, এই দুই পদার্থ ব্যতীত অপরদ্রব্য মুদ্রারূপে গৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ কোন কোন প্রদেশে লোম এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কত জাতি গরুদ্বারা একার্য্য সাধিত করিয়া লইয়াছে। চীন দেশে চায়ের ইষ্টক, আফ্রিকায় কৌড়ি, আবিসিনিয়ায় সৈন্ধব লবণ, লাসিডিমনে লৌহ, রোমে তাম্র,—এইরূপ বহুপ্রদেশে বহুপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল।

একণে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে মুদ্রার কার্য্য দুইটি। প্রথমতঃ দ্রব্যাদি বিনিময়ের সাহায্য করা; দ্বিতীয়তঃ বস্তুর মূল্যনির্দ্ধারণ করা। এখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি রামবাবুর সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকা, শ্যাম-বাবুর বাৎসরিক মুনাফা দুইশত টাকা। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে আমা-দিগকে কিন্তু বলিতে হইত রাম বাবুর সম্পত্তির ভিতর এত বিঘা জমী, এক শত ধেনু, এক ভরি স্বর্ণ ইত্যাদি। শ্যাম বাবুর মুনাফার কথা বলিতে হইলে বলিতাম তাঁহার আয় ২০ কাহন ধান্য, ২টা ছাগল, ৫টা গরু ইত্যাদি। কিন্তু মুদ্রায় মূল্যের কথা বলিলে আর এ সকল বিপদ থাকে না।

সুতরাং যে কোনও পদার্থের দ্বারা এই দুইটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে সেই বস্তুর মুদ্রা প্রচলন করিলেই সমাজের অভাব তিরোহিত হয়। মুদ্রা প্রস্তুত ব্যাপারে কোনও ধাতুর ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। এবং ধাতুর ভিতর স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার যেরূপ হিতকর এরূপ অপর কোনগুলিরই নহে।

যে দ্রব্যের মুদ্রা প্রচলিত হইবে তাহার সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গুণ গুলি থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে মুদ্রাপ্রচলনের প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য সুসাধিত হইবে না।

(১) এমন দ্রব্যের মুদ্রা হওয়া প্রয়োজনীয় যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনো-নীত হইবে, যাহা গ্রহণে বিক্রেতা তাহার উদ্বৃত্তবস্তু প্রদানে দ্বিরুক্তি করিবে না এবং যাহা প্রদানে ক্রেতাকেও অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। অবশ্য তাহা না হইলে দ্রব্যবিনিময়ে মুদ্রা সহায়তা করিবে কিরূপে? প্রত্যেক রাষ্ট্রেই মুদ্রার আদান প্রদান নিরূপিত হইবার নিয়ম আছে। যে দেশের প্রজাবৃন্দ বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্যাদি করে তাহাদিগের মুদ্রার সামগ্রী সাধারণ সভ্যজাতির মনোনীত হওয়া আবশ্যক।

(২) মুদ্রা বহনোপযোগী হওয়া অভিপ্রেত। অপর কথায় বলিতে গেলে দ্রব্যটি পরিমাণে অল্প হইলেও মূল্যবান হওয়া উচিত। মুদ্রার এই গুণ না থাকিলে বড়ই সমস্যা উপস্থিত হয়। এই গুণবশতঃই অনেক প্রাচীন জাতি গবাদি পশুদ্বারা মুদ্রার কার্য্য সাধিত করিয়া লইত। এক গিনি মূল্যের লৌহমুদ্রা একখানি সুবৃহৎ রথচক্রসদৃশ হইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখুন আপনার জামার জেবে এইরূপ কয়খানি অদ্ভুত গিনি লইয়া বাজার করিতে যাইতে পারিতেন?

(৩) দ্রব্যটি মূল্যবান হইলেও তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলে চলিবে না। মহামূল্য হীরক বা মুক্তা এতদর্থে এই কারণেই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(৪) এমন পদার্থের মুদ্রা নির্ম্মিত হওয়া বিধেয় যাহার ক্ষয় অত্যন্ত অল্প। সোণা রূপার এই গুণ অত্যধিক।

(৫) আবার মুদ্রা বিভাজ্য হওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর। এক তোলা স্বর্ণকে আধ তোলা করিয়া দুইটি ছোট মুদ্রায় পরিণত করা যাইতে পারে আবার দুইটিকে গালাইয়া একত্র করিয়া ছাপ্ দিলে একটি এক তোলা ওজনের মুদ্রা গঠিত হয়। হীরা মতির এ গুণ নাই।

(৬) যে পদার্থ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইবে তাহার মূল্য যদ্যপি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল হয় তাহা হইলে এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইবে। ধান্যাদির অপর বহুগুণ থাকিলেও এই নিমিত্ত তাহারা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একতোলা রূপার বিনিময়ে ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। বহু কারণ বশতঃ আজ কাল যদিও রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে তথাপি অপর দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে তাহা সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। স্বর্ণের দর প্রায় সমভাবেই আছে। তবে ১৮৪৮ এবং ১৮৫০ খৃঃ অব্দে California (ক্যালিফর্ণিয়া) এবং Australia (অষ্ট্রেলিয়ায়) সুবর্ণখনির আবিষ্কার হেতু সুবর্ণেরও মূল্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই সকল কারণেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন অত্যন্তবহুল। বঙ্গদেশে দুইটি ধাতুরই ব্যবহার আছে। তাহাদিগের মূল্যাদি কিরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আধুনিক সভ্য জগতের নোট বা কাগজ মুদ্রার কথাও ক্রমশ: বলিব।

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত।
এম, এ, বি; এল।

উচ্ছ্বাস।

মরমে মরিত পাখী—যদি না ছড়াত
হৃদয়ের রুদ্ধ উৎস কানন প্লাবিয়া—
চন্দ্রিমা কিরণ-চারু হয় প্রতিভাত
উছলিয়া হৃদিতট উথলি অমিয়া—
স্রোতস্বিনী নির্ঝরিনী পর্ব্বত কন্দরে
ঢাকিতে কি পারে সুধা? আলোড়িয়া চলে;
মোহন মুরলীধারী মুরলীর স্বরে—
অন্তরে লুকান কথা জগতেরে বলে।
স্বরগ কুসুম রাশি হৃদয়ের বাস
কেমনে নীরবে রয়—চৌদিকে ছড়ায়—
আকিঞ্চন সম্মিলনে অধরের হাস—
আপনি ফুটিয়া উঠে—লুকান কি যায়!
দাও দেব দাও বর ছড়াই হৃদয়
অসহ্য নীরব সুখ সহন না যায়।

শ্রীউমাচরণ ধর।

প্রেম ও শ্মশ্রু।

১

কহিল যুবক জোড় করি দুই কর,—
"তুমি লো হিমাংশু মম আঁধার গগনে।
শতদল তুমি বালা, স্নিগ্ধ মনোহর,
কৃপা করি রেখ সখি, এ দাসেরে মনে।—

২

"তৃষিত চাতক আমি, তুমি বারিধারা,
রূপের তৃষায় তব, দহি দিবারাতি,
তোমারি বিরহে সখি পাগলেরি পারা,
ধ্যান করি হৃদে সদা, তব রূপ-ভাতি।"

৩

লাজে নম্র; কহে বালা, চাহি শূন্য পানে,
কনক মূরতি তার, অতি সমুজ্জ্বল,
—"মুগ্ধ হ'ল হিয়া সখা, তব প্রীতিগানে,
কি হেতু এ অধীনীরে হেন কথা বল?"

৪

"হৃদয়ের দেবী তুমি—" ভরিয়া আশায়,
কহিল যুবক পুনঃ, "বাসনা আমার
চিরকাল রহি বাঁধা, তব রাঙ্গা পায়
লইবে কি অধমের, উদ্বাহের হার" ?

৫

বিম্বাধরে মৃদুহাসি কহিলেক বালা
উথলিল যুবাহৃদে প্রেমের হিল্লোল—
"সৌভাগ্য তোমারে পাব হবে হিয়া আলা
উঠিবে তাহ'লে প্রাণে, আমোদের রোল।"

৬

শুনিয়া তাহার বাণী, হেরিল ললনা
ধৈরয হারায়ে যুবা, উন্মাদের প্রায়
ভাষিল সাদরে পুন,—" সত্য না ছলনা,
কহ বরাননে সত্য, বরিবে আমায় ?"

৭

"বরিব তোমায়" কহে সুন্দরী যুবতী
"বিবাহের আগে, কিন্তু, এক ভিক্ষা চাই
উচ্চ নহে আশা মম—ক্ষুদ্র, দীন অতি
যত্নে ধরি হৃদে তোমা, যদি তাহা পাই।"

৮

আগ্রহে কহিল যুবা—"তোমারে অদেয়
সমগ্র এ চরাচরে কি আছে বলনা,

সত্যই জানিব মোরে, অতি তুচ্ছ হেয়
যদ্যপি না সাধি কার্য্য তোমার ললনা।—

৯

"তোমার আজ্ঞায় আমি সাগর-সলিলে
অনায়াসে দিতে পারি এ তুচ্ছ পরাণ
তুহিন হিমাদ্রি শিরে, তুমিলো বলিলে
নির্ব্বিঘ্নে করিতে পারি, মম বাসস্থান।"

১০

হাসিয়া কহিল বালা—"ধন্য প্রেম তব।
সামান্য বাসনা মম, শুন কহি সার—
চিরকাল তব ঠাঁই দাসী হয়ে রব,
কিন্তু অগ্রে ফেল কাটি, দাড়ীটি তোমার।"

১১

"দাড়ীটি আমার, হ্যাঁ-তা,—দাড়ীটি আমার
কি জান সখের ওটি—আর চাহ কিছু—
শুনিব সকলি তুমি যা কহিবে আর—
দাড়ীটি আমার হ্যাঁ-তা—কব তোমা পিছু।"

১২

"অন্য কিছু নাহি চাহি—এই শ্মশ্রু চাই
এই কি প্রণয় তব, এই কি সোহাগ?
করিব বিবাহ তোমা যদি ভিক্ষা পাই
বুঝিব কেমন প্রেম, কিবা অনুরাগ।"

১৩

"প্রেম মোর গভীর অতি, কিন্তু দাড়ী মোর—
ফরাসী ফ্যাসনে কাটা হের ক্ষুদ্রকায়—
যুবক পরাণ মম প্রেমেতে বিভোর—
দাড়ীটি কাটিতে কিন্তু মন নাহি চায়।"

১৪

গর্জ্জিলা সরোষে বালা—"বুঝিনু তোমায়,
চাহিনে তোমাকে, তব অতি ক্ষীণ মন"—
কহিল যুবক—"তুমি, ল'বেনা আমায়,
দেখি তবে দাড়ী সনে বরিবে যে জন।"

শ্রীঃ—

গান।

(বেহাগ-একতালা।)

মধুর মাধবী রাতি, হ'ল বুঝি অন্ত!
পাপিয়া তুলিছে তান কাঁপায়ে দিগন্ত—
বল সখি, বল বল, কোথা প্রাণকান্ত!
কোয়েলা পঞ্চমস্বরে গাহিছে তমালোপরে,
মধুপ মৃণালোপরে ;—সখি, বড় সে দুরন্ত ;
শিহরি উঠিছে কায়, উহু সখি, প্রাণ যায়
অধীর সমীর তায়, মধুর বসন্ত!
মধুর মাধবী রাতি, হ'ল বুঝি অন্ত!

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

[illegible]কোষের লেখক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় আমাদের পত্রিকা সংক্রান্ত নানাবিষয়ে সাহায্য এবং উৎসাহ [illegible] করিয়াছেন—তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা [illegible] করিতেছি। অং সং।

অর্চ্চনা।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ)

প্রথম বর্ষ।	চৈত্র ১৩১০।	দ্বিতীয় সংখ্যা।

সোণার ভারত।

সোণার ভারত—এই স্বদেশ আমার—
স্বদেশ আমার আমি বড় ভালবাসি,
কোথাও থাকিতে নারি ছাড়িয়া তোমায়;
কি জানি পরাণ কেন কর্‌য়ে অস্থির
তোমা ছেড়ে দূরদেশে করিতে গমন।
কি জানি অমিয়া কত প্রণবে তোমার
কি জানি সুন্দর কত প্রণব-ভাষিত
অলকামণ্ডিত তব সাধের প্রতিমা।
ভারতের ব্রহ্মচর্য্য, ভারতে বিধবা
ভারতে গৈরিক বাস, আর পতিব্রতা
কি জানি পরাণ কেন প্লাবয়ে আমার,
কি জানি কিসের ভাবে হইয়া কাতর
ফিরে আসি তব কোলে। ভাবি কতবার
যদি গো পতন হয় এ দেহ আমার
জননীর ক্রোড় ছাড়ি—তবে মা আমার
আর ডাকিবে না হেথা—আর না হেরিব

ভারতের মন্দাকিনী। আর না বুঝিব
কেনএই ভাগিরথী ত্রৈলোক্য-তারিণী,
আর না বুঝিব কেন এই মুনি ঋষি
হৃদয়ের ধন। কোন্ চক্ষে চেয়ে তারা
দেখিয়াছে হিমগিরি এঁকেছে পার্ব্বতী
আর না বুঝিব হায় কোন্ মধু কণ্ঠে
বাল্মীকি সুকবি গাহিয়াছে রামায়ণ
কোন গাথা গাঁথিয়াছে এ মহাভারতে
মহামুনি দ্বৈপায়ন। কোন্ গীত গায়
হেথা গীতা মহাবাণী বেদবস্ত্র পরি।
ভালবাসি জন্মিবারে ভারতে আবার
যে দেশের লোকে সব করে বিসর্জ্জন
লভিবারে জ্ঞান প্রেম—যেই প্রেম জ্ঞান
অমরতা দেয় নরে—দেয় স্বাধীনতা।
দেহ মন যার তেজে ক্রমে নিরন্তর
নিজ ব্যভিচার ছাড়ি তুষিতে আত্মায়।
কভু স্থির আঁখি দেখে বড় ভয় পেয়ে
বাচাল সন্তান কাঁদে দিয়া হরি বোল।
কবি দেখে স্থির চক্ষে তুমি দেখ তারে
যে তোমার তুমি যার। তুমি গো জননি!
আবার উঠিবে জাগি, উঠিবে ব্রাহ্মণ
কীর্ত্তিময়ি! মৃত্যু তব সম্ভব ত নয়।
পুনঃ সামগানে পূর্ণ হইবে সংসার
বেদ তন্ত্র শাস্ত্র আদি জাগিবে আবার
দেব ভাষা কণ্ঠে কণ্ঠে পুনঃ ঝঙ্কারিবে।
রাম যুধিষ্ঠির পুনঃ আসিবে ফিরিয়া
পুনঃ সত্যযুগ হেথা হবে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্ এ।

প্রহেলিকা পুরী।

তমিস্রা রজনী ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটি নিশাচর পক্ষী রব করিতে করিতে প্রকৃতির এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। অন্যান্য জীব-ব্রজ দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত—নিশাসমাগমে নিজ নিজ আলয়ে সুখময়ী-নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত, কেবল আমি, এই ভয়ঙ্কর নিশীথে, কি জানি কেন একাকী, লক্ষ্যহীন পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। তমসাবৃত রজনীর ন্যায় আমারও মন চিন্তান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জানিনা কেন যে প্রাণ এত ব্যাকুল, ক্রমে ধীরে ধীরে নদীর উপকূলে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম সম্মুখে পূতঃসলিলা-কূলপরিপ্লাবিনী বিপুল-জল-কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী আপন হৃদয়ে হীরকের হার দোলাইয়া আপন মনে অনন্ত উদ্দেশে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম অনন্তযোজনব্যাপী ব্যোম—চতুর্দ্দিকে অনন্তযোজনব্যাপী অন্ধকার। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমিই একাকী, সহায়হীন উদ্দেশ্যহীন—একাকী এই গভীর নিশীথে নদীকূলে উপবিষ্ট। হৃদয় মরুভূমি; জানি না কেন আজ প্রাণের কোমল তন্ত্রী এরূপ তীব্রস্বরে বাজিয়া উঠিল—সকলই লক্ষ্যহীন, হৃদয় অন্ধকার, জগৎও অন্ধকারে আবৃত—আঁধারে আঁধারে মেশামেশি। বাহ্যাভ্যন্তর কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা; কেমন করিয়া বুঝিব—কেন প্রাণ এত উদ্বেলিত! কেন প্রাণের উৎস নয়ন-কোণে উথলিয়া উঠে? কে ইহার উত্তর দিবে? আর থাকিতে পারিলাম না, কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলাম—বলিলাম, "মাগো পতিত পাবনী সুরধুনি! কল কল রবে তুই কি বলিতেছিস্ মা! তোর ভাষা যে বড়ই মধুর! মাগো! বলে দে আজ কেন যে প্রাণ আমার এত ব্যাকুল—প্রাণের কি অভাব আছে, আমায় বলে দে মা?" হায়! আমি কি ভ্রান্ত! কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে? যে প্রবাহিনী পর্ব্বতগৃহ বাসিনী, সংসারের দুঃখে সুখে যাহার লক্ষ্যশূন্য—হিমাদ্রি ছাড়িয়া যে স্রোতস্বিনী অনন্ত উদ্দেশ্য বুকে ধারণ করিয়া আপন অভীষ্ট পথে প্রবাহিত হইতেছে, অতীতের দিকে যে একবার ফিরিয়া চায় না—সে আমার প্রাণের অভাব কি বুঝিবে, আমায় কি উত্তর দিবে? হায়! তবে কি কেহ আমার এ

অনন্ত চিন্তার পসরা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে নাই—এ বিষম সমস্যার উত্তর দিতে নাই?" মুহূর্ত্ত মধ্যে কে যেন গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল "আছে।" সহসা আমার প্রাণে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার হইল, চারিদিক দেখিলাম, —ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইলাম না; ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম "হায়! কে আছ রক্ষা কর," কে যেন উত্তর করিল —"চিন্তয় নিত্যমেকপুরুষপুরাণম্।" আমি ভয়বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলাম "হায় দেব এ কি লীলা।" সঙ্গে সঙ্গে কে যেন মধুর কণ্ঠে গীত গাহিয়া বলিতে লাগিল।

(সাহানা)

"লীলাময় লীলা নাথ
সকলি তোমার লীলা।
কাহাকে কি ভাবে রাখ
কে বুঝে তোমার খেলা
কেহ সুখে হাসে গায়,
কার বুক ভেসে যায়,
প্রেম জ্ঞান ভক্তি যুক্তি
বুঝে কেবল পাগল ভোলা॥"

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দিগন্ত কম্পিত করিয়া এক বিকট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল, আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম।

অতঃপর দেখিতে পাইলাম, সম্মুখস্থিত নদী বক্ষ বাহিয়া একখানি তরণী তরতর করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। নৌকাখানি যেন শতশত হীরকমাণিক্য সমুদ্ভূত আলোকমালায় আলোকিত কিন্তু তাহাতে কেহ আরোহী নাই—কেবল মাত্র দুইটি বরবর্ণিনী ক্ষেপণী ধারণ করিয়া রহিয়াছে—তাহাদের মূর্ত্তি ধীর প্রশান্ত, দেখিলেই যেন আপনিই ভক্তি রাশি উথলিয়া উঠে। ক্রমে নৌকা খানি তাহারা আমার নিকটে আনয়ন করিয়া আমাকে তদুপরি উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তদুপরি উঠিয়া বসিলাম; মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা আবার চলিতে লাগিল। আমি স্থিরভাবেই বসিয়া আছি। তরণী আমাকে লইয়া কত বন উপবন ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া এক সুরম্য উপকূলে আসিয়া পৌছিল, আমরা সকলে তথায় অবতীর্ণ হইলাম। অসংখ্য তমাল-তালী-বনরাজিসুশোভিত স্থানটি অতীব মনোরম, কোথাও বৃক্ষশাখে নানাবিধ বিহঙ্গকুল আনন্দে কাকলি করিতেছে, অতঃপর তাহারা একটি পাদপ মূলে উপবেশন করিল, আমিও তাহাদের সম্মুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলাম, নির্ব্বাক নিস্পন্দ; মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাদের উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তাহারাও আমার প্রতি স্নেহ পূর্ণ নয়নে চাহিয়া আমার কার্য্য কলাপ দেখিতেছে, সহসা, জানিনা, কি এক নৈসর্গিক দীপ্তি তাহাদের নয়ন হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়ে যেন তড়িৎ প্রভা ছুটাইয়া দিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, অধীর হইয়া, দৌড়িয়া তাহাদের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মূহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা অট্টহাস্য করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল, আমি ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম, হাঃ হাঃ হাঃ।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম আমার সম্মুখে এক স্থূল কলেবর, পট্টবাস পরিহিত, বিক্ষিপ্তকেশজাল সমন্বিত নবীন সাধু পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার বদন স্মিত, নয়ন হইতে এক অভূত পূর্ব্ব জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে। আমি তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মহাত্মন। আপনি যে কেহ হউন্ আমি আপনার স্মরণ লইলাম কৃপা করিয়া আমার এই বিষম সমস্যার, এঘোর প্রহেলিকার অর্থ ভঞ্জন করিয়া দিউন।" নবীন পুরুষ ধীর জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন "বৎস স্থির হও তুমি বড় ভাগ্যবান, বহুপূণ্য ফলে তুমি আজ আপনা হইতে পরম বস্তু ও পবিত্র পদ লাভ করিয়াছ, কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু কিছুই উপলব্ধি করিতে পার নাই; যে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহাতে অগ্রসর হও পরিণামে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। এক্ষণে আইস তোমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিই। বৎস চাহিয়া দেখ সম্মুখে কি মহৎ বস্তু রহিয়াছে, দেখ দেখি ইহাতে

তোমার প্রাণের অভাব মোচন হয় কিনা? এই বলিয়া সাধু তাঁহার একটি অঙ্গুলি দ্বারা আমায় স্পর্শ করিলেন আমি পূর্ব্বাপর সকলি ভুলিয়া গেলাম।

আহা কি দেখিলাম—দেখিলাম আমার হৃদয় পূর্ণালোকে পরিপূরিত, পশ্চাতে মণিমুক্তাবিভূষিত তরণী, দুই পার্শ্বে হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই দুই বরবর্ণিনী মধ্যে, আহা কি সুন্দর দেখিলাম—"চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী" পদতলে উত্তাল তরঙ্গ শোভিত সুরধুনী প্রবাহিত, সম্মুখে, নবীন সাধু যুক্তকরে দণ্ডায়িত। আমি আত্মজ্ঞান হারা হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছি, কিয়ৎক্ষণ পরে সাধু পুরুষ বলিলেন "বৎস কর্ত্তব্যহারা হইও না। রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে ডুবিতে চেষ্টা কর, মধুকরের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া পান কর, সংসারের সকল সত্তা ভুলিয়া যাইবে।" এই বলিয়া নবীন সাধু অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, আমি বিস্মিত হইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম নিশা অবসান প্রায় তখনও সম্মুখে সেই অনন্ত প্রবাহিনী সুরধুনী প্রবাহিত, শূন্যে সেই অনন্ত নীলিমা কিন্তু আমার মন চিন্তাশূন্য নির্ম্মল। অতঃপর আমি শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম তখনও যেন মানস নয়নে দেখিতেছি সেই-চন্দন-চর্চ্চিতনীল-কলেবর পীতবসনবনমালী।

শ্রীআনন্দ গোপাল ঘোষ।

বিরহ।

আজি সান্ধ্য গগনে, চাঁদের কিরণে
মৃদুল মলয় বায়,
আজি নিশা আগমনে, কুসুম কাননে,
কার পানে মন ধায়?
আজি কোন্ দূরদেশে, ভেসে ভেসে ভেসে
মানস চাহে গো যেতে,
আজি কিসের লাগিয়া, আকুল হইয়া
নিরাশা জড়ায় চিতে
আজি মধুর কিরণ, মৃদুল পবন
সুধাঢালা চারিধার
হায় তবে তবু কেন এ বুক বেদন
কেন এ নিরাশা ভার।—
হায় এ মধু যামিনী, যদি না সজনি!
নাগর রহেলো পাশে
তবে সাঁঝের আকাশ, তারকা বিকাশ
চাঁদের কিরণ, কুসুম কানন
কে কবে লো ভালবাসে?

তক্তাউস।

২৮ শফর ১০৩৭ হিজিরা অব্দে বাদসাহ জাহাঙ্গীর প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র যুবরাজ খরম ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা দুর্গে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। মোগল সম্রাটদিগের চিরন্তন প্রথা অনুসারে অবশ্য নূতন সম্রাটের খরম নামটি তিরোহিত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে সম্রাটের নাম হইল—"আবুল মজফর সাহাবুদ্দিন মহম্মদ সাহেব কিরাণি সাণি।" ইতিহাসে ইনি সাহজাহান বা জগতের প্রভু নামে বিখ্যাত।

সম্রাট মহাসমারোহে সিংহাসনাবিরূঢ় হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সামন্ত ও সেনাপতিবৃন্দ নতশির ও নতজানু হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না।

সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সিংহাসন অধিরোহণ কালে লণ্ডনে ক্যানাডা তোরণ প্রস্তুত হইল—ভারতের দিল্লীদরবারে প্রবল-প্রতাপবান হিন্দুমসলমান নৃপতিবৃন্দের বংশাবতংসেরা রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের নিকট ইংরাজ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী অট্টালিকা সমূহের উপর উড্ডীন "ইউনিয়ন জ্যাক্" তত্রত্য অধিবাসীদিগের রাজবশ্যতা স্বীকারের সাক্ষ্য প্রদান করিল। সম্রাট ত সিংহাসনেবসিলেন, কোনও হাঙ্গামা হইল না, কোনও গোলযোগহইল না সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরলোকগমন বার্ত্তায় কিন্তু জুঝর সিংহ বিদ্রোহকেতন উড়াইয়া দিলেন—খাঁ জাহান লোদি আহম্মদনগরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন।

এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া শিল্পপ্রিয় বিলাসী সাহান সাহ তাঁহার রাজধানীটি সুদৃশ্য করিতে বাসনা করিলেন। সাহ জাহান দেখিলেন তাঁহার রাজ্য কোষাগারে অসংখ্য বহুমূল্য মণি মাণিক্যের সমাবেশ হইয়াছে। বাদসাহ কৃপণ ছিলেন না—তাঁহার মনে হইল সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য—এ সকল নয়নরঞ্জন সামগ্রী তাঁহার নিজের, তাঁহার বেগমনিচয়ের, প্রজাবৃন্দের ও বিদেশীয় ভূপতি সমূহের চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদনার্থেই ভগবান জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লৌহকোষে বদ্ধ করিয়া রাখিলে এ গুলির প্রতি অন্যায়-

চরণ করা হইবে। সে গুলির বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্যে বিলাসোন্মত্ত বাদ্সাহের প্রশস্ত হৃদয়ে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। কোন রত্নটি কন্দর্প-প্রিয়ার কর্ণালঙ্কার হইবার উপযুক্ত—আবার কতক গুলিকে আঁধার আস্মানে বসাইয়া দিলে তাহারা মন্জিল বা তারকা সদৃশ প্রতীয়মান হইবে। সম্রাটের ও যেরূপ মেজাজ তাঁহার ওমরাহ্ গণেরও মানসিকবৃত্তি তাদৃশ উন্নত। সুতরাং তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন—জঁহাপানা এসকল হীরকাদি আপনার সিংহাসন সুশোভিত করিবার উপযুক্ত,—অন্যত্র ইহাদিগের যোগ্য স্থল কোথায়?

বাদসাহের আজ্ঞা হইল, তাঁহার কোষাগারে যত বহুমূল্য মণি মুক্তা হীরকাদি আছে তাহা ব্যতীত আরও দুইলক্ষ মুদ্রার মণি মুক্তা দ্বারা তাঁহার এক অভিনব তক্ত্ বা সিংহাসন নির্ম্মিত হইবে। তাঁহার আপনার নিকট কতকগুলি সুন্দর প্রভাবিশিষ্ট রত্ন ছিল। তাহাদের ওজন ৫০০০০ মিস্কাল এবং তাহাদের মূল্য বা নিরখ্ ৮৬ লক্ষ মুদ্রা * জাহাপনার আজ্ঞা হইল এ গুলিও তাঁহার তাউস্ সিংহাসনের শোভা সংবর্দ্ধনার্থ ব্যবহৃত হইবে।

রাজস্বর্ণকার বে বদল খাঁকে তলব হইল। সম্রাট বলিলেন "বে বদল্ তোমাকে আমার ময়ূরসিংহাসন নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধায়ক হইতে হইবে। আমার মনোরঞ্জন করিতে পার--আর কর্ম্ম করিয়া খাইতে হইবে না। আর যদ্যপি কার্য্য পসন্দ মত না হয়, স্মরণ থাকে যেন, জহ্লাদের কৃপাণ, তোমার গ্রীবা চুম্বন করিবে।" ভূমিস্পর্শ করিয়া শিল্পী সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং গৌরবভরে বলিলেন— "সাহান সাহের দাসের উপর যখন এ কার্য্য ন্যস্ত হইয়াছে—তখন বান্দা ইহার সম্পাদনার্থ জীবন দিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে। তবে জাঁহাপনার উচ্চ পসন্দ মত কার্য্য করিবে এমন পসন্দ্ দুনিয়ায় কোন্ ব্যক্তির আছে?"

বাদসাহ প্রসন্ন হইয়া সিংহাসন নির্ম্মাণ জন্য বে বদল্ খাঁকে লক্ষ তোলা সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সাহ জাহান বলিলেন" সিংহাসনটী লম্বে তিন গজ প্রস্থে সার্দ্ধ দুই গজ ও উচ্চে ৫ গজ পরিমিত হওয়া চাই। তাহার আচ্ছাদনটি হীরকখচিত ও মসৃণ হইবে, তাহার নিম্ন

* এক মিস্কাল—৬৩২ গ্রেণ।

ভাগটি চুনি পান্না প্রভৃতি রঙ্গীন রত্নে ঝলমল করিবে এবং তাহার দ্বাদশটি মরকত স্তম্ভ থাকিবে। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর বিবিধ বর্ণের রত্নাদিরঞ্জিতবপু দুইটি করিয়া ময়ূর থাকিবে—প্রত্যেক ময়ূর যুগলের মধ্যে একটি করিয়া চুনি হীরা মরকত এবং মুক্তাখচিত বৃক্ষ নির্ম্মিত হইবে। সিংহাসনে উঠিবার তিনটি সমুজ্জল রত্ন সুশোভিত সোপান নির্ম্মাণ করিও"।

সাত বৎসর কাল পরিশ্রমের পরে, এক কোটী মুদ্রা ব্যয়ে বাদসাহের ব্যবস্থামতে তক্ত তাউস বা ময়ূর সিংহাসন নির্ম্মিত হইল। বাদসাহ প্রীত হইলেন। পরদানশীন অনিন্দ্যসুন্দরী বেগমেরা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং প্রজামণ্ডলী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সিংহাসনের কারুকার্য্যের সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ময়ূরসিংহাসনে বসিবার তক্তা ছিল একাদশটি। বাদসাহ মধ্যবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিতেন। কেবল সেই আসনটি নির্ম্মাণ করিতে দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইরাণাধিপতি সাহ আব্বাস্ বাদসাহ জাহাঙ্গীরকে লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি চুনি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার শাসনকালে যুবরাজ খরম্ দক্ষিণ জয় করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এই রত্নটি পারিতোষিক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ময়ূরসিংহাসনে তাঁহার বসিবার আসনে এই চুনিটি সংলগ্ন করা হইয়াছিল। এই রত্নটির উপর তাইমুর লঙ্গ, মির সাহ রুখ, মির্জা উলুগবেগ এবং সাহ আব্বাসের নাম খোদিত ছিল। ইহা সেলিমের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে মহামতি আকবরের এবং তাঁহার নিজের নাম সন্নিবেশিত করিলেন। এবং পরিশেষে ময়ূরসিংহাসনে সংলগ্ন হইবার সময় ইহাতে বাদসাহ সাহজাহানের নাম অঙ্কিত হইল। সিংহাসনের নিম্নে সম্রাটের অনুমতি অনুসারে হাজি মহম্মদ্ জান লিখিত একটি মসনওই সংযুক্ত হইল তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (১০৪৪ হিজিরা ইদ-ই ফিতরের দিন) বাদসাহ তাঁহার সাধের তক্তাউসে উপবেশন করিলেন।

জাগতিক সমাজ কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। তখন কিছুই চিরস্থায়ী হইবে কিরূপে। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সহিত এই মহামূল্য বস্তুও ভারত

হইতে অন্তর্হিত হইল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশ হইতে আসিয়া নাদীর সাহ নামক এক দস্যু-ভূপতি দিল্লী অধিকার করেন। তখনও ভারত বাসী হিন্দু মুসলমানের কিছু কিছু ক্ষমতা ছিল সুতরাং নাদির সাহের সৈন্যদিগের সহিত নগরবাসীদিগের কলহ হইল। তিনি আজ্ঞা দিলেন দিল্লীর অধিবাসীদিগের শিরশ্ছেদন করত সহর লুণ্ঠন কর। এই লুণ্ঠনের সহিত সাহজাহানের কীর্ত্তিস্তম্ভ তক্ততাউসও লুণ্ঠিত হইল।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

অবরুদ্ধ।

কেমনে ত্যজিবে দেব ভক্তের মন্দির ?
সারা বিশ্ব রোধিয়াছি সুদৃঢ় অর্গলে—
জ্বলিতেছে হোম অগ্নি, দুন্দভি গভীর,—
শিরা শিরা প্রতিঘাতে উন্মাদক রোলে
করিয়াছি এই আত্মা পূর্ণাহুতি দান—
আজি এ প্রণবে দেব স্তম্ভিত সকলি—
কায়মন তব অগ্রে দিয়ে বলিদান
হৃদি সিংহাসন মাঝে নেহারি কেবলি
জীবন্ত দেবতা মোর প্রিয় দরশন
কিবা রূপ কি মাধুরী খিলাইছ তুমি
কমনীয় কমকান্তি মরি অতুলন
নারকীর অন্তস্তল পুণ্যতীর্থ ভূমি
জন্মান্তর উপার্জ্জিত কত পুণ্যফল
প্রেমানন্দে আলোড়িছে মম হৃদিতল।

শ্রীমৃণাল বালা দেবী।

সুধা।

(গল্প)

নীরব নিশীথে নির্ম্মল নীলাকাশ চন্দ্রমার রজতকিরণধারায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সে দিন দোলপূর্ণিমা। মধুর বসন্তে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পাপিয়া প্রাণ ভরিয়া গান গাহিতেছিল। ফুলের সুগন্ধে দিক সকল আমোদিত হইতেছিল। নিভৃতে নির্জ্জন গৃহকোণে বসিয়া শশী-শেখর ভাবিতেছিলেন—"কি অন্যায় কাজই করিয়াছি।"

মস্তকোপরি শৈলের তৈলচিত্র সুশোভিত ছিল। ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া শশীশেখর বলিতে লাগিলেন, "শৈল এখনও তোমায় ভুলিতে পারি নাই—ও এ জীবনে যে ভুলিব তাহাও মনে ভাবিতে পারি না,—চিরদিন যেমন পূজা করিয়াছি জীবনের শেষ অবধি তেমনি পূজা করিব—তারপর—তারপর আমাকে তোমার পার্শ্বে ডাকিয়া লইবে কি ?"

তৈলচিত্র নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে তিরস্কারের কঠোরতা ছিল না; বিদ্রূপের মৃদু হাস্য ছিল না। সে দৃষ্টি স্থির, অচঞ্চল,—কিন্তু কোন অজ্ঞাত সকরুণ ভাব তাহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল।

শশীশেখর সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "শৈল তুমি বৃথা আমায় দোষী করিতেছ, আমি আপন ইচ্ছায় বিবাহ করি নাই। মাতা আপনার জিদ্ বজায় রাখিয়াছেন—কিন্তু তোমাকে অন্তরের পর করিতে পারেন নাই। আমার অন্তরে বাহিরে তুমি। এ হৃদয়ে সুধার স্থান তিল মাত্র নাই।"

পশ্চাতে কোমল মধুর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"প্রিয়তম আমি আসি-য়াছি।"—

গৃহমধ্য চন্দ্রালোকে আলোকিত ছিল। মধুর জোৎস্না আহ্বানকারিণীর সমগ্র দেহ ও মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শেখরের চমক ভাঙ্গিল পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন অনিন্দ্যসুষমাময়ী অপূর্ব্ব, রমণী মূর্ত্তি। কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "সুধা এখানে কেন আসিয়াছ, যাও মার কাছে যাও।"

নতনেত্রে অতি ধীরে সুধা বলিল "প্রভু, আজিকার মত অপরাধিনীকে ক্ষমা কর, আজ দোলপূর্ণিমা আমার সাধ পূর্ণ করিতে দাও, পায়ে ঠেলিয়াছ বলিয়া একদিনের ভিক্ষা অপূর্ণ রাখিও না।"

শেখর নীরবে রহিলেন। তখন সুধা হস্তস্থিত আবীর কুঙ্কুমে তাঁহার পদদ্বয় রঞ্জিত করিল। অনেকদিন পরে স্বামীর পদনিম্নে সুধা লুটাইয়া পড়িল। পরিশেষে বলিয়া উঠিল—"হৃদয় দেবতা আমার পূজা শেষ হইয়াছে, আমি চলিলাম। সুধা চলিয়া গেল। উর্দ্ধে আবদ্ধদৃষ্টি শেখর অচল অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

২

তার পর কতদিন হইয়া গিয়াছে। কত নিদ্রাহীন নিশা অতিবাহিত হইয়াছে। শশীশেখরের হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগ কিছুতেই শান্ত হইল না। কত নীরব ভিক্ষা কত সকাতর নয়নে তাঁহার হৃদয় টলিল না—শুধু এক চিন্তা, এক ভাবনায় তাঁহার দেহ জীর্ণ হইতে লাগিল। যতদিন সহিতে পারা যায় ততদিন শেখর নীরবে সহিলেন। তারপর যখন যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল তখন একদিন নিশাযোগে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন।

তখন কুম্ভের মেলায় কত যাত্রী কত সন্ন্যাসী তথায় উপনীত হইয়াছে। অগণ্য বিপণিশ্রেণীতে এ মহাতীর্থের কলেবর ছাইয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। যমুনার কাল জল গঙ্গার শুভ্র জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। এদৃশ্য বড় সুন্দর বড় মনোরম।

প্রথম কয়দিবস শেখরের এক প্রকার কাটিয়া গেল। নূতন স্থানে নূতন দৃশ্য দেখিয়া কাহার না হৃদয় পুলকিত হয়? শেখর বহুবিধ সাধু সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া এক প্রকার মনের স্থিরতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থিরতা কয়দিনের জন্য? আবার কিছুদিন পরে মনের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় হইল। যাহার পিয়াস মায়ামাত্র সে কি কখন শান্তি লাভ করিতে পারে? শশীশেখর অস্থির চিত্তে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৩

সুধা ভাবিল "যদি আর একবার তাঁর দেখা পাই, কতদিন গিয়াছেন।" সুধার নয়নে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। সেই তৈল চিত্রের সমক্ষে দাঁড়াইয়া সুধা বলিতে লাগিল—"দিদি তোমার মত ভাগ্যবতী জগতে ধন্য, তুমি পতির ভালবাসা লাভ করিয়াছ আমি হতভাগিনী তোমার ধন কাড়িয়া লইবার প্রয়াস করিতেছি।" সুধা থাকিতে পারিল না চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। সুধা কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "দিদি তোমার জিনিষ আমি লইতে চাই না আমি শুধু পূজা করিতে চাই—আমার বাসনা পুরিবে না কি?" পশ্চাৎ হইতে ননদিনী ডাকিল—"বউ কাঁদিতেছ কেন?" অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সুধা কহিল "ঠাকুরঝি—মনের যে কত কষ্ট কি করিয়া জানাইব, মানুষ, বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, গাছ পাথর হইলে এতদিন ফাটিয়া পড়িতাম, তাঁর খবর লইবার কি কোন উপায় নাই?" শিবানী ধীরে ধীরে সুধার মুখখানি তুলিয়া বলিল—"বউ ভেবে ভেবে কি পাগল হইবি, চল্, সমস্ত দিন কিছু খাস্‌নি, খাবি চল্, দাদার খবর আসিয়াছে, এখন বৃন্দাবনে আছেন। উত্তেজিত স্বরে সুধা বলিল "আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব, তুমি মাকে বল।" শিবানী বলিল—বউ তুই নিশ্চয় পাগল হইয়াছিস্, দুদিন বাদে ত আবার ফিরিয়া আসিবেন।"

সুধা তবুও বলিল—"না দিদি তিনি কখনই অমনি আসিবেন না, চল আমরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি।"

"আচ্ছা তাই হ'বে, আমি রবিকে বল্‌ব এখন, তুই এখন চল।"

রবি, শশীশেখরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুধা নামমাত্র খাইতে বসিল। স্বামী বিরহে সতী ক্ষুৎপিপাসা বিরহিত হইয়াছিল।

এই দীর্ঘবিচ্ছেদে তাহার অত্যুজ্জ্বল দেহকান্তি কথঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়াছিল। দেহলতা নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছিল। পুত্রশোকাতুরা শাশুড়ী কহিলেন "কেন মা অত ভাবিতেছ, চল মা আমি তোমায় বৃন্দাবনে লইয়া যাইব, আমারও শেষ দশায়—শ্রীগোবিন্দের চরণ দর্শন হইবে।"

তখন শিবানী বলিল "মা, তবে চল আমরা সকলে রবিকে সঙ্গে করিয়া দাদার অন্বেষণে বাহির হই। সে যে আবার কোথায় যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই, বউও তাহা হইলে—আর বাঁচিবে না।"

এইরূপে সকলের তখন বৃন্দাবন যাত্রা স্থির হইয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মাতা, কন্যা ও বধূ, পুত্র রবিশেখরের সহিত পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। একদিন যে গৃহে হাসির লহর উঠিত, আজ তাহা নিবিড় নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল।

৪

নীলসলিলা স্বচ্ছ যমুনা, নীরবে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, হায়! আজ সে বাঁশীর রব নাই, যাহাতে যমুনা উজান বহিত। যে বাঁশীর রবে গৃহবাসিনী গোপিকার মন উদাস হইত, হায়, যমুনা তোমার পুলিনে সে বাঁশরীর মধুর স্বর আজ কোথায়, আজ কোথায় সে রাধারাণী, যিনি বেণুরব শুনিয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন তোমার আজ সকলি আছে, শুধু নাই সেই মোহন মুরলী, তোমার সুন্দর কলেবর রহিয়াছে নাই শুধু প্রাণ, যুমনা তাহারি বিরহে কি তুমি শুখাইয়াছ? কত গোপিকার তপ্ত অশ্রুধারা তোমাতে মিলিত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে।

বৃন্দাবনের ধারে তমাল বন। এ বনের দৃশ্য অতি মনোরম। শিখীর মধুর নৃত্য বনের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই বনমধ্যেই একখানি কুটিরে বসিয়া দুইজন সন্ন্যাসী কথোপকথন করিতেছিলেন।

অচ্যুতানন্দ কহিলেন "বৎস তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কঠোর কর্ত্তব্য এখনও তোমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার এখন কর্ম্মযোগই পালন করা উচিত জ্ঞান যোগে তোমার অধিকার নাই।

অপর সন্ন্যাসী কহিল—"প্রভু গৃহে আমার শান্তি নাই আমি জ্ঞানের দ্বারা শান্তিলাভ করিতে চাই।"

অচ্যুতানন্দ গোস্বামী হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বৎস নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখ সম্মুখে তোমার কি মহৎ কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে? পুত্র শোকবিধুরা মাতা সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া

রহিয়াছে দীর্ঘ বিরহে কাতরা পতিগতপ্রাণা সতী স্বামীর দর্শনলালসায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে; বৎস, অন্ধ হইও না তোমার বাসনা সকল এখনও বলবতী, যাও গৃহ ধর্ম্ম পালন কর মনে শান্তি পাইবে।"

এই কথা বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। ধ্যানস্তিমিতলোচন শশীশেখর মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৫

প্রকৃত পক্ষে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শেখর আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। শান্তির আশায় যতদূর যাইতে লাগিলেন প্রাণের ভিতর ততই যেন কি একটা অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। শান্তির আশায় শেখর কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু পারিলেন না।

হৃদয়ের একটা স্থান শূন্য ছিল, কিন্তু কে যেন সে শূন্যস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতেন কে যেন তাহার পদদ্বয় নয়নের নীরে ধৌত করিতেছে—কত বারণ করিতেছেন সে বারণ মানিতেছে না—পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কত সাধিতেছে, তিনি তাহাকে উঠাইতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না কে যেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেছে। বৃন্দাবনে আসিয়া শেখর যেন উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই জন্যই তিনি অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি কতদূর শান্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা পাঠক জানিয়াছেন। আজ সারা দিবসের ক্লান্তির পর শেখর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু নিদ্রাতেও তাঁহার মন শান্তি লাভ করিলনা। শেখর এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

* * * * *

শৈল কহিল—"প্রিয়তম আর কতদিন এরূপ অশান্তিতে থাকিবে, সুধাকে লইয়া সুখী হও"।

শেখর কহিলেন—"তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া সুখী হইব শৈল।"—

শৈল বলিল,—"রমণী স্বার্থপর নহে, আমি মরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাকে অসুখী হইতে দিবনা, সেই জন্যই সুধার হাতে সঁপিয়া তোমাকে গিয়াছি।"

শৈল অদৃশ্য হইল। কিন্তু আবার সেই দৃশ্য! নয়ননীরে কে যেন তাঁহার পদযুগল ধৌত করিতেছে—যেন কত বুকভরা ভালবাসা লইয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে। শশীশেখর চমকিত হইলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সুধা, সুধা,"। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন সত্যই তাঁহার পদদ্বয় কে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছে।

৬

চিন্তায় চিন্তায় শশীশেখরের দেহ ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। অচ্যুতানন্দ স্বামী তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। পাছে শেখরের মাতা ও পত্নী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া চিন্তিত হন, সে জন্য তিনি এবিষয়ে কোন কথা তাঁহাদিগকে জানিতে দেন নাই। কিন্তু যখন জ্বরের প্রকোপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন তিনি তাহা দিগকে আনিতে বাধ্য হইলেন।

পতিগতপ্রাণা সুধা স্বামীর পদ প্রান্তে বসিয়া দিবারাত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন—আহার নিদ্রা বিরহিত হইয়া সাধ্বী সতী গোবিন্দের চরণারবিন্দে প্রার্থনা করিতেন—"প্রভু আমার স্বামীকে রক্ষা কর।" কত নীরব রজনী কাটিয়া গেল, শশীশেখরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। বিকারের ঘোরে তিনি, প্রলাপ বকিতেন—"শৈল আমার কাজ শেষ হইয়াছে আমাকে তোমার পার্শ্বে ডাকিয়া লও।" মাতা ও সুধা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। অচ্যুতানন্দ কহিলেন, "তোমরা অধীরা হইওনা, ইহাতে রোগীর অবস্থা আরও মন্দ হইতে পারে।" অনেক কষ্টে তাঁহারা আত্মসংবরণ করিলেন, কিন্তু মন প্রবোধ মানিলনা। শেখরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। যখন একটু ভাল থাকিতেন। স্থির দৃষ্টিতে সুধার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। একদিন বলিয়া উঠিলেন— "শৈল আমার, আসিয়াছে। চল প্রাণেশ্বরী আমরা দুই জনে হাত

ধরাধরি করিয়া অনন্তের পথে চলিয়া যাই, আমাদের কেহ বাধা দিতে পারিবেনা।” নিদারুণ শোকে নীরব যাতনায় সুধা কাঁদিয়া উঠিল। বুঝি সে ক্রন্দনে শেখরের জ্ঞান হইল।

শেখর বলিলেন “সুধা তুমি কাঁদিতেছ—কাঁদিওনা, তোমার তপ্ত অশ্রুতে আমার হৃদয় উত্তপ্ত করিওনা। আমাকে যাইতে দাও এ জীবনে তোমার হইতে পারিলাম না, যদি মৃত্যুর পর জীবন থাকে তবে আবার আমরা মিলিত হইব, আবার তোমায় ও শৈলকে লইয়া জীবনের পরে সুখী হইব।” শেখর নীরব হইলেন। রোরুদ্যমানা সুধা পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

অনেক নিদ্রাহীন রাত্রির, অনেক অনশনক্লিষ্ট দিবসের অবসন্নতায় সুধার দেহলতা নির্জ্জীব প্রায় হইয়াছিল। সুধার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে কিন্তু সময়ে সময়ে এইরূপ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। একদিন শশীশেখরের ব্যাধি প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিল। অচ্যুতানন্দ কহিলেন—“মাতা চিত্ত স্থির কর আজ তোমার ভীষণ পরীক্ষার দিন—গোবিন্দের পদে আত্মসমর্পণ কর।” শোকাতুরা মাতা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনে পাপী শেখরের চমক ভাঙ্গিল। তিনি কহিলেন “মাতা কাঁদিওনা আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি চলিলাম।” ঘোর বিকারের প্রকোপে তিনি দেখিতে লাগিলেন—যেন শৈল অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন “শৈল আমি যাইতেছি।” সেইদিন নিশাবসানে শেখরের প্রাণপাখী পিঞ্জর মুক্ত হইয়া অনন্তের পথে উড়িয়া গেল। বালিকা সুধা স্বামীর পদ প্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

* * * * *

৮

তারপর বৃন্দাবনে অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। মাতা ও সুধা বৃন্দাবনে অচ্যুতানন্দ স্বামীর আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। শেখরজননী যথার্থই গোবিন্দের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণেই তিনি নিদারুণ পুত্রশোক জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন মনুষ্যের চিত্ত ভগবানে আকৃষ্ট হয় তখন পার্থিব শোকে তাহাকে আকুল করিতে

পারে না। আর বালিকা সুধা—আ মরি মরি এ কনক অঙ্গে কি শ্বেত শুভ্র বস্ত্র শোভাপায়? এ দৃশ্য হৃদয়-বিদারক। এদৃশ্যে সংসারের প্রতি বীতরাগ জন্মে। সুধা সেইদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল যে দিন মরণের পারে সে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবে। সুধা বুঝিয়াছিল, প্রেম অবিনশ্বর, মৃত্যুর পর প্রেমে বিচ্ছেদে নাই প্রেমে অনন্ত মিলন। উৰ্দ্ধপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিত, "হে হৃদয় দেবতা,—হে চিরবাঞ্ছিত তুমি বহুদূরে থাকিলেও আমার অন্তর হইতে দূরে নহ। এ হৃদয়মন্দিরে চিরদিন তোমার পূজা করিব। আমার আর দেবতা নাই আমার দেবতা তুমি। যদি সাধনায় জয় থাকে তবে জীবন শেষে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব; হে প্রিয় আর আমায় চরণে ঠেলিও না।"

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সোম।

রাঠোর-বালক।

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিতোর যে দেখিতেছ আঁধার নীরব
প্রতি শিরা উপশিরা হবে উত্তেজিত,
ভাব যদি একবার কিসের কারণ
মানসের সরোবরে ফুটন্ত কমল,
ভক্তি সুরভিত, ছিঁড়ি, দিবে উপহার,
তুচ্ছ করি দেববৃন্দে, বীর পদতলে
রাজবারা পুত্রগণে; বীরেন্দ্র জনক
দেবী জননী সম্ভূত। বিশাল সৃজনে
যোগ্যতম কোন যোগ্যে করিবে অর্চনা
প্রাণ তব, সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ প্রণমি?

রাজোয়ারা কহিনূর, প্রতাপ সুবীর
ম্লেচ্ছরণে করিয়াছে কত জ্ঞাতিদান
প্রাণপণে যুঝিয়াছে কত মহারণ,
রক্ষিতে বংশের মান রতন অমূল্য ;
সাগরের বারিসম ম্লেচ্ছ অগণিত
বার বার রোধিয়াছে সম্মুখ সংগ্রামে
পরিত্যক্ত প্রতিদুর্গ, অদ্রি উপত্যকা
গর্ব্বে কহিবে কাহিনী—আজও পবন
সবিস্ময়ে ধ্বনিতেছে অবিরাম স্বনে
প্রত্যেক বৃক্ষের শিরা হতেছে কম্পিত।

রাজভোগে রাজসুখে সুবর্দ্ধিত কায়
প্রতাপ মিবাররাজ—ভ্রমিছ কোথায়
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন,
সুদীক্ষিত মহামন্ত্রে ; কঠোর তপস্যা,
কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি, তোমারেই সাজে
প্রাণসম পুত্র কন্যা নবনীত কায়,
অনশনে অদ্ধাশনে হীন আহারীয়ে,
কি কষ্টে যাপিছে কাল সম্মুখে তোমার
নিরখিয়া রহিয়াছ অচল অটল
নিবাত নিষ্কম্প স্থির সাগরের জল।

ভয়ানক বিসদৃশে ক্লান্ত কলেবর
অবসন্ন হস্ত পদ, তবুও হৃদয়
সামান্য মুহূর্ত্ততরে চাহেনি বিশ্রাম
লয়ে স্বাধীনতাধন দুর্গম কান্তারে,
গুপ্ত ভীলের আবাসে, করেছ প্রবেশ
দীর্ঘলতা গুল্ম দুর্ব্বা ভগ্ন অট্টালিকা,

কি ভীষণ করিয়াছে সুন্দর চিতোরে—
একটী মানব নাহি ভ্রমিছে তথায়,
মদমত্ত দিল্লিপতি কি জিনিবে হায়
স্থাবর জঙ্গমে শুধু করুণ শাসন।

ওই সে ঝুলিছে বৃক্ষে—নরের কঙ্কাল
এ বিজনে একমাত্র মানব নিশানা
হতভাগ্য মেষপাল—রাজআজ্ঞা ঠেলি,
বর্ব্বর করিতেছিল মেষের চারণ
আজ্ঞাকারী অনুচরে হুঙ্কারি নাশিয়া
দোলায়েছে পাপদেহ। রাজআজ্ঞা হেলা
কঠোর বিদ্রোহ শাস্তি ঘোষিছে চৌদিকে
শকুনি গৃধিনী বেশী যমদূতগণ
উপাড়িছে চক্ষুকর্ণ। ভুঞ্জিছে পামর
উপযুক্ত কর্ম্মফল স্বকৃত অর্জ্জন।

এ সাধনা মহাব্রত দিবে নাকি ফল
এই যে একাগ্রপূজা হবে কি বিফল?
বিশ্বের সৃজন কর্ত্তা নাহি কি দেখিবে
সুদূর প্রদেশ হতে নিম্ন ধরাতলে?
এত স্বার্থ বলিদান নাহি কি ভোলাবে
তাঁরে কৃপাকণা দানে? পূজ্য পিতা তিনি,
সন্তানের এত গুণে নাহি উল্লসিবে
গুণগ্রাহী হৃদি তার? স্নেহশীলা মাতা,
অবহেলি এত পূজা সম্মুখে তাঁহার
অভয় মঙ্গল বাক্যে নাহি আশীষিবে?

শ্রীউমাচরণ ধর।

জাতীয়তা।

মানবতত্ত্ববিদ্‌দিগের শ্রমসাধ্য আলোচনাফলে নির্ণীত হইয়াছে যে, সমাজ ব্যতীত মানব থাকিতে পারে না। এই কারণেই মনুষ্যকে সামাজিক জীব (Social animal) বলাযায়। মনুষ্য যতই কেন অসভ্য ও বর্ব্বর হউক না—সে বহুস্তর সমাকীর্ণ মানব জাতির যে স্তরভুক্ত হউক না কেন, সকল সময়েই সকল দেশেই মনুষ্যগণ সমাজে বাস করে। *

বন্য পশুদিগের মত তাহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারে না। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় আপনাপন, শরীর সম্পত্তি, ও সুযশ রক্ষা, করিবার জন্য ঐক্য ভাবে এক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বাস না করিলে মানবের পক্ষে জগতের জীবন সংগ্রামের ভীষণ বেগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চনীতিবাদিরা ত মানবের সমাজ বাসের সুখ্যাতি করিবেন; পরন্তু স্বার্থবাদিরাও মানবের এই প্রকার একত্র হইয়া কার্য্য করার পক্ষপাতী।

হব্‌স্‌, লক্‌, রোসোঁ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—মানবের উদ্দেশ্য, মনুষ্যজাতির প্রধান প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্য এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা—যাহা তাহার আত্মসুখ বৃদ্ধির হেতু হইবে। এই সাধু উদ্দেশ্যেই মানব জাতি "আদিম চুক্তির" (Original Contract) দ্বারা আপনাপন সুখ স্বচ্ছন্দতার পুরিপুষ্টির জন্য সমাজ সংগঠিত করিয়াছে। সাধারণ সম্মতিক্রমেই রাজা শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া মেদিনাগর্ভ হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং অপরাপর প্রজাবৃন্দ স্বীয় যোগ্যতা ও পারদর্শিতা অনুসারে সমাজের এক একটি আবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে। হব্‌সের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার তর্কাদির অবতারণা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। †

---

* এই স্বাভাবিক বৃত্তিটী অগষ্ট কোম্‌তে—Spontaneous Sociability of human nature —বলিয়াছেন।

† Sir Henry Maine প্রমাণ করিয়াছেন :—"The movement of progressive Societies has hitherto been a movement from status to contract. এ বিষয়ে Holland's Jurisprudence Lecture IX দ্রষ্টব্য।

তবে স্বার্থবাদিদিগের মতেও যে মানবের সামাজিকতা প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয় তাহা হবস্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

এরূপ একতা—এরূপ বহুর একভাবাপন্ন হইয়া এক সমাজ সংগঠন করার প্রণালী—কতক গুলি ইতরপ্রাণীর মধ্যে ও দেখিতে পাওয়া যায়। উঁই পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি জীবের ও এক একটি সমাজ আছে, তাহাদের সমাজেও রাষ্ট্র, রাজধানী, শাসনকর্ত্তা, প্রজা প্রভৃতি আছে কিন্তু সেই সকল সমাজে মানবসমাজের সমতুল্য স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ নাই। পশুজ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া মধুমক্ষিকা তাহার চক্রে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখে. রাজবিদ্রোহী হইবার উপায়, জ্ঞান ও সম্ভাবনা নাই বলিয়াই সারা দিন ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাহিয়া মক্ষিকা তাহার রাজ্ঞীর সেবা করে। নৈমিষারণ্যের দক্ষিণ দিকের পর্কটী বৃক্ষাবস্থিত মধুচক্রের শাসনপ্রণালী, সমাজের গঠন ও রাজ্ঞীর ক্ষমতা যেরূপ —দক্ষিণারণ্যের পশ্চিম দিকের আম্র শাখাবিলম্বিত চক্রটির শাসনপ্রণালী প্রভৃতিও ঠিক সেই প্রকারের। মানবের সামাজিকতার কিন্তু একটা বিশেষত্ব ও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইউরোপের সমাজ সকলের রীতি, নীতি, আশা ভরসা প্রভৃতি আসিয়ার প্রদেশসমূহের রীতি নীতি আশা ভরসা প্রভৃতির অনুরূপ নহে। এসকিমোর সমাজের বন্ধন যেরূপ জুলু জাতির সমাজ বন্ধন ত সেরূপ নহে!

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—
"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভি র্নরাণাম্
জ্ঞানঞ্চ তেষাম্ অধিকো বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

অনুবাদঃ—আহার মৈথুন নিদ্রা আর দেখ ভয়
মানবে পশুতে সবে সমতুল্য হয়।
মানবে বেশীর ভাগ আছে কিন্তু জ্ঞান,
জ্ঞানহীন নর সে ত পশুর সমান।

এই জ্ঞানের দীপ্তি দ্বারা জগতের আদিকাল হইতে মানব বুঝিতে পারিয়াছে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মত একা একা বাস করিলে জীবন সংগ্রামের ভীষণ ব্যাপারে তাহাদের অস্তিত্ব অচিরেই কালের অনন্ত ব্যোমে বিলীন হইয়া যাইবে।

মনুষ্য শারীরিক দৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও এই একতার এই পরস্পর সহানুভূতির বলে বলীয়ান্ হইয়াই আজ সমগ্র ইন্দ্রিয়গম্য জড় ও চেতন জগতের কর্তৃত্ব নিজ করতলগত করিয়াছে। মনুজ তনয় বুঝিয়াছে যেমন—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ," –সেইরূপ তাহারাও যদি একজোট হইয়া কার্য্য করে তাহা হইলে তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। এইরূপ একটা কারণবশতই যে পুরাকাল হইতে মানব এক একটি সমাজ সংগঠন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শিখিয়াছে—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। * কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বলশালী নর নিজ বাহুবলে অপরাপর নরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজের ও তাহার অধিকারভুক্ত নরদিগের সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে। কোথাও বা এক প্রকার বিপৎপীড়িত হইয়া কতকগুলি মানব একত্র হইয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে। আবার কোথাও সদ্‌গুণবিভূষিত মনীষির বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া মনুষ্যগণ একটি স্বতন্ত্র সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে নানা কারণ বশতঃ মনুষ্য জাতি পরস্পরের সহিত জাতীয় সূত্রে আবদ্ধ থাকে। তাহারা পরস্পর সাহায্য দ্বারা তাহাদিগের দলমধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের এবং সেই দলের উন্নতি বিধান করে। দেশ কাল পাত্রের বিভিন্নতা বশতঃ প্রত্যেক মানব সম্প্রদায়ের এক একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই এক একটি সম্প্রদায় বা সমাজভুক্ত ব্যক্তি সমষ্টিকে এক একটি জাতি কহে। এই সকল জাতির শাখা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়।

---

* অবশ্য পারিবারিক জীবনই আদিম সমাজের ভিত্তিশিলা। একই বংশবল্লী হইতে উদ্ভূত মানব সমষ্টির এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ ছিল। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ দ্বারা সমাজ সংগঠন অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আর এক প্রকারেও কেহ কেহ মানবের জাতীয়ত্ব বর্ণিত করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—শারীরিক আকার গঠন প্রভৃতির বিশেষত্ব বশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত অনেক নরকেও এক জাতীয় বলা যায়। এইরূপ শারীরিক আকারাদির সাদৃশ্য জন্য মনুষ্য জাতির যে বিভাগ করা যায়, সেই সকল এক একটি বিভাগকে ইংরাজিতে এক একটি Race (রেস) বলে।—যেমন, আর্য্য, মলয়, জুলু, দ্রাবিড়ীয় ইত্যাদি। দুইটী জাতির সংমিশ্রণ হেতু আবার কোথাও নূতন জাতির সৃষ্টি হয়—যেমন আমেরিকায় মালেট্টো জাতি (Mullattos.)। এ সকল মানবতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য। আমাদিগের আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক জাতি বা Nation.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্য জাতির সম্প্রদায় গঠনে একটা স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আছে। শুধুই আদিম এক জাতি (Race) হইতে উৎপন্ন সকল ব্যক্তিই একত্র মিলিত হইয়া কার্য্যাদি করে না—আত্মোন্নতি সম্পাদনার্থ কেবল এক আকার ধারণ বশতই কতক গুলি লোক একটি রাষ্ট্র নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না। তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীক বা ভারতবর্ষের অসংখ্য ছোট ছোট রাজত্বের সৃষ্টি হইত না—তাহা হইলে ইংরাজ মার্কিনের যুক্তরাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিত না বা জাপান চীন দিগের দুর্ব্বলতা পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশিত করিয়া দিয়া তাহাদিগের সাম্রাজ্য লালসা বর্দ্ধিত করিয়া দিতনা। শারীরিক লক্ষণাদির উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্যের যে বিভাগ করা যায় মনুষ্যপরিচালিত রাষ্ট্র গুলিরও যদ্যপি তদনুরূপ বিভাগ করা যাইত তাহা হইলে আধুনিক জগতে ৪টি কিম্বা ৫টী বৃহৎ সাম্রাজ্য থাকিত মাত্র সন্দেহ নাই। আর সেই ৪টী বা ৫টী সাম্রাজ্যই বা থাকিত কেমন করিয়া মনুষ্য ত প্রথম একই দম্পতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কিম্বা আমাদিগের মতে একই ব্রহ্মার মানস হইতে মনু প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল—তাহা হইলে সসাগরা পৃথিবী বিস্তৃত একটী সাম্রাজ্যই থাকিত।

সুতরাং "নেশন" অর্থে জাতি বুঝাইলে জাতি শব্দের অর্থ অন্যরূপ বুঝায়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill.) বলেন—যদ্যপি কতকগুলি মনুষ্য পরস্পরের সহিত সহানুভূতি দ্বারা আবদ্ধ থাকে—যদ্যপি এরূপ বন্ধন তাহাদিগের সহিত অপর কাহারও না থাকে,

যদ্যপি এরূপ বন্ধন জন্য তাহারা অপরের অপেক্ষা তাহাদিগের পরস্পরের সহিত কার্য্য করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছুক হয় এবং সকলে এই শাসন প্রণালী কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করে—তাহা হইলে সেই মনুষ্যের সমষ্টিকে একটি জাতি বলে। Sidgwick. (সিজউইক), বলেন সুসভ্য মনুষ্য বলিলে তাহার কতকগুলি সাধারণ গুণ আমাদের ধারণার অন্তভূত হয়। কেবল এই গুণ গুলি যাহাতে আছে এমন ব্যক্তি মাত্রেরই সমষ্টিকে একটি বিশেষ জাতি বলা যাইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে সেই সমষ্টিকেই জাতি কহে, যাহার অন্তর্ভুক্ত অধিক সংখ্যক লোকের এই সকল সাধারণ গুণ ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ স্বভাব আছে যাহা নির্দ্ধারিত রূপে বর্ণনা করা দুরূহ—অথচ যাহাকে ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতির জাতীয় গুণ বলা যায়।

এই জাতীয় ভাব মনুষ্যমনোমধ্যে বহুপ্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ এক (race) জাতি হইতে উৎপত্তি ইহার কারণ। তাহা ব্যতীত এক ভাষার কথন, এক ধর্ম্মের যাজন একই প্রকারের রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি নানাকারণে মনুষ্য এক জাতি ভুক্ত হয়। কিন্তু আদিম উৎপত্তি বিভিন্ন হইলেও বা জাতীয় আচার ব্যবহার এক প্রকারের না হইলেও এবং এমন কি মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়বন্ধন অর্থাৎ ধর্ম্ম বন্ধনও এক না হইলেও এক দেশে অবস্থিতি করিয়া এবং একই শাসন প্রণালীর দ্বারা শাসিত হইয়া অনেক মানব সম্প্রদায় একটি বিভিন্ন জাতীয়তার স্রষ্টা হইয়াছে।

যখন আমেরিকার উপনিবেশ গুলি মাতৃরাজ্য ইংলণ্ড হইতে বিভিন্ন হইয়ছিল—তখনকার আমেরিকায় একটি জাতি আছে বা সহসা উৎপন্ন হইতে পারিবে বুঝিলে—তৃতীয় জর্জ বা লর্ড নর্থ ভুল ক্রমে ইংরাজ সাম্রাজ্য হইতে আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেন না। তৎকালীন আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রে ফরাসী অধিবাসীর প্রধান্য ছিল,—কোন কোনও প্রদেশে বা রাজ ভক্তি প্রবল ছিল, আবার কোথাও বা অধিবাসীগণ মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে

1. Mill's Repiesentative Government. ch XIV
2. Elements os Politics pp 13-14

গেলে আমেরিকার প্রত্যেক উপনিবেশ অপর উপনিবেশ হইতে স্বতন্ত্র ছিল এবং আমেরিকার প্রদেশ গুলিতে যেমন ধর্ম্মের পার্থক্য ছিল এমন আর কোথাও ছিলনা। কোনও রাষ্ট্রে ইণ্ডিপেন্‌ডেণ্ট্‌দের আধিক্য কোথাও বা পিউরীটান্‌ প্রাধান্য, কোনও রাষ্ট্র বা ক্যাথলিক ধর্ম্ম উপাসক পরিপূর্ণ, কোথাও বা ওয়েস্‌লি ও হুইটু ফিল্ডের ধর্ম্ম সংস্কারের প্রভাব সর্ব্বাধিক। কিন্তু ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বোষ্টনের চা হাঙ্গামার পর ইংরাজ পার্লামেণ্ট যখন বোষ্টন বন্দরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিল—যখন ইংলণ্ডেশ্বর ম্যাশাচুশেট্‌স্‌ প্রদেশের গভর্ণরকে লিখিলেন ——

"আমরা যতদিন মেষ শাবক সদৃশ শান্ত থাকিব ততদিন উহারা সিংহের মত আস্ফালন করিবে, কিন্তু আমরা দৃঢ় হইলে তাহারা অচিরে শান্ত ভাব ধারণ করিবে।"—

তখন আমেরিকা যাহা করিয়াছিল তাহা ভাবিবার কথা। সমবেদনায় অধীর হইয়া সাহসী মার্কিণবাসী বুঝিল—অদ্য যাহা ম্যাশাচুশেট্‌সের ভাগ্যে ঘটিল কল্য তাহা ভার্জ্জিনীয়ার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে। তাই ১৪ই সেপ্টেম্বরের ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেসে জর্জিয়া হইতে সেণ্টলরেন্স পর্য্যন্ত সকল রাষ্ট্রই প্রতিনিধি প্রেরণ করিল। মানবস্বাধীনতার উন্নতির কল্পে ইতিহাসে সেই দিবসের কার্য্য কলাপ স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে"। সেই দিবস হইতে যুক্তরাজ্যবাসীর জাতীয়তার প্রারম্ভ। এখন প্রত্যেক ইয়াঙ্কী সদর্পে বলে-"জান আমি কোন জাতি—আমি আমেরিকান্‌।"

মুসলমান প্রাধান্যের সময়ও একদিন এইরূপ ঘটিয়াছিল। সমগ্র পশ্চিম আসিয়ার অধিবাসী মিশরের অধিবাসী এবং এমন কি ইউরোপেরও কতক অংশের অধিবাসী এক জাতি হইয়া গিয়াছিল। মানবতত্ত্ববিদের বিভাগের সহিত মিলাইয়া দেখিলে কিন্তু বুঝা যায়—কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণে এই মুসলমান জাতি গঠিত হইয়াছিল।

সুইট্‌জারলণ্ডের মত প্রজাতন্ত্র স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালীশাসিত রাষ্ট্র পৃথিবীতে অল্পই আছে। তত্রত্য অধিবাসীদিগের জাত্যাভিমান অত্যধিক। কিন্তু সুইশ্‌ কাণ্ঠন সমূহে ভিন্ন ভিন্ন (Race) জাতির বসতি—তথায় বহু ভাষা প্রচলিত এবং তথাকার অধিবাসীদিগের ধর্ম্মনীতিও বহুপ্রকারের।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে এক প্রকারের রাজনৈতিক অবস্থা, সমবেদনা একই পূর্ব্ব স্মৃতি এবং সমান আশা ভরসা যেরূপ জাতীয়ত্বের সৃষ্টি করিতে পারে এমন অন্য কোনও কারণ পারেনা। এই ভারতবর্ষেই ভারতীয় জাতি বলিয়া এখনও কোন জাতির অস্তিত্ব নাই কিন্তু এক দণ্ডে শাসিত হইয়া— এক সুখে সুখী হইয়া একই অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া—সমগ্র ভারতবাসী একতা শিক্ষা করিতেছে—ভারতে নিস্তব্ধে ঐকটি জাতীয়ত্বের সৃষ্টি হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

মিল বলেন,—যখন এই জাতীয়ত্ব ভাব প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক শাসনাধীন করা উচিত।—ইহাতে জগতের পকার বৃদ্ধি হয়—ইহাতে স্বজাতিপ্রিয়তা সংবর্দ্ধিত হয়—এবং এইরূপ মিশ্রিত জাতি সমন্বিত রাষ্ট্র শীঘ্রই উন্নত হইাত পারে *। ইংরাজ জাতি বলিলে খাঁটি ইংরাজ স্কচ্ আইরিষ্, ওয়েল্‌সদিগকে বুঝায়। এক শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড স্বতন্ত্র ছিল—আবার তাহার শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ পার্লামেণ্ট ও স্কচ পার্লামেণ্টের বিভিন্ন অস্তিত্ব ছিল। এখন কিন্তু ইংরাজের অরি নিপাত করিতে ইংরাজও যেরূপ তৎপর—স্কচ ও সেইরূপ উৎসুক, আইরিষ ও তাদৃশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সংখ্যার হ্রাস হওয়া জগতের সুখ ও শান্তির পক্ষে যে শুভ তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ দুই বা বহুজাতির একত্র সম্মিলনে সমর সম্ভাবনা দূরীভূত হয় মানব অন্তঃকরণে বিশ্বজনীন ভাবের উদ্রেক হয়— এবং বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত পরিমাণে উন্নতি হয়।

দুইটি জাতির সংমিশ্রণে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সঞ্চিত জাতীয় গুণ-পণা প্রভৃতি নিজস্ব করিয়া লইতে পারে এবং একত্রিত হইয়া এক ভাবাপন্ন হইয়া একতাপ্রসূত ক্ষমতায় বলশালী হইয়া তাহারা আপনাদিগের সভ্যতা নীতিজ্ঞান প্রভৃতির সংবর্দ্ধন করিতে পারে।

যে দুইটি জাতি মিশ্রিত হইবে তাহারা যদ্যপি সভ্যতার একই সোপানা-বস্থিত হয় তাহা হইলে কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদ্যপি

*অপরাপর বহুকারণ ব্যতীত এই কারণ জন্য বড়লাটের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব দূষণীয়। অং সং।

সেই দুইটি জাতি সমান ভাবে উন্নত না হয়, যদ্যপি সেই দুইটি জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে এরূপ জাতির সংমিশ্রণ কোন কোন স্থানে অশুভই হইবে। এই কারণে হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি হইতে পারে নাই এবং ইংরাজ ও ভারতবাসীর সংমিশ্রণ হইতে কেবল অশুভ ফলই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

যদ্যপি অধিক সভ্যজাতির সংখ্যা বা বলহীনতাপ্রযুক্ত অল্প সভ্য জাতির সহিত তাহাদিগকে মিশিয়া যাইতে হয়—যদ্যপি স্বচ্ছসলিলা নির্ম্মল তোয়া শাখানদী আবিলজলপূর্ণা খরবাহিনী বিস্তৃতস্রোতস্বতীর অঙ্কে আপন ক্ষুদ্র সুন্দর দেহ খানি মিলাইয়া দেয় তাহা হইলে জগতে স্বচ্ছ জলের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

যখন মাসিডোনিয়ার অর্দ্ধসভ্য মহাবলী ফিলিপ ও তদীয় ভুবনবিজয়ী তনয় আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক সমগ্র সুসভ্য গ্রীক দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, যখন ডিমস্থিনিসের বাগ্মিতা প্রোৎসাহিত এথিনিয়ান জাতি মাসিডোনিয়ার সম্রাটের বিজয়পতাকার নিকট নতশির হইয়াছিল—তখন জগতের কিরূপ অনিষ্ট সংসাধিত হয়—তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

আবার এরূপও ঘটতে পারে দুইটি সম সভ্যজাতি একত্রিত হইতে অনিচ্ছুক। সে স্থানে জাতীয়তার সংমিশ্রণে অশুভই ঘটিতে পারে।

এই জাতীয়তার মূল্য কি তাহা ভাবুকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই ভারতবর্ষে যে একটি জাতীয়ত্বের অভাব হইয়াছে তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন সকলেই ইচ্ছা করেন যে "হিন্দু, জৈন, পার্সি, ইসাই, শিখ, মুসলমান" যেন এক কণ্ঠে গাইতে পারে জয় ভারতের জয়।

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

কোরাণ বিরুদ্ধ রীতি।

যদিও মহম্মদীয় মতে পৌত্তলিকতা এবং একেতর ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি নিষিদ্ধ, তথাপি আমাদিগের বঙ্গীয় মুসলমানগণ এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা কার্য্যতঃ করেন না। অবশ্য দুই দশটী শিক্ষিত মুন্সি মৌলভির কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত মুলসমানগণ বহুবিধ হিন্দু আচার ব্যবহার মত কার্য্যাদি করিয়া থাকে। বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, আমাদিগের দেশীয় মুসলমানদিগকে গো-খাদক বলিলে তাহারা সত্যই হউক বা কপটভাবেই হউক লজ্জিত হয়।

সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস তাহারা হাবিলের বংশধর এবং হিন্দুদিগের আদি পুরুষ কাবিল্।

"হাবিলের ফরজ্জল যারা
ইসলাম হইল তারা"

নদীয়া এবং যশোহরের মুসলমানের বিশ্বাস আল্লা এবং বলরাম একই পুরুষ। তাহারা বলে --

মুখ মক্কা দিল কোরাণ
হাড়ের উপর চাম্
তাইতে বেলেছে বলরাম।

নর যাহাকে সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা উন্নত বা অধিক গুণাবিষ্ট দেখে তাহার যশোগানে তাহার প্রাণ স্বতঃই প্রফুল্লিত হয়; সুতরাং খ্রীষ্ট বা মহম্মদের নিষেধ সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় Saint পূজা এবং মহম্মদীয় পীরোপাসনার প্রচলন দৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশীয় মুসলমানেরা পূর্ব্বে দুর্গোৎসবে যোগদান করিত, এবং এখনও তাহাদিগের মধ্যে অশিক্ষিতেরা শীতলা, রক্ষাকালী, ধর্ম্মরাজ, মনসা বিষহরি প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকে। এখনও বঙ্গীয় মুসলমান পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রা করে, হিন্দু জ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করে, দুর্গা পূজার সময় নব বস্ত্রাদি খরিদ করে এবং পুত্র জন্মিলে ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা করে। সধবা স্ত্রীলোক সকল মুসলমানের গৃহেই ললাটটি সিন্দুর রেখা রঞ্জিত করে। বিহারের মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত সূর্য্যোপাসনা করে এবং সাঁওতাল পরগণায় মুসলমানেরা বৈদ্যনাথের শিরে ঢালিবার জন্য মন্দিরে জল লইয়া যায়। শস্যাদি বপন করিয়া গ্রাম্য দেবতার মুসলমান কর্ত্তৃক পূজা দেওয়া পদ্ধতি বঙ্গে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। কোরাণে ভূত যোনির অস্তিত্বের কথা নাই; কিন্তু এদেশীয় মহম্মদীয়েরা কদলী পত্রে সিন্দুর দ্বারা একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ভূতের প্রীতিকামনায় তাহা

সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মোরগ এবং পারাবত 'হালাল' করে। এবং যে সব মোল্লারা এই সকল হিন্দু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' বাহির করেন তাঁহারা অবধি হিন্দুদিগের মত কবচাদি ধারণ করেন।

পীরদিগের এবং এমন কি স্বয়ং মহম্মদের পূজা করা কোরাণে "সারিকি" বলিয়া নিষিদ্ধ আছে! তাহা হইলে জগদীশ্বরের প্রাপ্য পূজার অংশীদার সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এদেশীয় সকল শ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায় পীরোপাসনা করিয়া থাকে। চারিটী প্রসিদ্ধ পীরের পূজা সমগ্র মুসলমান জগতে প্রচলিত। মজঃফরপুরের আগার আলি সাহ একটী জীবিত পীর। তাঁহার পবিত্রতা এবং ভক্তি অসামান্য; সুতরাং তিনি অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। বহু বহু শোকতাপক্লিষ্ট, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান ভোজ্যদ্রব্য, অর্থাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন করিতে গমন করে। তিনি কিন্তু কোনও উপহার গ্রহণ করেন না এবং সারাক্ষণই উদাসীনভাবে ঈশ্বরোপাসনায় কালাতিপাত করেন।

যখন কোনও ধর্ম্মনিষ্ঠ পীর সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করেন, লোক বিশ্বাস তাঁহার আত্মা জীবিত থাকিয়া মক্কা এবং মেদিনায় প্রত্যহ প্রার্থনাদি করিয়া থাকে এবং তাহার দর্গাহ বা সমাধি মন্দির একটী তীর্থস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

বিকট রোগক্লিষ্ট হইয়া বা ভূতাবিষ্ট হইয়া পুত্রকামী হইয়া বা মোকর্দ্দমাজয়াভিলাষী হইয়া মুসলমানগণ ইষ্টলাভহেতু তথায় প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। শিক্ষিত মুসলমানেরা বলেন—তাঁহারা পীর পূজা করেন না—তবে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের হইয়া দুই কথা বলিবার জন্য তাঁহারা পীরের প্রীতি সম্পাদন করেন। অশিক্ষিত মুসলমান কিন্তু এ সকল কথা বুঝেনা। সে পীরকেই পূজা করে।

প্রসিদ্ধ পীরদিগের দরগায় প্রত্যহ অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের সমাবেশ হয়, তাহারা তথায় মিষ্টান্নাদির সিন্নি দেয়;—কোরাণের স্তোত্র পাঠ করে, এবং উপহারাদি প্রদান করে। সময়ে সময়ে বাদ্যাদি শুনিয়া কেহ কেহ দশাপ্রাপ্ত হয়। তখন সে সহসা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বিশ্বাস করে সে ঈশ্বর বা পীরের নিকট নীত হইয়াছে। তাই সে চীৎকার করিয়া বলে—হাক্‌হ্যায়। তাহার নৃত্যে সমগ্র উপাসকগণের প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাহারা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করে। বারান্তরে আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ পীরের পরিচয় দিব। *

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* বেঙ্গল সেন্সেস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

❦ মাসিক পত্রিকা। ❦

(সুলভ সংস্করণ)

প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩১১। তৃতীয় সংখ্যা।

নববর্ষ।

স্বাগত হে নববর্ষ! আজি এ ভারতে—
বুঝিয়াছি সুনিশ্চয় আসিবে না আর
মঙ্গলে, বিজয়ে, যথা সুদূর অতীতে—
যবে বাল্মিকী সুকবি গাহি রাম নাম
উৎসে উৎসে সুধাধারে প্লাবিত স্বদেশ,
দ্বাপরেতে পাণ্ডুসুত আশ্রিত রক্ষনে
সাধিত তেত্রিশ কোটী দেব সনে বাদ—
কিংবা যবে বীররাণা পর্ব্বত কন্দরে
অনশনে স্বাধীনতা রক্ষিত যতনে।
করিগো মিনতি শুধু আনিও না সাথে
সমগ্র বরষব্যাপী কাতর ক্রন্দন
অনাহার অত্যাচার অকাল মরণ।
এবার অভয় দিও করুণা করিয়া
(যেন) আগমনী না ফুরাতে আসে না বিজয়া।

শ্রীউমাচরণ ধর।

আকবর সাহ।

(অধিরোহণের পূর্ব্বাবস্থা)

মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ মুসলমান শাসনে মুসলমান রাজ্য বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। রাজবংশের পর রাজবংশ ভারতাকাশে মেঘমালার ন্যায় উত্থিত হইয়া পরস্পরকে বিতাড়িত করিয়াছিল। ভারত সন্তানগণ সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান শাসনাধীন হয় নাই। হিন্দুস্থানের সমতলভূমি বাসীগণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীগণ একেবারেই অধীনতা স্বীকার করে নাই; পরন্তু তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। একাদিক্রমে বহুদিবস নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছে এমন কোন রাজবংশ ভারতে স্থাপিত হয় নাই। কখন কখন কোন পরাক্রমশালী নরপতি হিন্দুস্থানের অধিকাংশ একছত্রীকৃত করিতেন, তাহাতে বোধ হইত যে সেই রাজবংশের শাসন স্থায়ী ও সুদৃঢ় হইবে। কিন্তু চিরকালই যে পরাক্রমশালী নরপতি রাজত্ব করিবে এমন কোন কথা নাই। কোন দুর্ব্বল নরপতির রাজত্ব কালে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাহুবলে যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত; রাজত্বের সীমা ক্রমেই সংকীর্ণ হইত; এমন কি সময়ে সময়ে রাজত্বের সীমা, রাজধানীর চতুঃপার্শ্বে কয়েকটী দেশ অতিক্রম করিত না। সৈয়দের রাজত্ব কালে এইরূপই ঘটিয়াছিল। পুনরায় কোন পরবর্ত্তী পরাক্রমশালী নরপতিকে নূতনভাবে হৃত রাজ্যের বিজয় ও শাসন সুদৃঢ় করিতে হইত।

মোগল শাসন সংস্থাপনের পূর্ব্বে কেবল মহম্মদ টোগলকের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই দিল্লীর সাম্রাজ্য উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল। তৎকালে এই সাম্রাজ্য উত্তর পূর্ব্বে হিমালয় হইতে উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু পর্য্যন্ত ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত এবং এবং দক্ষিণে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * এই বিপুল সাম্রাজ্য মধ্যে কেবল উড়িষ্যা ও রাজপুতানা দিল্লীর শাসনাধীন ছিল না। এই উভয় দেশেই হিন্দু

* Elphinstone P. 474.

স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত করিলেও সম্রাট টোগলাক্ বিচক্ষণ শাসনকারী ছিলেন না। পরন্তু তিনি ঘোর অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। দাক্ষিণাত্য এবং বঙ্গদেশ তাহার অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্যে পরিণত হইল। কর্ণাট ও তেলিঙ্গানার হিন্দু রাজগণ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরের ভারত আক্রমণে এই নষ্ট প্রায় সাম্রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত হইল। তদানীন্তন দিল্লীপতিকে, অসভ্য বর্ব্বরদিগের ভীষন অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাটে আশ্রয় গ্রহন করিতে হইয়াছিল।

তৎপরে ভারতবর্ষে সৈয়দের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে তাঁহাদের কোন সাম্রাজ্য ছিলনা। তাঁহাদের রাজ্য রাজধানী দিল্লীর চতুঃপার্শ্বে কয়েক ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত ছিল।

সৈয়দ বংশের পর হিন্দুস্থানে লোডিবংশ রাজত্ব করে। এই লোডি বংশোদ্ভবেরা জোনপুর ও বেহার পুনর্ব্বার দিল্লীর শাসনাধীন করে। এই বংশের দ্বিতীয় ভূপতি ধর্ম্মান্ধতাদোষদুষ্ট হইলেও, ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পূর্ব্ব নরপতির গুণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হয়েন নাই সুতরাং যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটল। যে কয়দিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ একটী শাসন কর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং বাবরকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিল। বাবর আগমন পূর্ব্বক লোডি বংশকে পরাভূত করিলেন। এক যুদ্ধেই পাঠান শাসন তিরোহিত হইয়া গেল। বাবর দেখিলেন যে তাঁহার রাজত্ব স্থাপনের পথে তৎকালীন মুসলমানেরা কণ্টক নহে কিন্তু "ঘৃণিত" হিন্দুরাই প্রধান অন্তরায়।

চারি বৎসর রাজত্ব করার পর বাবরের মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র হুমায়ুন সিংহাসন অধিরোহণ করেন। গুজরাট, বেহার ও বঙ্গদেশে ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর যুদ্ধের পর, হুমায়ুন দেখিলেন যে তাঁহাকে রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া ধরাধামে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিচরণ করিতে হইবে।

এক মাত্র কনোজের যুদ্ধে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল যে এই বিপুল ভারত সাম্রাজ্য পাঠান দ্বারা শাসিত হইবে—মোগলের দ্বারা নহে।

বাবরের সৌভাগ্য লব্ধ সাম্রাজ্য স্বপ্ন রাজ্যের ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইল। পুত্র হুমায়ুনকে মরুভূমি মধ্য দিয়া পলায়ন জন্য কত কষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যেখানেই গিয়াছিলেন কেহই সেখানে বন্ধু ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। এই অসময়ে তাঁহার যে সকল অনুচর ছিল তাহারা সময় বুঝিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিত না—তেজস্বী হুমায়ুনকে এ সমস্ত নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠানশাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেবল মাত্র পরাক্রান্ত ও সুদক্ষ সেরসাহই কিছু কালের জন্য হিন্দুস্থান সুদৃঢ় ভাবে শাসন করিয়া ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরেই বাঙ্গালা, মালব, পাঞ্জাব, এমন কি দিল্লী ও আগ্রা দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। এমন সময়ে হুমায়ুন আকবর ও বায়রাম খাঁ প্রত্যাগত হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই পাণিপথের ভীষন যুদ্ধ ঘোষনা করিয়া দিল যে কোটী কোটী ভারতবাসীগনের অদৃষ্ট সূত্র পাঠান দিগের পরিবর্ত্তে মোগল দিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ভারতে মুসলমান শাসন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এতাবৎকাল মুসলমান সম্রাটগণ শাসন কৌশলের প্রধান উপায়ই অবলম্বন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে রাজ্য সুশাসিত ও সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রজাগণের—দেশীয়গণের সাহানুভূতি ও রাজভক্তি অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াই মুসলমান শাসন প্রচলিত হইতেছিল; সুতরাং রাজার স্বার্থ ও প্রজার স্বার্থ যে একই—এই ভাব প্রজাহৃদয়ে অনুমাত্র স্থান পায় নাই—পাইবারও কারণ ছিল না। অতএব তাহারা বুঝিত না যে কোন রাজ বংশের অধঃপতন তাহাদেরই ধ্বংশের কারণ ও দেশে অরাজকতার মূল।

তৈমুরের আক্রমনের পর টোগলক বংশের অধঃপতন হইলে, প্রজারা একবার মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে কোন রাজ বংশের উচ্ছেদ তাহাদেরই অসংখ্য বিপত্তির হেতু হইয়া থাকে; সুতরাং রাজার স্বার্থ ও প্রজার স্বার্থ বিভিন্ন নহে। তৎপরে কত মুসলমান রাজবংশ প্রত্যেকেই অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করিয়াছে। ভারত রঙ্গমঞ্চে তাহারা তাহাদের ক্ষণকালব্যাপী জীবলীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছে; কিন্তু হায়! অসংখ্য প্রজাবৃন্দ তাহাদের এই শোকহাস্যোদ্দীপক অভিনয় নীরবে দর্শন করিয়াছে—অসময়ে অধঃপতনের সময় কেহ কোনরূপই সাহায্য করে নাই। পূর্ব্বাপূর্ব্ব নরপতিগণ কেবল সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্যে রাজ্য শাসন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। প্রজাদের আন্তরিক ভাব কি, কিসে তাহাদের রাজার প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতি জন্মাইতে পারে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং তাহাদের রাজ্য শাসনও সুদৃঢ় হয় নাই।

অতএব অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত পরাক্রমশালী রাজবংশের উত্থানে, নিজের রাজার সাহায্যার্থে একেবারেই যোগদান করিত না; পরন্তু যুদ্ধকালে তাহারা একান্ত নিরপেক্ষ ভাবে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিত। ভারতে শাসনকারী নরপতির প্রতি প্রজাবৃন্দের এই ভাবই ছিল।

এলিজ্যাবেথের শাসনকালে ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দের ভাব, ভারত নরপতির প্রতি প্রজাবৃন্দের ভাব হইতে কত বিভিন্ন। ক্যাথলিক স্পেন যখন ইংলণ্ডের ক্যাথলিক প্রজাবৃন্দের সাহায্যার্থে আর্মাডা পাঠান, তখন ইংলণ্ডের সেই ক্যাথলিক প্রজাগণই আর্মাডার বিপক্ষে অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের রাজ্ঞীর পরাজয় তাহাদের অসংখ্য বিপত্তির মূল হইবে।

যে মেরিয়া টিরিসার (Maria Theresa) পূর্ব্বপুরুষগণ হঙ্গেরী দেশবাসীগণকে অন্যান্য দেশের প্রজাবৃন্দের অপেক্ষা রাজদ্রোহী বিবেচনা করিতেন, সেই মেরিয়া টিরিসা যখন প্রজাবৃন্দের নিকট তাঁহার রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় নিবেদন করিলেন তখন শত শত সাহসী প্রজা কোষনির্ম্মুক্ত অসির ঝঞ্ঝনা শব্দের সহিত এক বাক্যে উত্তর দিল আমরা সকলে 'আমাদের রাজ্ঞী

মেরিয়া টিরিসার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত'। হঙ্গেরী প্রজাবৃন্দের এই রাজভক্তি, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজানুরাগের হইতে কত প্রভেদ!

প্রধান হুইগ দলপতি চারলস্ ফক্স (Charles James Fox) কি [illegible] ও তেজের সহিত পার্লামেণ্টে ফরাসী বিপ্লব নীতি সমর্থন করিতেন। এই বিষয় সমর্থন করিতে গিয়া একদিন পার্লামেণ্টে তাঁহার চির প্রিয় অন্তরের বন্ধু বর্কের (Burke) সহিত মত বিভিন্নতা হেতু চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গেল; Fox সেই দিন পার্লামেণ্টে বন্ধু বিচ্ছেদ জনিত দারুণ শোকে ক্লিষ্ট হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এত প্রবল ভাবে ফরাসী বিপ্লব নীতি সমর্থন করিলেও, যখন শুনিলেন যে ফরাসীরা ইংলণ্ড আক্রমন করিয়াছে তখন আর তিনি ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন করিতে পারেন নাই। প্রজাবৃন্দের ঈদৃশ ভাব, মোগল শাসন পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজভক্তি হইতে কত প্রভেদ!

যখন রাজা মানসিংহ ও ক্ষেত্রী টোডরমল্ল সম্রাটের আদেশে স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও আত্মীয় স্বজনের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সম্রাটের স্বার্থ হিন্দু, মুসলমান সকল প্রজাবর্গের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন নহে—তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সম্রাটের আজ্ঞা পালনে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের উপকার সাধন করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
ও
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ।

লুম্‌ড়ি কা দুম্‌ড়ি।

(গল্প)

আমার শ্যালক অবিনাশচন্দ্রকে যখন বলিতাম—"চলহে সিমলার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে দি"-- তখনই সে একটা না একটা ওজর করিত। কোনও দিন মস্তকপীড়ার দোহাই দিয়া, কখন বা শারীরিক ক্লান্তির কথা বলিয়া সে আমার উপরোধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা ভাই দেশে তুমি এত সঙ্গ ভালবাস, কলিকাতায় তুমি একজন সব্‌চিন্ ছেলে, তবে এখানে এসে এমন কুনো হ'য়ে গেলে কেন?" আমার দয়িতাগ্রজ তাহার গুম্ফের প্রান্তভাগ পাকাইতে প্যাকাইতে একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—"এ কথাটা আর বুঝ্‌লে না? কথায় বলে তেস্‌রা কুত্তা বহিনকা ভাই অর্থাৎ যে তাহার ভগ্নিপতির অন্নের সদ্গতি করে সে শারমেয় শ্রেণীভুক্ত। কোথায় রসিক লোকের পাল্লায় পড়ব সে কুকুর ঠাওরাবে?"

আমি বলিলাম—বাঃ সেকি? তুমি ত আর আমার গলগ্রহ নও। কল্‌কাতায় প্লেগের ভয়ে সকলে দেশ বিদেশে পালাচ্চে, তুমি না হয় আমার কাছে কিছুদিনের জন্যে হাওয়া খেতে এসেছ।

অবিনাশ হাসিয়া বলিল—তার পর, আমায় এখানে চেনে কে? পরিচয় দিতে হ'লেই বল্‌তে হবে আমি অমুকের শালা।

আমি সগর্ব্বে বলিলাম,—ক্ষতি কি?

অবিনাশ বলিল—ক্ষতি কি? শাস্ত্রে আছে

> স্বনামঃ পুরুষো ধন্যঃ পিতুর্নামশ্চ মধ্যমঃ
> শ্বশুরনামশ্চ অধম শ্যালনামাধমাধম।

শেষে কি অধমাধম হব?

আমি বলিলাম—তবে কি ছুটির দিনটা মাঠে মারা যাবে?

অবিনাশ বলিল—কেন খডে চলনা বেড়িয়ে আসি।

তাহাই স্থির হইল। সেই স্বল্পজনাকীর্ণ শিমলা শৈলের মলের উপর দিয়া দুইজনে সঞ্জৌলী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ

মাসের প্রারম্ভ। পাহাড়ে শীতের প্রকোপটা হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। উত্তরের পর্ব্বতশৃঙ্গশায়িত ধবলতুষাররাশি মধ্যাহ্ন ভাস্করকরপ্রজ্জ্বলিত হইয়া স্থানে স্থানে কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আমি চারি বৎসর এখানে চাকুরি করিতেছিলাম কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া আশ মিটে নাই কখনও মিটিবে বলিয়া বোধ হয় নাই। রাস্তার আসে পাশে সাহেবদিগের বিলাসগৃহসংলগ্ন উপবনের প্রাচীরে অসংখ্য অযুত গোলাপ ও চামেলি ফুটিয়া হিমালয়ের শীতল মলয়কে সুবাসিত করিয়া দিতেছিল। আর মধ্যে মধ্যে এক একটি ধনাঢ্য ইংরাজ মহিলার অশ্বক্ষুরাপসৃত ধূলিরাশি আমাদের সার্জের পোষাকের রঙ্ বদ্‌লাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল।

সানক্টোলির মোড়ে আসিয়া অবিনাশ বলিল—চল ভাই নিচের ঐ উপত্যকাটায় যাই। পাহাড়ীদের কৃষি কার্য্য দেখি নাই। চল একবার ঐ সুন্দর সবুজ ময়দান গুলার উপর বেড়িয়ে আসি।

অবিনাশ যাহাকে ময়দান বলিল অবশ্য তাহা অসমতল গড়ানে জমি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ইংরাজ কবি বলিয়া ছিলেন—'Tis distance lends enchantment to the view, মেদিনীস্থিত সকল দ্রব্যই দূর হইতে যেমন সুন্দর দেখায় নিকটে যাইলে আর তাহার সে সৌন্দর্য্য থাকে না।

যাহা হউক দুই জনেই রাজ পথ ছাড়িয়া পাকদণ্ডী দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমটা শৈলগাত্র কেবল কেলু ও চিড় বৃক্ষ পরিপূর্ণ। কেলুর শুষ্ক পত্রে দুই একবারে বন্ধুর পা হড়কাইল। কোনও প্রকারে ক্রমে খড়ে নামিলাম। সে খানে কেবল বরাস্ ফুলের জঙ্গল। ৮, ১০ হস্ত উচ্চ বৃক্ষগুলি সুন্দর লাল ফুলে আপাদ মস্তক সজ্জিত কোথাও বা পার্ব্বতীয় গোলাপ ও চামেলি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বরাসবৃক্ষের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া দিতেছিল।

নিম্নে আসিয়া কিন্তু পাহাড়ীদের গ্রামটি দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম পথ ভুলিয়াছি, পাহাড়ে এরূপ প্রায়ই হয়।

আমরা যে স্থলে দাঁড়াইয়া ছিলাম তথা হইতে ২৫, ৩০ ফুট নিম্নে দিব্য একটি ঝরনা বহিয়া যাইতেছিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম

নির্ঝরিণীর ততই আনন্দ বাড়িতে লাগিল। বাঙ্গালীকে পাঞ্জাবের সকলেই একটু সন্মান করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য ঝরনাটীও যোগ্য ব্যক্তিকে এরূপ সন্মান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। জলস্রোত কুল কুল ঝর্ ঝর্ শব্দে ছোট ছোট পাথরের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের আগমন বার্ত্তা লইয়া কোথায় ছুটিল।

অবিনাশ বলিল—ভাই এই খানে বোস। কেমন রম্য স্থানটি।

বাস্তবিকই তাই। এখানে পাহাড় দুইটী পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে ঝরনার উপরিভাগ তরুলতাদিতে পূর্ণ। এক খানি শৈলপাত্রে আমাদের জন্য কে শৈবালের শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

আমি বলিলাম—তোমার না আনিয়া যদি তোমার—

অবিনাশ বলিল—এসব জায়গাতেও ঐ জঘন্য ইয়ারকি গুলা বেড়োয়।

আমি নিস্তব্ধ হইলাম। উপরে পাহাড়ী কোকিল ডাকিল কু—কু—কু আর আমাদের চির পরিচিত স্রৈন পাখিটি বলিল—বউ কথা কও।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

অবিনাশ বলিল—তাইত হে। হঠাৎ মেঘ আসিল কোথা হ'তে?

বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট প্রায়ই শুনিতাম, সিমলার শিক্ষিতশিক্ষিতা বিড়ালাক্ষী সুন্দরীদের দুই দিবস অন্তর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও পরিবর্ত্তনশীল সিমলার ঋতু। হয়ত অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রখর রৌদ্র তাপে শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশও আপনার হৃদয়ে বিরক্তি সঞ্চার করিতেছিল। অপেক্ষা করুন এখনই কোথা হইতে কালো কালো কতকগুলা মেঘের টুকরা ভাসিয়া আসিয়া আপনার পথ ঘাট গুলিকে কর্দ্দমময় করিয়া দিবে।

আমি বলিলাম—চল যত শীঘ্র পারি উপরে উঠি ঐ একখানা ঘর দেখা যাচ্চে ঐখানে গিয়ে আশ্রয় ন'ব। এখানে ভিজলে সদ্য নিউমোনিয়া।

আমরা যথাসাধ্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটু একটু করিয়া অনেক গুলি নীরদখণ্ড উপত্যকায় আসিয়া জমিল। দূরে জোলিওক্ পাহাড়ের উপর হইতে এক খণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ নামিয়া

আসিতেছিল। নিম্নের মেরুদণ্ডাকারের পাহাড়ের উপড় দাঁড়াইয়া একখানা বড় মেঘ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যখন আমাদের লক্ষ স্থানের ১০, ২০ হস্ত নিম্নে আসিয়াছি তখন হোলিওকের মেঘ খানা আসিয়া খড়ের মেঘকে ধাক্কা দিল। মহা বিপদ উপস্থিত হইল। কড়্ কড়্ ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইল। আমরাও হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিলাম।

যে গৃহটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম সেটি পাহাড়ী কুটির বলিলে হয়। অবশ্য পাহাড়ী কুটীরের উপর খড়ের আচ্ছাদন থাকে না। এ কুটীরটির ছাদটি শ্লেট নির্ম্মিত। তাহার অপ্রশস্ত বারাণ্ডায় বসিয়া একটি লাডাকী যুবতী দুইটি মেষ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

মন্দের ভাল হইল। লাডাকীরা তিব্বতের লাডাকবাসী মুসলমান। ইহারা হিন্দি বুঝিতে পারে কিন্তু ইহাদিগের ভাষা অন্যরূপ। ইহারা বড় অথিতি সেবক।

আমাদিগকে দেখিয়া বালিকাটি ব্যগ্র ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধেয় পাজামাটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, তাহার গলদেশবিলম্বিত মালায় অন্যান্য মুদ্রার সহিত একটি স্বর্ণ মুদ্রাও ছিল এবং তাহার হৃষ্টপুষ্ট সুগঠিত অঙ্গে এক খানি পীতবর্ণের আস্তরণ ছিল।

লাডাকীরা বড় ফুল ভালবাসে। ব্যস্ত ভাবে উঠিতে গিয়া যুবতীর শিরোদেশ হইতে বরাস ফুলের মালাটি ভূমিতে পড়িয়া গেল। আমি কিছু কিছু লাডাকী ভাষা জানিতাম। বালিকাকে পরিচিত ভাবে বলিলাম—চিসোঁ? (ভালত?)

রমনী উত্তর করিল—লেহে মোসোঁ। (আঁজ্ঞে ভাল আছি।)

আমি বলিলাম—গার্ দুযেৎ। (কোথা থাক?)
যুবতী কুটীর দেখাইয়া দিল। বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। আমি একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম।

রমনীটি বেশ দয়ালু, আমাদের গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। গৃহের দরজার নিকট কতকগুলি মোরগের পাখা, ভেড়ার লোম প্রভৃতি পড়িয়া

থ কিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গৃহের আভ্যন্তরীন অবস্থাও বুঝি এইরূপ; কিন্তু গৃহের ভিতরটি বেশ পরিষ্কার ছিল।

আমাদিগের বসিবার জন্য লাডাকী মহিলা চারপায়ের উপর দুইখানি মেষচর্ম্ম বিছাইয়া দিল। আমরা তাহার উপর বসিয়া রমণীর সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। তাহার জননীও আমাদের গল্পে যোগদান করিল আর তাহার শিশু ভ্রাতা একটি পাখী লইয়া তাহার মার নিকট দেখাইয়া বলিল- আম্মা বিফু। (মা পাখী।)

তাহার মাতা বলিল—বাবুজী সিমো। (চুপ কর বাবুজীরা মারিবেন)।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল আর গৃহের ভিতর গল্প হইতে লাগিল। অবশ্য হিন্দুস্থানী ভাষাতেই গল্প হইতেছিল। যুবতী অবিবাহিতা তাহার পিতা কুলিদিগের সর্দ্দার বেশ দুপয়সা রোজগার করে। অনুসন্ধানে জানিলাম যুবতীর নাম গুলসেঁা। *

আমার সম্বন্ধী অবিনাশ দেখিলাম পার্ব্বত্য ললনার সরলতায় ও দয়ায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোনও উত্তেজক বিষয়ে কথা কহিবার সময় যখন গুলসেঁার হরিদ্রাবর্ণ গণ্ডস্থল লোহিতবর্ণ ধারণ করিতেছিল তখন বাঙ্গালী যুবক তাহার বদন-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে লাগিল। আমি দুই একটা লাডাকী কথা কহিলাম তথাপি কিন্তু দেখিলাম গুলসেঁার স্নেহটা অবিনাশের উপর কিঞ্চিৎ অধিক।

অবিনাশ বলিল—গুলসেঁা বিবি তোমাদের গান কিরূপ একটা শোনাও না। বালিকা সুন্দর ললিত-কণ্ঠে লাডাকী ভাষায় গীত গাহিল। তাহার মাতা তাহাতে যোগদান করিল।

অনুসন্ধানে বুঝিলাম—গানের অর্থটি এইরূপ—

প্রথম পংক্তি—হ্রদের জল জমিয়া গেল, শীত আসিল।

২য় পংক্তি—য়্যাক ও লঙ্গড়ীর § পশম বাড়িল—শীত আসিল।

৩য় পংক্তি—অর্থ স্মরণ নাই।

---

* গুলসেঁা বোধ হয় পারস্য গুলসনের অপভ্রংশ। তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের যখন সংস্কৃত নাম হয় তখন মুসলমানদিগের পারস্য নাম অসম্ভব নহে।

§ তিব্বতীয় অজজাতীয় জন্তু বিশেষ।

অচ্ছে না।

৪র্থ পংক্তি--রমণীর হৃদয়ের প্রেম গাঢ় হইল বিদেশ হইতে তাহার স্বামী আসিল।

বাহিরে আকাশ পরিষ্কার হইল ঘড়িতে দেখিলাম ৪টা বাজিয়াছে। অবিনাশের উঠিতে তেমন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার তাড়নায় উঠিল।

গুলসোঁ বলিল--বাবুজী আমার স্মরণার্থ এই দ্রব্যটি লইয়া যাও। ইহা লঙ্গড়ি কা দুম্। অবিনাশের পকেটে রুমাল ছিল সে বলিল—গুলসোঁ বিবিঁ এই রেশমী রুমাল খানা রাখিও।

গুলসোঁ সেলাম করিয়া আমাকে বলিল—বাবুজী আপনার স্কুৎপো * বড় দয়ালু।

সেই উপহার দ্রব্যটি হস্তে করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। অবিনাশ মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া দেখিল আর বলিল—ভাই রাস্তাটা চিনে রাখ ঐ দেখ গুলসোঁ আমাদের দেখ্‌ছে।

যখন গৃহে ফিরিলাম, আমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি ছুটিয়া আসিয়া চামরটি হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল —বাবা এটা কি ?

আমি বলিলাম—এটা লঙ্গড়ি কা দুম্।

তাহার জননী তখন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। শিশু তাহার মুখে চামরটি বুলাইয়া দিয়া বলিল—মা দেখ কি ? লুম্‌ড়ি কা দুম্‌ড়ি।

আমার হৃদয়েশ্বরী ভয়ে মুখ সরাইয়া বলিল—মা গো !

* * * * * * *

অবিনাশ বাড়ি যাইতেছিল। আমি বলিলাম—কিহে সব প্যাক হয়েচে ত ? সে বলিল—হাঁ একটী জিনিস দিবে ? আমি বলিলাম—তোমায় অদেয় আছে কি ? অবিনাশ বলিল—না বিদ্রূপ নয়। আমার ইচ্ছা গুলসোঁর সেই স্মরণ চিহ্নটী নিকটে রাখি।

আমি হাঁসিতে হাঁসিতে তাহার বিছানার সঙ্গে লুম্‌ড়ি কা দুম্‌ড়িটা বাঁধিয়া দিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

---

* স্যালক

রাঠোর-বালক।

দ্বিতীয় সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভীমগড় দুর্গকক্ষে রাঠোর চন্দন—
দেবীসিংহ প্রিয়সুত কিশোর বয়স
ভ্রমিতেছে চিন্তামগ্ন। বদনে নয়নে
জ্বলিতেছে তেজঃদীপ্তি। প্রাচীরে আলেখ্যে
তেজঃপুঞ্জ পিতৃগণে সযত্নে অঙ্কিত
নিরখিছে বার বার। কোষ বদ্ধ অসি
বালকের হস্তস্পর্শে উঠিছে ধ্বনিয়া;
চৌদ্দ বৎসরের শিশু ক্রীড়ামোদ ছাড়ি,
কি চিন্তার ভারে এবে নিভৃত প্রকোষ্ঠে
আলোড়িত করিতেছে ক্ষুদ্র বক্ষ তার ?

"পিতঃ অধমে প্রদানি দুর্গরক্ষা ভার
রাণা আনুচর্য্যে তুমি রয়েছ নিয়ত;
আশীর্ব্বাদ কর দেব! হইব সক্ষম
ধরিতে সিংহের বল ক্ষুদ্র বাহুদ্বয়ে;
অভিষিক্ত অসি তব বদ্ধ কটিদেশে
হইবে না কলঙ্কিত। দেখিবে জগৎ
বীর পিতা পালে নাই শৃগাল বালক ;
নিশ্চয় জানিও পিতা উপস্থিত রণে
যদিবা মরিতে হয় মরিবে চন্দন
পঞ্চশত ম্লেচ্ছ শত্রু স্বহস্তে বধিয়া।

এই ভীমগড় দুর্গে রাঠোর কেতন—
সগর্ব্বে উড়িছে শিরে পত্‌ পত্‌ রবে,
গৃহে গৃহে বাজিতেছে রাঠোর দুন্দুভি

চৌদিকে ঘোষিছে রবে রাঠোরের শিঙ্গা,
চকমকি দীপিতেছে রাঠোরের অসি
চর্ম্মে বর্ম্মে সুসজ্জিত রাঠোরের বীর
বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে, কিশোরে উত্তমে,
যৌবনে প্রবলতেজে শিখিয়াছে রণ—
পশু ম্লেচ্ছ হুহুঙ্কারে যাইবে ছাড়িয়া
পিতৃ পিতামহ গৃহ প্রিয়দরশন?

আসিছে অম্বর রাজ রাজপুত গ্লানি
সহ দিল্লীশ্বর পুত্র—তুষ্ট ভগ্না দানে;
লাজহীন সে পামর—ভাবিয়া বিস্মিত
আসিতেছে ঘোর রোলে ভ্রাতানির্য্যাতনে—
শিখিবে যে শিক্ষা আজি বালকের করে
সমস্ত জীবনে পাপী ভুলিবে না কভু,
দেখিবে ধর্ম্মের বল শতেক ধিক্কারে
দুষিবে বুদ্ধির দোষ। লভিয়া জনম
পবিত্র সূর্য্যের বংশে ফিরিছে কুক্কুর
পাপাত্মা ম্লেচ্ছের পদ সানন্দে লেহিয়া।

অস্থি মজ্জা জ্বলিতেছে সেই অপমানে
শিশোদীয়া কুলমানী প্রতাপ যেদিন
কুলাঙ্গার সনে নাহি অন্ন পরশিল—
ঘৃনাভরে, হীন জানি তুর্কির কুটুম্বে
সেই দিন হতে তীব্র প্রতিহিংসানল
জ্বলিতেছে ভীমবেগে পাপিষ্ঠ অন্তরে—
কিন্তু বৃথা আস্ফালন—রাজপুত অসি
উলঙ্গিয়া বিরাজিছে হতে সম্মুখীন
দেখায়েছে মানগর্ব্ব বচনে সেদিন—
আজি মুক্ত রণভূমে দেখাইবে বল।

আমরা বীরের পুত্র যুদ্ধব্যবসায়ী
বাঞ্ছনীয় রণ মৃত্যু। মাত্রেক ভাবনা
রাণা শুদ্ধ অন্তঃপুর রক্ষণের ভার
বিন্যস্ত আমার করে, সমরে মরিয়ে
ম্লেচ্ছকর কলঙ্কিবে পবিত্র রতন,
ভাবনায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে আসে
উছলিয়া উঠে বক্ষে হৃদয় শোণিত—
কি উপায় করি এবে? যে হয় সে হয়
মিহির কিরণ কভু স্পর্শেনি যাদের
কোনমতে তাঁহাদের রক্ষিব নিশ্চয়।

পলাইব দুর্গ ছাড়ি বামাদল সহ?
মরণের চেয়ে বেশী সেই অপমান—
বীরের আলেখ্যবর্গ মর্ম্ম যাতনায়
বিসর্জ্জিবে অশ্রুরাশি—লজ্জায় ঘৃণায়
কাপুরুষ বংশধরে করিবে ধিকার—
কিন্তু ভাবি পুনঃ হায় আমার সদৃশ
কোটী কোটী ক্ষুদ্র প্রাণ জীবন মরণ
তাহে ফলাফল কিবা? পবিত্র রতন
ম্লেচ্ছকর কলঙ্কিত হ'লে একবার
ফিরিবে না আর কভু! কি করি উপায়?

শ্রীউমাচরণ ধর।

আদর্শ কবি ও কাব্য।

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে। রস ভাব গুণ অলঙ্কার রীতি প্রভৃতি দ্বারা সুরচিত হইলেই কাব্য হৃদয়গ্রাহী হয়। কাব্যকে নরদেহরূপে কল্পনা করিলে,—শব্দার্থ ইহার শরীর, শৃঙ্গারাদি রস ইহার আত্মা, মাধুর্য্যাদি গুণ ইহার ধর্ম্ম, শব্দালঙ্কারাদিগত পঞ্চবিধ দোষ ইহার অঙ্গবিকলতা, বৈদর্ভ্যাদি রীতি ইহার অবয়ব-সংস্থান, এবং শব্দার্থগত অলঙ্কার ইহার কেয়ূর-কুণ্ডলাদি সদৃশ শোভাসম্পাদক ভূষণ রূপে কথিত হয়। গদ্যে পদ্যে ও গদ্যপদ্যের মিশ্রণে কাব্য রচিত হইয়া থাকে। পরিপাটী ছন্দোবন্ধে কাব্য রচিত হইলে উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়; কিন্তু রসহীন ছন্দোবন্ধ-রচনা কোন ক্রমেই কাব্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—

"পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥"

এই কবিতা, অথবা কবি কালিদাসের—

"গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গঞ্চাপি চ বর্ত্ততে॥"

এই কবিতা, রসাভাবহেতু, কাব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে "বিধবাবিবাহ-বিচারে" স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর-লিখিত—"হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"—এই করুণ-রসাত্মক গদ্য-রচনা কাব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কবিতা মাত্রই * যে কাব্য নহে নিম্নোদ্ধৃত উদ্ভট শ্লোক পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

---

* এই প্রবন্ধে কবিতা, কবি, কবিত্ব, কবিত্বশক্তি ও কাব্য এই শব্দ কয়টির যে প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন। ছন্দোবন্ধ রচনাকেই আমরা কবিতা নাম প্রদান করিয়াছি। অন্যান্য শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রবন্ধ মধ্যেই দেখিয়া লইবেন।

"তয়া কবিতয়া কিং বা তয়া বনিতয়া চ কিং।
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাহপহৃতং মনঃ॥"

অর্থাৎ,—যে কবিতা কিংবা বনিতার পদবিন্যাস মাত্রেই মন অপহৃত না হয়, সে কবিতা অথবা বনিতায় প্রয়োজন কি?

কবিকৃত পদবিন্যাস পাঠে আমাদের মন অপহৃত হয় বলিয়াই কবির এত গৌরব। পুত্রশোকাতুরা রাজ্ঞী জনা পুত্রহন্তা অর্জ্জুনকে শ্লেষ করিয়া যখন বলিলেন—

"........তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আ মরি কি সতী—
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধিনী,
সমীরণ-প্রিয়া? ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা,
লোকমাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?"

তখন রাজ্ঞীর তাৎকালিকী অবস্থার এই বর্ণনাটি মধুসূদনের রচনাকৌশলে কতই না ভাববাহুল্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী হইলে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রোদনে বংশীবদন যখন কাতরোক্তিতে বলিলেন—

"আর না হেরিব, প্রসর কপালে, অলকা তিলক সাজ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লঞা।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই করিঞা, ফুকারি সদাই, নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব-ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি কেমন, রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিতে, বংশী গড়াগড়ি যায়॥"

তখন এই শোকগাথার পাঠকের মন অপহরণ করিয়া কি করুণরসের উদ্রেক করে না? ইহাই কবির কবিত্ব। যাঁহার রসবোধ আছে, প্রকৃত কবির কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার মনে অমনি ভাবের উদ্রেক হয়।

যেরূপ অৰ্দ্ধবিকশিত কুসুমের সৌরভ, অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠিত রমণীমুখের লাবণ্য, অধিক বলিয়া বোধ হয়, সেরূপ আংশিক স্ফুট ও আংশিক অস্ফুট তাৎপর্য্য-নিবদ্ধ কবিতার চমৎকারিত্ব অধিক বলিয়া গণ্য হয়। উদ্ভট শ্লোক এতদ্বিষয়ে যথার্থই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিতেছে যে—

"নান্ধ্রী-পয়োধর ইবাতিতরাং নিগূঢ়ঃ।
নো গুর্জ্জরী স্তনৈবাতিতরাং প্রকাশঃ॥
অর্থোগীরামপিহিত পিহিতশ্চ কশ্চিৎ।
সৌভাগ্যমেতি মহারাষ্ট্রবধূস্তনৈব॥"

অর্থাৎ,—অন্ধ্রদেশীয়া রমণীর অতিশয়াবৃত অথবা গুর্জ্জর দেশীয়া রমণীর অনাবৃত পয়োধরের ন্যায় সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত বা প্রকাশিত অর্থযুক্ত বাক্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয় না; যে বাক্যের অর্থ মহারাষ্ট্রবধূর স্তনের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রকাশিত ও কিঞ্চিৎ অপ্রকাশিত থাকে সেই বাক্যই সৌন্দর্য্যশালী।—এতাদৃশী রচনা যে সুকৌশলময় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি ভারতচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে—

"বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আলো করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া।
ধূলা-ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হ'তে বুড়া এক ডোকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কথ কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥"

গিরিরাজনন্দিনী উমার মেনকাসন্নিধানে বালিকাসুলভ-লজ্জা-হেতু হর্ষাদির গোপন কতই মধুর হইয়াছে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের—

"পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটায় সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর্ বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥"

অতি সরল ভাষায় গ্রথিত, গভীর অর্থজ্ঞাপক, ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত, এইকবিতাটি কতই সুখকর হইয়াছে। পাঠমাত্র ইহার যে অর্থ বোধ হইয়া যে পরিমাণ চিত্তপ্রসাদ জন্মে, মূর্ত্ত নায়ক-নায়িকার প্রণয়াভিসার জ্ঞান না করিয়া যদি ইহা ভক্তবাঞ্ছিত কৃষ্ণ-প্রেমোদয়ের প্রতিবন্ধক পদার্থ সমূহের বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং ভক্তিতত্ত্বের অবিসংবাদে স্বকীয় জীবনের সহিত ইহার মিল করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেও শতগুণ অধিক চিত্তপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই প্রকার সরস-বাক্য-রচনাকুশল কবির স্বরূপ অবগত হইবার বাসনা আমাদের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়।

দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের প্রশ্নোত্তরছলে যে "কবির লড়াই" হয়, তাহা অনেকে জানেন। ঈদৃশ "কবি" আমাদের সমালোচ্য নহেন। অথবা যাঁহারা মনে করেন যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টাতেই কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাদৃশ আধুনিক কবিম্মন্য ব্যক্তিরাও আমাদের সমালোচ্য নহেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কোন কবি যখন আত্মপ্রকাশ করিয়া লিখিলেন,—

"রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে॥"

অথবা— "তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থল থল,
রাঙ্গা রেখা জ্বল জ্বল
কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন তলে।"

তখন লোকে বাহবা দিলেও আমরা সে কবিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। আগ্নেয়পুরাণে লিখিত আছে,—

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"

অর্থাৎ,—এই জগতে মনুষ্যজন্ম দুঃখেতে লাভ হইয়া থাকে, সেই মনুষ্যজন্ম হইতেও বিদ্যা সুদুর্লভা, বিদ্যা হইতে কবিত্ব আরও দুর্লভ, এবং কবিত্ব হইতেও কবিত্বশক্তি সুদুর্লভা।—কবিত্বশক্তির এতাদৃশ সুদুর্লভত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই কর্ণাটরাজপত্নী কবি কালিদাসকে বলিতে সাহস করিয়াছিলেন যে,—

"একোভূন্নলিনাৎ পরস্তু পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপর-
স্তেসর্ব্বেকবয় স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যোনমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈ শ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥"

অর্থাৎ,—পদ্মযোনি ব্রহ্মা, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং মহর্ষি বাল্মীকি, ইহাঁরা সকলে কবি এবং ত্রিলোকের গুরু; আমি সেই কবিগণকে নমস্কার করি। কিন্তু আধুনিক কোন ব্যক্তি যদি গদ্যপদ্য রচনা করিয়া চিত্তের চমৎকার সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি

তাঁহার বামচরণ আমার মস্তকে ধারণ করিব; আর যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আমার বামচরণ তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিব।

এই শ্লোক দ্বারা কর্ণাটরাজপত্নী কবিত্বের ও কবির যে উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিয়া কবি কালিদাসের মনেও ভয়ের উদ্রেক করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় কবি ও কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াও আমরা সেই আদর্শ বিস্মৃত হই নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবার বিশেষ কোন কারণও নাই। বাঙ্গালা ভাষায়ও এমন অনেক কবিতা রহিয়াছে, যত বার পাঠ করা যায়, তত বারই তাহা নূতন বলিয়া বোধ হয়; তত বারই যেন কবির ভাবে ভাবগ্রাহী পাঠকের ভাব ক্রমশঃ মিশিয়া যাইয়া অভূতপূর্ব্ব কত ভাব আসিয়া তাঁহার মন উদ্বেলিত করিতে থাকে। কবি চণ্ডীদাসের—

"পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে, পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল সে জন, বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে, পিরীতি মিলয় তারে॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও, থাকিলে পিরীতি আশ॥"

এই পদ, অথবা লোচনদাসের—

"কি করে তিলকে, কি করে পলকে, কি করে কৌপীন ডোরে।
কি করে তুলসী, গলায় তুলসি, কি করে মুণ্ডন শিরে॥
কি করে উদাসে, ছাড়িয়া আবাসে, কি করে করঙ্গ নিলে।
কি করে বিচারে, কি করে আচারে, কি করে প্রসাদ খেলে॥
কি করে যতনে, মন্দির গঠনে, কি করে ভকতি অঙ্গে।
কি করে পুথিতে, কি করে থুতিতে, কি করে সাধুর সঙ্গে॥
প্রণয় ভজন, না জানে যে জন, যে জন তাহা না মানে।
তার সঙ্গে কথা, না কব সর্ব্বথা, কহে এ দাস লোচনে॥"

এই পদ গুলি পাঠক একবার পাঠ করুন। এইরূপ শাক্তবৈষ্ণব কবিদিগের বহু পদ উদ্ধৃত করা যায়। এই সকল কবিতা বাঙ্গালির জাতীয় গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত আদর্শ উপেক্ষা করিয়া ছন্দোবন্ধপদরচয়িতৃ-মাত্রকেই কবি শব্দে বুঝাইতেছে দেখিয়া আমরা কবির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে কবির সেই উচ্চ আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অধুনা আমরা ইংরাজির সহিত সংস্কৃত ভাব মিশ্রিত করিয়া কবিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করি। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল গভীর উন্নত অস্ফুট ভাব গুলি ধরিয়া, সেই সকলের গঠন দিয়া, অব্যক্তকে যিনি ব্যক্ত করিতে জানেন, তিনি কবি; আর, যিনি মধুমক্ষিকার পুষ্পরস আহরণের ন্যায় পদার্থের বা কার্য্যের রহস্যটুকু গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যঙ্গ্যার্থ কাব্যভেদে প্রকাশ করেন, তিনিও কবি। তবে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। আমরা যদি কবির ইত্যাকার সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট হই, তবে, চিত্রকরকেও তাঁহার সমতুল্য আসন প্রদান করিতে হয়। চিত্রকর চিত্রকৌশলে অব্যক্ত ভাব গুলিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন, গূঢ় চরিত্রের ভাব-বিকাশ সম্পাদন করেন। ইনি কবি নহেন, একথা আমরা বলি না। কিন্তু, যে শ্রেণীর কবিকে আমরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে চাই, তিনি বিশ্বপ্রেমিক; তিনি বিশ্বপ্রেমিক বলিয়াই জগদ্‌গুরু রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ কবি প্রকৃত পক্ষেই যেন ঐন্দ্রজালিক। তিনি যেন কি মন্ত্রবলে তাৎকালিক অভাব-পদার্থকেও ভাব-পদার্থে পরিণত করেন; তিনি যেন কি অলৌকিকী শক্তিতে অসুন্দরকে সুন্দর, সদোষকে নির্দ্দোষ, দুঃখমোহময়কে সুখময় রূপে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এটি কবির সৃষ্টিচাতুর্য্য,—সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতাসম্পাদনই তাঁহার লক্ষ্য। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ সুখদুঃখময়, কিন্তু কবির সৃষ্ট কাব্য কেবলই সুখময়। তথায়—পিকের কূজিত, অলির গুঞ্জিত, প্রফুল্ল কুসুম, খদ্যোতালোকদীপ্ত তরুশির, সকমল সরসী, মরালকেলি, সুখশীতল মলয়ানিল, সুখোষ্ণ অরুণরশ্মি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি, রমণীর হাসি,

অপ্সরার নৃত্য,—এই সকল চিত্তসুখকর কত বিষয়েরই সমাবেশ লক্ষিত হয়। সত্য বটে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রের নির্ঘোষ, স্রোতঃস্বতীর তরঙ্গকুল, অমাবস্যা রজনীর ঘন অন্ধকার, আর্ত্তের ক্রন্দন, সমরের রুধিরস্রাব, প্রণয়ের বিচ্ছেদ—এই সকলও তাঁহার কাব্যমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! এই সকল দুঃখ ভয় মোহাদির সংস্থিতিতেও কবির সুখ, কাব্যের শোভা, অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে পাঠকের মনেও রসভাবাদি সঞ্চারিত হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। কারণ, যিনি স্বকীয় সুখদুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া অপরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই এই দুঃখবহুল জগতে প্রকৃত সুখী। প্রকৃত কবির হৃদয় অপরের সুখদুঃখেই সুখদুঃখ অনুভব করে, আপনার সুখদুঃখ সেই হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ হৃদয়েই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রেমের ধর্ম্ম বড়ই বিচিত্র। ইহার হাসিতে যত সুখ, কান্নাতেও তত সুখ। প্রেমে আত্মহারা করিয়া পরেতে মিশাইয়া দেয়, এইরূপে পরকে আপনার করিয়া তাহার সুখদুঃখ অনুভব করায়। এতাদৃশী অনুভূতিই সহানুভূতি নামে কথিত হয়, ইহা কবি-হৃদয়ে সদাই বহুলাংশে বিরাজমান থাকে। যিনি পরের দুঃখে কাঁদিতে পারেন, তিনিই জানেন সেই কান্নায় কত সুখ, ইহাতে হৃদয় কত প্রশস্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন,—

"হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত সন্তান তবে বলি তারে,
নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে
আমিও ত পারি তাতে কি বল না ?
দেখে হাসি পায়, ভারতের জয়
গাইলেন কবি,—নবোৎসাহময় ;
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয় ?"

এরূপ কৃত্রিমতা প্রকৃত কবির হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

যিনি কাব্যের রসগ্রাহী তিনি কবি। যিনি কাব্য রচনা করেন অথবা যিনি কাব্য পাঠ করিয়া উহার রসাস্বাদনে সমর্থ হন, এই উভয়ই কবি। ইহাঁদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কাব্যকর্ত্তার কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু রসাস্বাদন-পটু কাব্যপাঠকের কেবল কবিত্ব আছে। এতাদৃশী শক্তিকে আমরা প্রতিভা কহিয়া থাকি। রসজ্ঞ পাঠকের কবিত্ব পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, তদ্দ্বারা তাঁহার নিজের ও শিষ্যগণেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক প্রতিভাশালী কবি জগদ্‌গুরু, তিনি গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় আপনার প্রেমাধার-দ্রবীভূত-হৃদয়প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করিয়া ত্রিতাপগ্রস্ত জনগণের কঠিন হৃদয়ে স্বকীয় অলৌকিকী শক্তি দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেন। যাঁহারা এই ক্ষণস্থায়ী প্রেমসঞ্চারে পরিতৃপ্ত না হইয়া উহার স্থায়িত্ব সংরক্ষণে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই সাধু, তাঁহারাই ধন্য। এই নিমিত্ত কথিত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্ ॥"

অর্থাৎ,—সাধুকাব্য-নিষেবণ দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রাপ্তি, নৃত্য গীতাদিতে পারদর্শিতা, কীর্ত্তি ও প্রীতি লাভ হয়।

আমরা উপরি-উক্ত শ্লোকে সাধুকাব্যের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, এতদ্দ্বারা সাধু ও অসাধু ভেদে কাব্য যে দ্বিবিধ তাহাই বুঝাইতেছে। ভট্টমেধাতিথি মনুভাষ্যে "সাধবো বেদার্থসাধনপ্রবৃত্তাঃ" সাধু শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং, যে কাব্যের নিষেবণে মনুষ্যহৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি গুলির প্রসরণ না হইয়া সুপ্রবৃত্তি সমূহেরই বিকাশ সম্পাদিত হয়, তাহাই সাধুকাব্য; কারণ, মনোরাজ্যে সুপ্রবৃত্তি সকলের আধিপত্য স্থাপন যে বেদার্থসাধনের অবস্থা বিশেষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধুকাব্যের আলোচনায় রসজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে এক অপূর্ব্বভাবের উন্মেষ হয় বলিয়াই উহা পাঠের ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। সনাতন হিন্দুসমাজে ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণেতিহাস পাঠ ও শ্রবণের নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। অসাধুকাব্য পাঠে পাঠকের মনে সেই সুখপ্রদ অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হয় না, বরং রচনা-কৌশলে বা রচনা-

দোষে বর্ণিত বিষয়ের অসৎ ভাব বা অসৎ তাৎপর্য্যই প্রধানতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ ও রসজ্ঞ পরিণতবয়স্ক পাঠকেরা কাব্যরসের যথাযথ উপলব্ধি হেতু শাশ্বতপ্রেমেরই উপলব্ধি করেন; কিন্তু যে সকল পাঠকের অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, কাব্যরস যাঁহাদের অনাস্বাদিত রহিয়াছে, নিন্দিতভাবের পরিচিন্তনে যাঁহাদের আমোদ জন্মিয়া থাকে, তাঁহাদের অসাধুকাব্য পাঠে বহুল অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই,—

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতন্তু স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া॥"

অর্থাৎ,— কাব্যের চর্চ্চায় যেবা অনুরত হয়।
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে তার অভিরুচি নয়॥
সঙ্গীতের সমাদরে কাব্যরুচি নাশ।
সঙ্গীতে বিরাগ হয় ধরি স্ত্রীবিলাস॥
স্ত্রীবিলাসে অভিরুচি নাহি থাকে তার।
দারুণ ক্ষুধায় পেট সদা দহে যার॥

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে সাধুকাব্য নিষেবণ দ্বারা হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, কিন্তু অসাধুকাব্য নিষেবণে সাধারণের অধঃপাতের পথ উন্মুক্ত হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধুকাব্যের রচক তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, জগদ্‌গুরু এবং কবির প্রকৃষ্ট আদর্শস্থল। অসাধুকাব্যকার প্রতিভা-সম্পন্ন কবি হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আদর্শস্থলে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত নহেন।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ দাস।

দেবতার দাড়ী।

(Original Research)

সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ বাচালতা মাফ্ করিবেন। প্রবন্ধের Heading দেখিয়াই যেন আমার বিদ্যাবুদ্ধির সমালোচনা করিয়া আমায় একটা অর্দ্ধপক্ক ছোকরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না। হইতে পারে আমি Philosophyতে M. A. পাশ করি নাই অথবা D. Scতে প্রথমস্থানও অধিকার করি নাই যে, অসামান্য প্রতিভা দ্বারা বা অলৌকিক গবেষণাশক্তি দ্বারা নিত্য নূতন মৌলিকতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া সমগ্রজগৎকে স্তম্ভিত করিব। তবে কিনা অনেকে তো অনেকতত্ত্ব কথাই লিখিতেছেন, আমিও না হয় সেই রকম একটা কিছু করিলাম। আর কিছু না হউক্ একটা নূতন কথার অবতারণা ও তো হইল!

'দাড়ী'—সভ্যজগতের সারবস্তু দাড়ী। দেবতাদের সেটা ছিল কি না একটু "গবেষণা" করিতে দোষ কি? কথাটা নেহাৎ সোজা নয়, যে দাড়ীর জন্য ফরাসিরা এত পাগল, যে দাড়ীর অভাবে মুখের সৌন্দর্য্যশ্রীটুকু আধখানা হইয়া যায়, এ হেন পরম পবিত্র দাড়ি কথার চর্চ্চা করিতে দোষ কি?

এখন কথাটা এই—এ হেন দাড়ী দেবতাদের ছিল কি না? দেখিতে পাই দেবতাদের ছবির প্রায় সকল গুলিতেই অল্প বিস্তর দাড়ী আছে। তবে তফাৎ এই, কাহারও সুদীর্ঘ দাড়ী নাভিস্পর্শ করিতেছে, কেহবা গালপাট্টা রাখিয়া ভোজপুরী দরোয়ানকেও লজ্জা দিতেছেন, আর কেহবা দাড়ী কামাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া প্রবীণ মুখে নবীন বাহার দিতেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন:—আমাদের দেশী শিবের ছবিতে সুবিশাল উদর পর্য্যন্ত দাড়ীর থর নামে, আর বোম্বাই শিব যেন প্রত্যহ দুইবার সাবান ব্রস্ দিয়া নিজহস্তে দাড়ী কামাইয়া বিরাজ করেন। আর, যমের দাড়ী সে এক ভয়ানক ব্যাপার, বেয়াড়া চো-গোঁপ্পা। ব্রহ্মা যেন কতকটা মুসলমান। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ যাঁদের দাড়ী নাই তাঁদের গোঁপ জোড়াটী দাড়ীকেও

হার মানাইয়াছে। অতএব কাহার দাড়ী কিরূপ, অথবা দেবতাদের দাড়ী মোটেই ছিল কি না এ মীমাংসাটা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

এখন ভাবিয়া দেখা যাক্ সন্দেহটা হয় কেন? সংস্কৃতসাহিত্যে নানাবিধ উপাধির মধ্যে কুবেরের একটী উপাধি আছে—"মনুষ্যধর্ম্মা"। টীকাকারেরা * বুঝাইয়াছেন, মানুষের মত দাড়ী ছিল বলিয়াই কুবেরের নাম হইয়াছে মনুষ্যধর্ম্মা। কথাটা বড় প্রশংসার নহে, কারণ এই দাড়ীর জন্যই অতবড় যে রাজাধিরাজ যক্ষেশ্বর, দেবতাদের "রথ চাইল্ড" তাঁহাকেও সকলে 'কুবের' কি না কুৎসিত দেহ বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। লাঙ্গুলবিহীনের দেশে লাঙ্গুল থাকাটাই বিড়ম্বনা। যদি দেবতাদের সকলেরই দাড়ী থাকিত, কুবের বেচারার এতটা অপমান হইত না।

এইত গেল একটা Posttive প্রমাণ। এখন কতকগুলি Negative প্রমান শুনুন।

দেবতাদের হাতি, ঘোড়া, রথ ব্যোমযান, বাহন কোচম্যান ডাক্তার (তাও একটা নহে—এক জোড়া অশ্বিনীকুমার) পশুচিকিৎসক্ Veternary Surgon), নর্ত্তকী (একটা দুইটা নয় অসংখ্য) কোন জিনিসটার অভাব ছিল? আমাদের মুনি—ঋষিরা কোন লোকটার নামইবা খুঁজিয়া বাহির করেন নাই। যদি দেবতাদের দাড়ী থাকিত কামাইবার জন্য অবশ্য একটা নাপিতও থাকিত। যখন, নাপিতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব, তখন হয় সকল দেবতাই দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ী রাখিয়া তিব্বত দেশীয় yak গরুর ন্যায় শোভা পাইতেন, নয়তো দেবতাদের দাড়ী মোটেই ছিল না। প্রথম পক্ষটা একেবারেই অসম্ভব, কেন না কুবের বেচারার তাহা হইলে আর এত দুর্ণাম রটিত না। আর সাধারণতঃ দেবতা বলিলে কেহ yak গরুও বোঝে না। অতএব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে যে নাপিতাভাবাৎ দেবতাদের দাড়ীর ও সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

* অমরকোষের টীকায় রঘুনাথদীক্ষিত এবং মাঘের টীকায় মল্লিনাথ প্রভৃতি লবনে "মনুষ্যধর্ম্মা, শ্মশ্রুলত্বাৎ"।

নাপিত যে ছিল না তাহার আর এক প্রমান—কুবেরের তো অর্থাভাব ছিল না, নাপিত থাকিলে দাড়ী কামাইয়া কুবের কি নিজের নামটা নিষ্কলঙ্ক করিতেন না ?

এইবার তৃতীয় যুক্তি শুনুন। আমরা হিন্দু, সাকার উপাসনার ভক্ত। চক্ষু বুজিয়া নিরাকার পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতে একেবারেই অক্ষম। তেত্রিশ কোটী দেবতার ধ্যান—সবই আমাদের কাজে লাগে; অমাদের কর্ত্তারা খুঁটিনাটী করিয়া, প্রত্যেক দেবতার প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন। কোন দেবতার অবস্থা কেমন, কাহার কি পোষাক, কে কয়বেলা কি খায়, কাহার ঘরে চা'ল নাই, নারায়ণ দেবতারা চা'ল খান না যব খাইয়া থাকেন, কারণ সকলেই সকলেই জানেন দেবতর্পণে যব লাগে। কোন দেবতাটী দেখিতে কেমন, কাহার কি বাহন, কি ব্যবসায়, কি অলঙ্কার কোথায় বাস,—কোন কথাটা শাস্ত্রকারেরা বাদ দিয়াছেন ? অরুন বেচারার পা নাই—তাহার নাম হইয়াছে 'অনূরু'। ইন্দ্রের গাময় চোখ্—নাম হইল সহস্রাক্ষ, কি না হাজার চোখো। শীতলা কবে বাহন অভাবে গাধা ধরিয়া চড়িয়া ছিলেন, কবে হয়তো চাকর পলাইয়া যাওয়ায় নিজে ঝাঁটা লইয়া ঘর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, মুনিঋষিরা দুষ্টামি করিয়া সেইরূপটা লোকের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। এখন চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাগণ, ভাবিয়া দেখুন, পায়ের নখ হইতে টিকিটী পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষিরা দাড়ীর বর্ণনাটুকু বাদ দিলেন কেন ? তাঁহারা তো তালকাণা নহেন, আর একজন দুইজন ভুল করিতে পারেন, সকলেই ত আর ভুল করিবেন না। তস্মাৎ, তৃতীয় যুক্তি অনুসারেও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দেবতাদের সাধাপণতঃ দাড়ী মোঠেই ছিল না।

আরও একটা অকাটা প্রমাণ শুনুন। গীতায় স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। —"অনেক বাহুদরবক্ত্রনেত্রম্" কতহাত কত উদর, কতমুখ, তার আর শেষ নাই, সবই অনন্ত ! কৈ দাড়ী ত দেখাইলেন না। ভাবিবেন না ও একটা সামান্য কথা, ব্যাসদেব লিখিতে ভুলিয়াগিয়াছেন। কেন—এতজায়গা থাকিতে দাড়ীর বেলায় ভুল ? আর সামান্য কথা বলিয়া উপেক্ষাই বা করিবেন কেন ? "কেচিদ্বিলগ্নাদশনান্তরেষু" বলিয়া, কোথায় কুরুগণকে গ্রাস করিতে গিয়া ভগবানের দাঁতের ফাঁকে ডাঁটার ছিপড়ের মত দুই একটা কুরু পুত্র লাগিয়া গিয়াছিল তাহাও যখন বর্ণনা করিতে পারিলেন, তখন কেন বলিলেন না কেচিৎ দাড়ীতেও লগ্না। তবেই বোঝা যাইতেছে যে, দেবতাদের আদি পুরুষের ও দাড্যাভাবঃ। আর আদি কারণের যদি দাড়ীর

অভাব হয়, তবে আদিকারণ হইতে উদ্ভূত সে সব কার্য্যাবলী অর্থাৎ দেবতারা তাঁহাদের দাড়ীর অভাব ও হইবেই হইবে। যেহেতু কারণ গুণাঃ কার্য্যগুণমারভ্যন্তে ইতি ন্যায়াৎ।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিরাও অনেক দেবতার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন না মাঘকবি শিশুপাল বধে নারদের বর্ণনায় তাঁহার অম্ভোরুহ কেশর দ্যুতি "জটাগুলি এমন কি বীনা বাজাইয়া আঙ্গুলে যে 'কড়া', পড়িয়া ছিল সেটী পর্য্যন্ত এবং কিরতার্জ্জুনীয়ে কবি ভারবি বৃদ্ধ ইন্দ্রের "বিশদভ্রূ যুগচ্ছন্নবলিতাপাঙ্গলোচন" বলিয়া পাকা ভ্রূটী ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দাড়ীর নাম ও তাই গন্ধ ও নাই। থাকিলে কি আর তাঁহারা ছাড়িয়া দিবার পাত্র? কাদম্বরীতে বাণ ভট্ট একা চন্দ্রাপীড়ের দাড়ীর তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, প্রাচীন সংস্কৃত কবিরাও জানিতেন দেবতাদের দাড়ী ছিল না। আর না 'গবেষণা' যথেষ্ট হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুপাঠক, এত প্রমাণ প্রয়োগেও যদি সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, সংস্কৃত শাস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার, একটু কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া লইবেন। ইত্যলম্।

শ্রীরাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

বসন্ত-পূজা।

হে জগৎ দ্বন্দ্বময় তোমার জীবন।
শান্তি ও সজ্যাতে সদা হও বিলোড়ন।
এক স্রোতে উঠ পড়, কভু ভাঙ্গ কভু গড়,
কভু সৃজি লক্ষ প্রাণী অনন্তে ভাসাও—
ধ্বংসি তায় পুনঃ কভু শোণিতে ডুবাও!

প্রকৃতির আবর্ত্তনে গতি অবিরাম
লভিয়াছ হে পৃথিবি! ধাও অবিশ্রাম।
কোন পথে তব গতি, কবে শেষ কোথা মুক্তি
কত শীত কত গ্রীষ্ম বসন্ত শরৎ
তোমার অনন্ত রাজ্যে হে বিশ্ব জগৎ!

দারুণ শিশির সিক্ত বিপুল সংসার
তুষার মণ্ডিত যবে বিশ্ব চরাচর
উজলিয়া সেই কালে, আসে বুঝি নভঃস্থলে
দুরন্ত হিমানী নাশে প্রচণ্ড তপন—
হিমান্তে বসন্ত তাই করে আগমন।

আজি এই মহাক্ষণে ওহে ঋতুরাজ
লভিলে জনম কেন পরি এই সাজ
কি জাগে হৃদয়ে তব, কেন তব বংশীরব
মাতাইছে সারাবিশ্ব সুমোহন সুরে !
হে বসন্ত আজি কেন প্রেমের বিভোরে !

বসন্তের হে কোকিল কেন হেথা এসে
তুলেছ তরল তান আকাশে আকাশে
কেন আজি শাখে বসি কুহুস্বরে চারিদিশি
মাতাইয়া সারা বিশ্ব আজিকে এখন
বিজ্ঞাপিছ হে বিহঙ্গ কার আগমন ?

হে প্রেমিক রাজ রাজ বসন্ত মধুর
বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জনম তোমার
প্রতিবার নব বাঁশী, নব তান নব হাসি
নবীন সজ্জায় সাজ মুরতি মোহন—
অনন্ত মরণে তব অনন্ত জীবন!

হৃদয় দুয়ারখুলি দেখিনু ভিতর
হে প্রকৃতি তব রূপ রাজে হিয়াপর।
তব প্রভা রূপ জ্যোতি, সমুজ্জল নীল কান্তি
ব্যাপিয়াছে চারিদিশি আলোক মালায়
হে দেবি তুমিই সত্য নশ্বর ধরায় !

অনন্তের জ্যোতির্ম্ময় হে বিশ্ব জীবন
বিশাল সাম্রাজ্যে তব সদা বিবর্ত্তন !
এতদিন যে আঁধারে, অন্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে
ফিরে ছিনু সারাবিশ্ব আলোকের তরে
আজি দেখি সে আলোক আমার দুয়ারে।

তোমার অনন্ত মূর্ত্তি পুত্তলিকাপরে
স্থাপিয়াছি হে শিবাণি অতি ক্ষুদ্র করে।
তোমারে শতধা করি, দুর্গা শ্যামা ভয়ঙ্করী
আখ্যায় সম্বোধি মোরা ক্ষুদ্র মন লয়ে,
তাহে কি ক্ষুদ্রত্ব তব হয় গো অভয়ে !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ)

উপহার।

মনে বড় সাধ কিছু দিতে উপহার,
স্মরিয়া চরণ প্রভু! উদ্দেশে তোমার।
ভাবিয়া আকুল হই কি দিব আবার,
দিয়াছি ত সকলি হে! যা ছিল আমার,
সঁপিয়াছি মনপ্রাণ চরণে তোমার।
সুবাস কুসুমে গাঁথি গলে দিমু হার—
নাহিক নূতন কিছু করিবারে দান,
শুষ্ক হ'তে শুষ্কতর আছে শুধু প্রাণ—
আর আছে হাহাকার, শোকাশ্রু পতন,
মর্ম্মাহত হৃদয়ের নীরব রোদন।
যদিও এ নেত্রনীর, প্রেমপূত জল,—
তোমার পূজার যোগ্য, অতি সুবিমল,—

এ অশ্রু আবার কিগো দিব উপহার,
সতত ঝরিছে যাহা উদ্দেশে তোমার?
অশ্রুপূর্ণ শোক-মেঘ হৃদি ব্যোমতলে,
আপনি উদিয়া প্রান্তে বরষে বিরলে।
প্রেমের ফুটন্ত কলি, স্বর্ণরাগ মাখা,
তোমারি নিকটে যাহা শিখেছিনু সখা,
যার বলে সহে আছি যাতনা দুঃসহ,
তোমা লাগি পরিতাপ তোমার বিরহ,
প্রাণের অতল তলে আছে সব(ই) মম,
গভীর জলধি গর্ভে, মুকুতার সম।
তুলিয়া তাহাই নাথ! গেঁথেছি যতনে,
পবিত্র প্রণয়মালা তোমারি কারণে।
আসিয়াছি দিতে আজি সেই উপহার,—
তোমারি পুরাণ স্মৃতি, চরণে তোমার।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

প্রেতাত্মা।

(গল্প)।

(১)

সুবর্ণ-রজত-খচিত আলবোলার নলটি হাতে করিয়া পীতমখমলমণ্ডিত উচ্চাসনে অলসভাবে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে করিতে বৃদ্ধ মনসবদার হালিমজ্জমান সুকণ্ঠী গায়িকা বাণুবিবির সঙ্গীত সুধায় পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। বহুবর্ণ চিত্রিত অসংখ্য দীপাবলী সেই সুবৃহৎ প্রমোদ-গৃহ আলোকিত করিতেছিল। সেই বিলাস প্রকোষ্ঠের চতুঃপার্শ্বে বহুমূল্য মখমল-রেশম-কিংখাপাবরিত বসিবার কুরসি। প্রস্তর প্রাচীরে মহম্মদীয় বীরদিগের জড়োয়া তসবির। গৃহের মধ্যস্থলে সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ গালিচা। গালিচার চতুষ্কোণে মনোমুগ্ধকারী শিখিচিত্র। ময়ূরের পুচ্ছ ও পক্ষের স্বাভাবিক বর্ণের

অনুকরণে গালিচার পশমবিন্যাস। দক্ষ শিল্পী তাহাতে ময়ূরাবয়বের প্রত্যেক রঙ্‌টি প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার মধ্যভাগে বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত এক মস্‌জিদ্ অঙ্কিত। মস্‌জিদের চূড়ার উপর জানু পাতিয়া বসিয়া গজেন্দ্র দন্তখচিত বীণা বাজাইয়া বাণুবিবি গীত গাহিতেছিলেন।

ওম্‌রাহের বদননিঃসৃত তাম্রকূট ধূম যেমন গোলাপ চামেলি খস্‌খস্ সুবাস মিশ্রিত হইয়া মর্ম্মর প্রাচীর প্রতিঘাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহার চিন্তাগুলিও তেমনি কত পুরাতন যুদ্ধক্ষেত্রের শোণিত স্রোতের মধ্য দিয়া, দিল্লীশ্বর আউরঙ্গজেবের দেওয়ানী খাসের কত প্রমোদ রজনীর ক্রোড় দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। বাণুবিবির ইমন্ রাগিণী সুরে স্বর মিলাইয়া দিল্‌দার মল্‌ঝিলের পিঞ্জরবদ্ধ বুল্‌বুল্‌গুলি কাকলী করিতেছিল।

শেষে গায়িকার বীণ্ হইতে করুণ ঝঙ্কার সমুত্থিত হইল। বেহাগ রাগিণী বৃদ্ধ যোদ্ধার উত্তেজক ভাবগুলিকে প্রশমিত করিল। তাঁহার স্মৃতিপটে উদয় হইল সেই কথা—যখন যৌবনের উত্তপ্ত শোণিত-তেজোৎসাহিত হইয়া তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভগিনীর ও তাহার পাপপ্রসূতা কন্যার বিনাশাজ্ঞা দিয়া তিনি তাঁহার আস্‌রফী ইজ্জৎ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। আজ সে কাহিনী তাঁহার তীব্র মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। হালিমজ্জমান ভাবিলেন—আমার অপরাধ কি? পাপীয়সী উচ্চবংশ সম্ভূতা হইয়া আমারই অধীনস্থ কাফের যোদ্ধার সহিত গুপ্ত প্রণয় করিয়া আমার নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিয়াছিল, তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিয়া কি এমন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি? আর তাহার সেই নিরপরাধিনী সদ্যপ্রসূতা বালিকা? সে ত কাফের দুহিতা, পাপের নিশানা। মন্‌সবদারের বৃদ্ধ শরীরে যুবার ন্যায় তেজ আসিল।

সে রাত্রের মত সভাভঙ্গ হইল। ধনী তাঁহার শয্যাগৃহে বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন।

শয্যাগৃহে একটি মাত্র দীপ ক্ষীণতেজে জ্বলিতেছিল। দুইজন বাঁদী বৃদ্ধের পদসেবা করিতেছিল। হঠাৎ দ্বারদেশ বিলম্বিত শালের পরদা একটু অপসারিত হইল। বৃদ্ধ দেখিলেন তথায় তাঁহার মৃতা ভগ্নী লুৎফুন্নিসার স্বপ্নমূর্ত্তি সদৃশ শ্বেতবোরকাবৃত-মূর্ত্তি। বোর্‌কার বদনাচ্ছাদনটি অপসারিত, বৃদ্ধ দেখিলেন সে বদনে যৌবন আছে, রক্ত নাই।

হলিমজ্জমান বীর হইলেও এ দৃশ্যে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, স্থির নেত্রে বৃদ্ধ সেই রমণীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বাঁদীরা বলিল—কোন্ হ্যায় ?

মূর্ত্তি কিছু বলিল না। তাহার সেই রক্তহীন কৃশ অধরে বৈশাখী ক্ষণ-প্রভা সদৃশ একটি হাসি দেখা দিল। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া মূর্ত্তি বৃদ্ধকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। দাসীবৃন্দ বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—অল্ অজমতুলিল্লাহি * ! হালিমজ্জমান ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—অল্-হাফিজ ! †

তাহার পর বহু অনুসন্ধান হইল, দাস দাসী নফর গোলাম অট্টালিকার প্রত্যেক স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। সুসজ্জিত গৃহগুলির বহুমূল্য আসবাব সরঞ্জম্‌গুলির ধ্বংস-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল কিন্তু দীপ হস্তে প্রহরীরা তথায় যাইয়া কাহারও অনুসন্ধান পাইল না। বৃদ্ধা দাই সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। ভীতিবিহ্বল চিত্তে তোবা তোবা করিতে করিতে সে কহিল—ইহা ফৌতি লুৎফ্ বাইয়ের প্রেতাত্মা।

আর হালিমজ্জমান ? মহাবলী বীর পরাক্রম হালিমজ্জমান সেই দিন হইতে ঘোরতর জ্বরাক্রান্ত হইল।

(২)

ক্ষীণশরীরা ঘর্ঘর নদী সেনাপতি তারিফ খাঁর শিবির নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কতকগুলি মোগল সৈন্য নদীতীরে চুল্লি নির্ম্মাণ করিয়া রুটী সেকিতেছিল। অপর জনকতক হাতিয়ার সানাইতেছিল। দুই চারিজন গল্প করিতেছিল আর ফজল দিন গাহিতেছিল—

আয়েবোয়াদ্ তুঁহি যাকে জরা শোখ্‌সে কহ না।
মরতা হায় কোহি তালিবিদেদার খপরলে। ‡

---

* ধন্য জগদীশ্বর।

† জগদীশ্বর রক্ষা করুন।

‡ হে প্রভাতমলয় তুমি গিয়া একবার সেই ক্রীড়াশীলা রমণীকে বল—একজন প্রেমিক মরিতেছে একবার সংবাদ লও।

একটী সুসজ্জিত তাম্বু মধ্যে সেনাপতি তারিফ খাঁ কতকগুলি যুবক মনসব্দারের সহিত উপস্থিত শিখ্ সমর সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন ।

এখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় । দক্ষিণে সাহসী মহাবলী মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাত এবং উত্তরে এই শিখ্ হাঙ্গামা । শিখ্গুরু বান্দা যুদ্ধনীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন । তিনি দেখিলেন—লাড্ডু, ভুরা, খড়কু প্রভৃতি পাঞ্জাবী নাম লইয়া এবং পীতবাস পরিধান করিয়া গোখাদক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী ভীতোৎপাদক গম্ভীর-নামা যবনদিগের সহিত বিগ্রহে জয়লাভ করা অসম্ভব । তিনি আজ্ঞা প্রচার করিলেন—আজি হইতে জগতে শিখ্দিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে । গোমাংস,শূকরমাংস, মদ্য ও মাদক দ্রব্য ব্যতীত সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই শিখ্দিগের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল । প্রত্যেক শিখের নামের অন্তে "সিংহ" শব্দ যুক্ত হইল । ভুরা, মলা প্রভৃতি তখন হইতে ভরত সিংহ, মল্ল সিংহ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিল । গুরু বলিলেন,খাল্সা সেনার সকলে গুম্ফ শ্মশ্রু ও কেশ ধারণ করিবে এবং হস্তে লৌহ বলয় পরিধান করিবে। গ্রন্থসাহেব পাঠ না করিয়া কেহ অদ্যাপি জলগ্রহণ করিবে না । আর এক বিষয়ে বান্দাগুরু শিখ্দিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন । তখন মুসলমান বারাঙ্গনারা ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছিল । বান্দা বলিলেন, অদ্যাপি যাহার যবনী বেশ্যার সহিত সংস্রব থাকিবে, সে হিন্দু নয় যবন ।

তারিফখাঁ বলিলেন—"মির্আস্গর সাহ আপনার পিতা হালিমজ্জমান সাহ সম্রাট্ বাহাদুরসাহের প্রিয় পাত্র । আজ পাঞ্জাবে কাফের জয় করিয়া আপনি যশস্বী হউন ।"

বিনয়ভরে যুবক সেনাপতিকে অভিবাদন করিলেন । সেনাপতি তাঁহার শিক্ষা তাঁহার বলশালী অঙ্গ সৌষ্ঠবের অনুরূপ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন ।

একজন প্রহরী আসিয়া বলিল—মির্ সাহেব আপনার পিতার নিকট হইতে জরুরী সংবাদ লইয়া দূত আসিয়াছে ।

নিজশিবিরে গিয়া মির্ আসগার পিতৃপ্রেরিত পত্র পাঠ করিলেন । তাঁহার উত্তপ্ত শোণিতবেগের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত হৃদপিণ্ড ত্যাগ করিয়া যুবকের মস্তকাভিমুখে ছুটিল । মির্ সাহেব ভাবিলেন—পিতা বার্দ্ধক্যে বাতুল হই-

লেন নাকি? মুসলমান্ হইয়া ভূত বিশ্বাস? এ সকল কাফেরি কুসংস্কার পিতা পাইলেন কোথা হইতে?

দূত বলিল—ছোট মিঞা বান্দা স্বয়ং জোনাবালির অবস্থা দর্শন করিয়া আসিয়াছে। দিলদার মন্‌ঝিলের সকল গোলাম নফর ত্রস্ত। অবশ্য আজ দুই বৎসর আপনাদের অট্টালিকার অন্তঃপুর জনশূন্য রহিয়াছে। আজকাল কিন্তু দলবদ্ধ না হইয়া কেহ তথায় যাইতে পারে না।

উদ্ধত ভাবে মির সাহেব বলিলেন—তোরা বেইমান্। নিমকহারাম। আমাদের অন্ন খাইয়া গৃহ রক্ষা করিতে পারিস্ না?

করযোড়ে দূত কহিল—হুজুর আমাদিগের বহু যত্নসত্বেও গৃহের আস্‌বাব নিত্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। বাবুর্চিখানা হইতে সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যাদি নিত্যই অপহৃত হয়। এবং মন্‌ঝিলস্থ সকলেই দেখিয়াছে—

মির্‌সাহেব মহা রাগত ভাবে বলিলেন—কি দেখিয়াছে?

অভিবাদন করিয়া দূত কহিল—হুজুরের মৃতা ফুফিকে।

মির্ সাহেব সজোরে দূতকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—শয়তান্! হারামজাদ্।

(৩)

দিলদার মন্‌ঝিলের আমোদের প্রস্রবণ বন্ধ হইয়াছে। এখন সকলেই সশঙ্কিত, প্রেতাত্মা কখন কাহার অনিষ্ট করে। পূর্ব্বে দাসদাসী এক একবার বাটীর হারেমে প্রবেশ করিত। এখন কিন্তু আর মধ্যাহ্ন ব্যতীত তাহারা তথায় যাইতে সাহস করে না। যখনই অন্দরে যাইতে হয় তখনই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তথায় প্রবেশ করে।

আজ মন্‌সবদারসুত মির্ আস্‌গর সাহের বাটী আসিবার দিন। মনসব-দারের হৃদয়ে সাহস হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছিলেন—জয়মল্লও ত বীরবংশসম্ভূত রাজপুত ছিল, সে ইস্‌লাম গ্রহণেও স্বীকৃত ছিল। যৌবনোন্মত্ত হইয়া ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য এ জগতে কে না করে? তবে কেন আমি মিছামিছি স্ত্রীহত্যা করিয়া ভগিনীঘাতক হইয়া বৃদ্ধ বয়সে এ যাতনা ভোগ করিতেছি?

দূরে অশ্ব পদশব্দ শ্রুত হইল। একজন ভৃত্য আসিয়া ছোটা মিঞা মির্

আসগরের আগমন সংবাদ দিয়া গেল। হলিমজ্জমানের শিথিল হস্তপদাদিতে বল সঞ্চারিত হইল।

বীরপুত্র চিন্তাক্লিষ্ট পিতাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—পিতঃ! এসকল ভৌতিক ব্যাপার নহে। মানসিক দৌর্ব্বল্যই এ সকল ভীতিকর বস্তুর জন্মস্থান। আমার সাহসী সেনাগণ আজি হইতে মন্‌ঝিল রক্ষা করিবে। যদ্যপি কোনও অসৎ লোকের চাতুরীতে এরূপ কার্য্য সংঘটিত হয়, পিতঃ নিশ্চিন্ত থাকুন তাহার খণ্ডিত শির শীঘ্রই আপনার চরণতলে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইব।

বৃদ্ধ অন্যমনে বলিলেন—আমি যে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দিলদার মন্‌ঝিলের সকল দাসদাসী সে মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছে।

যুবক বলিলেন—যে আজ সতের বৎসর মরিয়া গিয়াছে সে আবার ফিরিয়া আসিবে কিরূপে? পাপিষ্ঠ জয়মল্লেরও ত আপনি শিরশ্ছেদ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারাও ত একার্য্য সম্ভবপর নহে।

জয়মল্লের নাম শ্রবণে খানসামা আফজলের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। কার্য্যগতিকে সে গৃহ হইতে বাহিরে প্রস্থান করিল।

মির্‌সাহেব বলিলেন—এ পাঠান কে? ইহাকে পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখিয়াছি।

"ও আমার খান্‌সামা, আজ ছয়মাস উহারই সেবায় জীবিত আছি।"

যুবকের একটু সন্দেহ হইল। সে ভাবিল ইহার সহিত ত উপদ্রবের কোনও সংস্রব নাই?

(৪)

বৃদ্ধ পিতার প্রকোষ্ঠে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিয়া মির্ আসগর নিদ্রা যাইতে ছিলেন। দিল্‌দার মন্‌ঝিলের পদ ধৌত করিয়া যমুনা তাজমহলের সেবা প্রয়াসে ছুটিতেছিল। পরপারের আম্রকানন হইতে বিহঙ্গমগণ আপনাদিগের কুজনধ্বনি বায়ুবক্ষে ভাসাইয়া দিতেছিল। আজ চারিদিবস সুদূর পাঞ্জাব হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আগ্রা আসিয়া মির্ সাহেবেরও লৌহবপু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধেরও তন্দ্রা আসিতেছিল এবং আফজল খাঁ তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল।

অকস্মাৎ পার্শ্বগৃহে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি স্ফটিক ঝাড় ভূমে নিপতিত হইল। বৃদ্ধের হৃদ্‌কম্প হইল। আফজল ডাকিল—ছোটা মিঞা।

সে বজ্রধ্বনিতে আস্‌গার সাহেবও নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যা ত্যাগ করিয়াই শয্যাপার্শ্ব হইতে অসি গ্রহণ করিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আফজল।

আফজল বলিলেন—হুজুর।

মির্‌সাহেব কিছু বলিলেন না। তাঁহার প্রথম সন্দেহ হইয়াছিল আফজলের উপর। তাহাকে নিকটে দেখিয়া তিনি মুক্ত অসি হস্তে পার্শ্বগৃহে ছুটিলেন। তথায় কিন্তু কেহ নাই। মর্ম্মর প্রস্তরোপরি দেখিতে পাইলেন—স্ফটিক ঝাড়ের ধ্বংসাবশেষ।

মির্‌সাহেব বাহিরে যাইল। কিন্তু সেই শুভ্র প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া হাশিমজ্জ-মানের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। পুনরায় সেই অমানুষিক হাস্য, আবার সেই ইঙ্গিত। ভয়ে বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হইল।

মির্‌সাহেব ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন আফজল তাঁহার পিতার মুখে গোলাপবারি সিঞ্চন করিতেছে। সক্রোধে আস্‌গর কহিলেন—শয়তান্! বাবা বেহোসী!

আফজল অভিবাদন করিয়া বলিল—হুজুর!

ক্রোধে মির্‌সাহেবের সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—এসকল বান্দাদিগের শয়তানি। আমাদিগের ধনাদি অপহরণ করিবার জন্যই তাহারা এ সকল খেলা খেলিতেছে। ভয় দেখাইয়া পিতার লৌহ-কোষের চাবি সংগ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মনসবদার কহিলেন—আস্‌গর দেখিয়াছ? আর আমার কথা অবিশ্বাস করিবে? সে মূর্ত্তি তোমার ফুফির ব্যতীত অপর কাহার?

লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায়, আস্‌গরের বাক্‌নিঃসরণ হইল না।

(৫)

মির্‌সাহেবের নির্ভীকতা ও সতর্কতার পরিবর্ত্তে কিন্তু দিলদার মন্‌ঝিলের প্রেতভীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এখন পাচক পাচিকারা অন্যান্য লোক ব্যতীত ভূতের জন্যও কিছু কিছু ভক্ষ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। এখন আর দাস দাসীরা একেলা যথেচ্ছা বিচরণ করে না।

মির্‌সাহেব শুভ্রমূর্ত্তির সহিত দুই একদিন ছুটিয়াছিলেন। অন্ধকারে হারে-মের মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রেতমূর্ত্তি মির্‌সাহেবের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাহার

পর ক্ষণবিলম্বে দীপাদি সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মির্ আসগারের প্রথম সন্দেহ হইয়াছিল নূতন ভৃত্য আফজল খাঁয়ের উপর। কিন্তু অপরাপর দাসদাসী অপেক্ষা তাহাকে অধিক বিনয়ী ও সাহসী দেখিয়া হালিমজ্জমানসুতের সন্দেহ অপনোদিত হইয়াছিল। আজ মির্সাহেব তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—আফজল তোমার সহিত একটা শলা করিব।

বিনীতভাবে আফজল বলিল—হুজুর ফরমাইয়ে।

মিরসাহেব তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—আজ আমার ইচ্ছা অন্তঃপুরে আমার অনুচর সৈন্যগণকে নির্ব্বাপিত মশাল হস্তে স্থাপিত করি। ভূত বাহির হইলে সোরগোল তুলিব, তাহাতে তাহারা দীপ জালিয়া ভূতের গতি রোধ করিবে। ইহাতেও যদি অনৈসর্গিক কিছু দেখিতে পাই তাহা হইলে আজ হ'তে বুঝিব শয়তান স্বয়ং আমার পিতার সহিত দুষমণি করিতে আইসে।

আফজলের ললাটে একটা ক্ষীণ রেখা প্রতিফলিত হইল, মির্সাহেব তাহা দেখিতে পাইলেন না। সে বলিল—সাহেব গোলামের গোস্তাকি মাফ্ করিবেন। আপনার অন্তঃপুরে সৈন্য প্রবেশ করিবে?

আস্গার বলিলেন—তাহাতে ক্ষতি নাই, আফজল্। শূন্য হারেমে সৈন্য প্রবেশ করিতে নিষেধ কি?

তাহাই স্থির হইল। সন্ধ্যার পর নির্ব্বাপিত মশাল ও চকমকি হস্তে দীর্ঘশ্মশ্রু সবলকায় নিস্তব্ধ প্রহরীসকল গৃহে, প্রাঙ্গণে, অলিন্দে স্থাপিত হইল।

(৬)

আজ প্রেতাত্মাকে দেখিয়া মিরসাহেবের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে করিতে নিষ্কোষিত অসি হস্তে যুবক তাহার অনুসরণ করিল। কত পুরাতন অলিন্দের উপর দিয়া, কত বহুমূল্য গালিচাকে পদদলিত করিয়া, কত ধূলিসিক্ত প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আস্গার ছুটিলেন। অন্তঃপুরের মর্ম্মর-সোপান শ্রেণীর নিকট গিয়া কিন্তু যুবক আর সেই শ্বেত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না।

সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে মির্ সাহেব বলিলেন—দীপ লইয়া আইস।

অনেক দীর্ঘকায় সাহসী মোগল পাঠান দীপ লইয়া সেই দিকে ছুটিল। অন্ধকারে মির সাহেব বুঝিলেন কে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া সোপানের দিকে চলিয়া গেল। তাহার পর মৃদু অথচ গম্ভীর একটি শব্দ তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল। তাঁহার মনে হইল কে একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর টানিয়া একটি সোপানের উপর রক্ষা করিল।

দীপ লইয়া কতকগুলি সৈন্য প্রাসাদ শিখরাভিমুখে চলিয়া গেল। কতকগুলি সৈন্য নিম্নে নামিয়া গেল। মির্ আসগর স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন একটি সোপানের প্রস্তর যেন ঈষৎ ফাঁক রহিয়াছে।

সবলে শিলাখণ্ডকে অপসারিত করিয়া একটি মশালহস্তে মির্ সাহেব দেখিলেন সোপান নিম্নে একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গ।

তৎকালীন দস্যুভীতি প্রযুক্ত ধনাদি সংরক্ষণ হেতু প্রত্যেক ধনী গৃহেই এইরূপ গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থাকিত। দিলদার মনৃঝিলের এইরূপ গুপ্ত গৃহের কথা যুবক মির্-সাহেব জানিতেন না।

কালবিলম্ব না করিয়া মির্ সাহেব সুড়ঙ্গ মধ্যে নিপতিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল, আত্মরক্ষার চিন্তা তাঁহার বীরহৃদয়ে স্থান পাইল না। গৃহমধ্যে নিপতিত হইবামাত্রেই একজন অসিহস্তে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কিন্তু আফজল অসি কোষবদ্ধ করিলেন।

আফজলকে দেখিয়া যুবকের ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন—বে-ইমান্, তোর এই কাজ?

আফজল বীরের মত হাস্য করিয়া বলিল—মির্ আস্‌গর তোমাকে স্বহস্তে লালন পালন করিয়াছি। তোমার সহিত আমার বৈরীভাব নাই। কিন্তু তুমিই আমার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায় হইলে। ইচ্ছা ছিল তোমার পাপিষ্ঠ পিতাকে এক এক পা করিয়া কণ্টকময় পথ দিয়া নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যাইব। বালক চিনিতেছ না আমি জয়মল্।

একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রেতবালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনপ্রভা যুবকের হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত ভাবগুলিকে প্রশমিত করিতে লাগিল। মির্ আস্‌গার সংস্কারবশতঃ এতদিন এ সৌন্দর্য্য দেখে নাই; আজ মানবী জানিয়া বীরযুবা দুই একবার তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া লইল। মির্ সাহেব বলিলেন—আর ঐ যুবতী?

জয়মল বলিল—দালিয়া আমার কন্যা, তোমার ভগিনী। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে হালিমজ্জমান আমাকে আমার স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। ঘাতকের অনুগ্রহে কিন্তু আমরা প্রাণদান পাই। এত-দিন গোপনে সুদূর উর্ব্বরা বাঙ্গালা দেশে বাস করিতাম। আজ এক বৎসর হইল তোমার পিতৃস্বসার কাল হইয়াছে। তাঁহারই ইচ্ছামত তোমার পিতাকে অনুতপ্ত করিবার জন্য এ খেলা খেলিতাম। তাঁহারই নিষেধ হেতু পাপিষ্ঠের প্রাণনাশ করি নাই বা করিব না।

আস্‌গরের কুলাভিমান ফিরিয়া আসিল, বলিল—জয়মল্ল বাল্যে তোমার অনুরক্ত ছিলাম। তোমায় মাফ্ করিতে পারিতাম কিন্তু তুমি রজপুত তুমি কাফের।

জয়মল বলিল—আমি ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। আইস যুদ্ধ করি।

উভয়ের শাণিত অসি কোষ হইতে নির্গত হইল।

এই সময় বালিকার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল। সে বলিল—"বাবা, বাবা মারিও না, আস্‌গার স্থির হও, যুদ্ধে কাজ নাই।" বালিকা আবার মূর্চ্ছিতা হইল।

সে বদননিসৃত সে কাতরবাক্য কেহই অবহেলা করিতে পারিল না। অসিদ্বয় পুনঃ কোষ প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ হালিমজ্জমান সকল শুনিয়া শান্তি পাইলেন। তিনি বলিলেন—আফজল ভাই আমিই দোষী, এস আলিঙ্গন করি।

রাজপুত হৃদয়ে ক্রোধ থাকে না, আফ্‌জল্ সে আহ্বান মান্য করিলেন।

আর দালিয়া? হাকিম্ আসিল, দালিয়ার চিকিৎসা হইতে লাগিল। আস্‌গার সস্নেহে তাহার সেবা করিতে লাগিল।

(৭)

এখন দিলদার মন্‌ঝিলে সকলে ভূতের গল্প শুনে আর হাসে। দাস দাসী বলে—ধন্য বীরত্ব, ছোটা মিঞার, ইনি শীঘ্রই বাদ্‌সাহের প্রধান সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন। তাহা অপেক্ষা সাহসী কিন্তু দালিয়া বিবি।

একটি সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া দালিয়া ও মির্ আস্‌গর কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন। মির্ সাহেব শিখ্ সমরের কথা কহিতেছিলেন আর দালিয়া বিবি একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল।

দালিয়া বলিল—আস্‌গর তোমার তাঁই ধন্য সাহস।

আস্‌গর বলিল—তোমা অপেক্ষা আমার সাহস দালিয়া ?

দালিয়া তাহার সফরীনেত্রদুটি অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, তোমায় আমায় তুলনা হয় আস্‌গর্ ? আমি তোমার সুখ্যাতির উপযুক্ত !

যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, সুখ্যাতির কেন, তুমি আমার হৃদয়ের রাণী হইবার উপযুক্ত।

* * * * *

মির্ সাহেবের সহিত দালিয়ার বিবাহের দিন বাণুবিবি অনেক গীত গাহিয়াছিলেন। হালিমজ্জমান কিন্তু তাঁহাকে বেহাগ রাগিণী আলাপ করিতে দেন নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্।

রাঠোর বালক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হেনকালে তেজসিংহ, তিলক তনয়
নির্ব্বাসিত, দুর্গহারা, চন্দায়ৎ ছলে,
হইলেন উপনীত। সাদর সম্ভ্রমে
আলিঙ্গন করি তাঁয়, জিজ্ঞাসে চন্দন,
"ভ্রাতঃ ! বিষম সমস্যা, হৃদয় আকুল,
কেমনে রক্ষিব কহ উপস্থিত রণে
পূজ্য রাণা পরিবার ? দুর্গ পরিহরি
পলাইতে হৃদি মোর হ'তেছে ক্ষোভিত ;
অন্তরে রণভূমে পড়িলে সমরে
কে রক্ষিবে ম্লেচ্ছহস্তে রাণাকুলনারী" ?

"বচনের অগ্রে তব চিন্তাকুল মুখে
বুঝিয়াছি ও বারতা। রাজপুত বীর,

রণভাবি কভু কি গো হয় চিন্তাকুল?
প্রথম জ্ঞানের সেই বিকাশ নবীন,
বাল্যাবধি সুখসাধ সমরে উল্লাস,
বংশের গৌরব তরে রাজয়ারাগণ
তুচ্ছ করি প্রাণ, মানে মান বরণীয়।
যদবধি শুনিয়াছি শত্রু আগমন
নিয়ত নিরত আছি উপায় চিন্তনে—
উপস্থিত পন্থা এক করেছি মনন।

দেবীসিংহসুত! নহে তব অগোচর
দুর্ভাগ্য তেজের যত অতীত কাহিনী—
সে সূর্য্যমহল দুর্গ, রাঠোরের পতি,
সহাস্য গম্ভীর মূর্ত্তি শত্রু ভয়াকর,
বার বার পলায়েছে চন্দায়ৎ কুল
প্রবল বাত্যার মুখে ধূলার মতন—
কোমলে কঠিনে মিশ্র পূর্ণশক্তিমান,
স্বরগের সেই দেবে ভুলেছ চন্দন?
কতই আদর পিতা করিতেন দোঁহে—
তব প্রতি প্রীতি তাঁর ছিল সমধিক।

কালচক্র সর্ব্বগ্রাসী নির্ম্মম নিষ্ঠুর
সমভাবে দেবঅংশ, পশু অংশ নরে—
অকাতরে সুখস্বর্গ করিয়া নরক—
আকর্ষয়ে আপনার অন্তহীন ক্রোড়ে;
বিষম ক্ষমতাশালী; কা'র মুখপানে
কভু কি গো দুঃখে দুঃখী ফিরিয়ে সে চায়?
কালের অনন্ত গর্ভে সূর্য্যগড় পতি,—
হানি বজ্র প্রতিপাল্য আশ্রিত মস্তকে

হইলেন ধীরে মগ্ন। পবনে পবনে,
হাহাকার মর্ম্মভেদী উঠিল চৌদিকে।

জননীর বক্ষে পড়ি অনাথ বালক—
কাঁদিলাম আত্মহারা। মরমে প্রথম
বিঁধিল দারুণ শেল, অধীর যন্ত্রণা—
ভেঙ্গে গেল সুখস্বপ্ন কিশোর কল্পনা;
দুর্ভেদ্য তমসারাশি চৌদিক আঁধার—
পড়িলাম বারিমাঝে অনন্ত অপার,
কালমেঘ থরে থরে বেড়িল নীলিমা
নিরাশার রাহু আসি গ্রাসিল চন্দ্রমা,
নির্ম্মম অদৃষ্ট লিপি, প্রথম আঘাত
করিল প্রচণ্ড বেগে ক্ষুদ্র হৃদি'পর।

বিপদ আসে না কভু একাকী নিঃসঙ্গ
কুল বৈরী চন্দাবৎ, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয়,
কতবার হতমান পিতাসহ রণে,
বিধবা রমণী ভয়ে কাপুরুষ ভীত
প্রবেশিল দুর্গে দস্যু নিশীথমাঝার;
উঠিল গর্জ্জিয়া মাতা সিংহিনীর প্রায়,
দৃঢ়হস্তে অস্ত্র ধরি রোধিলেন রোষি—
দলবদ্ধ এসেছিল বধিবারে মোরে;
সতীর সে মূর্ত্তিভীমা হেরি আচম্বিতে,
আতঙ্কে কাঁপিল পাপী উঠিল শিহরি।

নরকের কীট তা'রা দশ জন মিলি
আঘাতিল তরবারি মাতৃদেহ'পর
নারীরক্তে কলঙ্কিল রাজপুত অসি;
মরণের কালে মাতা করিলা ইঙ্গিত—

বাতায়ন পথে পশি পলাইতে মোরে,
ক্ষোভে, রোষে, ক্ষুদ্র বক্ষ হ'ল আলোড়িত
ভাবিলাম পলাইব শৃগালের মত ?
তদপেক্ষা শতগুণে রণে মৃত্যু শ্রেয়ঃ—
আবার মানস পটে উঠিল ভাতিয়া
বাঁচি যদি—প্রতিহিংসা আছে একদিন।

নিম্নে দীর্ঘিকা গভীর। বাতায়ন ভেদি
পড়িলাম জলমাঝে। ঈশ্বর কৃপায়
বাঁচিলাম কোনমতে; লইনু আশ্রয়
অরণ্যে, ভীলের মধ্যে। ভীলের সর্দ্দার,
ভুলাইল পিতৃশোক, পিতৃস্নেহদানে—
ভীল যোদ্ধা যত আছে, ধনুর্ব্বাণ ধরি
আনন্দে মাতিবে রণে প্রতিহিংসা দিনে;
কবে হবে সেই দিন ? চারণী আদেশ,
সম্বরণ জ্ঞাতিযুদ্ধ, ম্লেচ্ছ বর্ত্তমানে।

দুর্গম বনের পথ জানি ভালমতে—
লয়ে যাই সেই পথে রাণা পরিবার;
সমাদরে ভীল যত কায় মন প্রাণে
রক্ষিবে রাণীর মান। ম্লেচ্ছ কোটী কোটী,
শতবর্ষ অন্বেষণে, পাবে না সন্ধান।
রক্ষহ পিতার দুর্গ নিশ্চিন্তে চন্দন।
অসংখ্য শত্রুর সেনা কি কহিব তাঁরে—
দেবীসিংহে শুধাইলে তব সমাচার;
দাও ভ্রাতঃ আলিঙ্গন চলিলাম আজি
সমগ্র স্বর্গের দেব রক্ষুন তোমায়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীউমাচরণ ধর।

আকবর সাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কার্লাইল বলেন, জগতের ইতিহাস জগতের মহৎ লোকের জীবন চরিতের সমষ্টি মাত্র। মহৎ লোক বৃথা জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি জগৎকে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া যান। যে সময় ও ঘটনাবলির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বিরক্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে প্রকৃত উন্নতির আদর্শ হইতে জগৎ বহুদূরে অবস্থিত। প্রকৃত উন্নতির আদর্শ ও জগতের উপস্থিত অবস্থার বৈপরীত্য তাঁহার মনে অহোরাত্র জাগরূক থাকে। এই বৈষম্য দূরীভূত করিতে তাঁহাকে ভীষণ জীবন সংগ্রামে সময়ে সময়ে অসহায় ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু যে বলবতী আশা প্রণোদিত হইয়া তিনি এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা কখনও তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হয় না; সুতরাং অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত তিনি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েন। কোনও রূপ বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। প্রত্যেক দেশে সময়ে সময়ে এইরূপ মহৎ লোকের অভ্যুত্থান হয়। দেশের সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন। সক্রেটিস, লুথার, চৈতন্য, নানক, উইক্লিফ, শঙ্করাচার্য্য, জন নক্স, ব্রুটস, এলফ্রেড দি গ্রেট, অশোক এবং আকবর জগতের উন্নতি সাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। আকবর ভারত সম্রাট না হইলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইয়া যাইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে পাঠান শাসন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। আলাউদ্দীন খিলিজী কিম্বা শেরসাহের ন্যায় সুবিখ্যাত নরপতিগণ তাঁহাদিগের বহুবিধ সুবিধা সত্ত্বেও কেনই বা স্থায়ী বা সুদৃঢ় রাজ্য স্থাপিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে যতগুলি রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল তন্মধ্যে তৈমুরের বংশধরেরাই অত্যন্ত দুর্ব্বল নরপতি ছিলেন। গজনী এবং ঘোরি বংশোদ্ভবেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাহাদিগকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য স্বদেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে হইত। দাসবংশীয় রাজাদিগেরও এইরূপ করিতে হইত। তৎকালে কাবুল ও ভারত-

বর্ষের একই সিংহাসন ছিল বলিয়াই এইরূপ বন্দোবস্তের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু হুমায়ুনের ভারত সিংহাসনাধিরোহণ কালে কাবুল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এইরূপ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটিল। পাঠান শাসনকালে রাজ্যশাসনের এরূপ ব্যবস্থা সত্বেও কোন রাজবংশ স্থায়ী হইতে পারে নাই। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, দেশীয়গণের সাহায্য অভাবে এই বিশৃঙ্খলা ঘটিত।

প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে ফতেপুর শিক্রীর এক নির্জ্জন স্থানে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন পূর্ব্বক আকবর সাহ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করিবার নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতেন। এইরূপ নিভৃত চিন্তা সময়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন নরপতিগণের অতীব ভ্রমাত্মক শাসন কৌশল নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অসংখ্য প্রজাগণ যাহারা তাঁহার জাতি ধর্ম্ম ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সেই সকল প্রজাবৃন্দকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিষয়ে বিশ্বাস করিতে হইবেক। কূটবুদ্ধি আকবর শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, রাজপুত জাতি রণক্ষেত্রে মত্ত হস্তীর সম্মুখে অপর লোককে প্রাণভয়ে পলাইতে দেখিয়াও আপনারা পলায়ন করে না, প্রত্যুত অতীব সাহসে তাহার সম্মুখীন হইয়া প্রভুকার্য্যে আপন জীবনকে বিপন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঈদৃশ গুণাবিষ্ট রাজপুতদিগকে যদি তিনি বন্ধুভাবে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে তাহারা রাজত্বের স্তম্ভ স্বরূপ হইবে, কিন্তু শত্রুভাবে পরিণত হইলে তাহারা অতীব দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে।

অধিরোহণের অব্যবহিত পরেই আকবর বুঝিতে পারিলেন যে তিনি শত্রুমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত এবং নিতান্ত অসহায়। সুতরাং হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে একজাতীয়তা ভাবের উদ্রেক করা ও স্বয়ং ঐ জাতির নেতা হওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে রাজ্য সুদৃঢ় করিতে হইলে পরাক্রমশালী সৈন্যের সাহায্য অপেক্ষা রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের প্রতিযোগিতা অধিকতর ফলপ্রদ।

রাজনীতিবিষয়ে উপরোক্ত আদর্শই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পরামর্শদাতাগণ ধর্ম্মান্ধতা-দোষ-দুষ্ট ও অত্যন্ত

নির্যাতনতৎপর। এই সকল পরামর্শদাতাগণ হিন্দু মুসলমানের মিলন ও সখ্য-ভাব একেবারেই দেখিতে পারিত না। হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষভাব যাহাতে দূরীভূত হয় সে বিষয়ে বাদসাহ বিশেষ চেষ্টিত থাকিলেও মন্ত্রীগণ সেই ভাব যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাতেই বিশেষ যত্নবান্ হইতেন। রাজস্ব আদায় বিভাগে হিন্দুকর্ম্মচারীগণের বিশ্বাসযোগ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও *, তাঁহারা উপযুক্ত হিন্দুদিগকে শাসনবিভাগে কোন উচ্চপদ প্রদানের কথা মনেও স্থান দিতেন না। যুবা আকবরকে অনভিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া মুসলমান সেনাপতিগণ বার বার তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারেই সম্রাট তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। আকবরের মনে হইত যে হিন্দুদিগকে যদি সেনাপতি করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্যরূপ ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই †।

মন্ত্রীদিগের সহিত সম্রাটের এইরূপ বিরোধ বহুকাল চলিয়াছিল। বহুদিন এইরূপ বিরোধ করিয়া তিনি তাঁহার চিরপোষিত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে ভ্রাতৃদ্বয় ফৈজী ও আবুলফজল তাঁহার সহায়তাকল্পে যোগদান করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় ও সহযোগীতায় সম্রাটের উদ্যম সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত কয়েকটি মহৎ নীতি প্রবর্ত্তিত হইল।

১। প্রত্যেক প্রজাই তাঁহার স্বধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে—তাঁহাকে কোনরূপ উৎপীড়ন করা হইবেক না।

---

* ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনের প্রথম অবস্থা হইতেই রাজস্ব আদায় ও রক্ষাকার্য্য কেবল মাত্র হিন্দুর দ্বারাই পরিচালিত হইত। মুসলমান আমীরগণের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হিন্দু কর্ম্মচারীগণের উপরেই ন্যস্ত থাকিত।

Blochman's Article, Calcutta Review.

† আবদুল্লা খাঁ উজবেক, খাঁ জমান ও মির্জাগণের ন্যায় সামন্তবর্গ বহুসংখ্যক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিদ্রোহেই হিন্দুগণ সাহায্য করেন নাই ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্গে সেনাবৃন্দ মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে তখন হিন্দুগণ এই বিদ্রোহে যোগদান না করিয়া বিশ্বাসযোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

Blochman—Calcutta Review April 1871.

২। আইনের চক্ষে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলেই সমান।

৩। যে জাতিভুক্ত হউন না কেন, যে কোন লোক বুদ্ধি ও পারদর্শিতার উপযুক্ত হইবেন তিনিই রাজকীয় উচ্চপদে অধিকারী হইতে পারিবেন।

হুমায়ুনের ভীতিসঙ্কুল মরুভূমি মধ্য দিয়া পলায়ন কালে পথিমধ্যে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে বৈরী খুল্লতাতের ক্রোড়ে অর্পণ করা হইল। শৈশবাবস্থা হইতেই এক প্রকার অবরুদ্ধের ন্যায় ভাবী সম্রাটকে ক্লেশ ও বিপদে অভ্যস্ত হইতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষে তিনি পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। খাঁ বায়রামের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ও কটুক্তিতেও তিনি যুদ্ধে আহত শত্রু হিমুকে আঘাত করিতে বিমুখ হইলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যুবক আকবর বিপুল সাম্রাজ্যের ভার স্বহস্তে লইতে বাধ্য হইলেন।

পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পর কেবল মাত্র পাঞ্জাব এবং দিল্লী ও আগ্রার চতুঃপার্শ্বের দেশগুলি তাঁহার করায়ত্ত হইল। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলি তাঁহার শত্রুহস্তেই রহিয়া গেল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি নিম্নলিখিত রাজনৈতিক বিষয় চিন্তা ও তৎসাধনকল্পে মনোনিবেশ করিলেন *।

(ক) স্বীয় কর্ম্মচারীগণের উপর আধিপত্য স্থাপন।

(খ) রাজত্বের অন্যান্য দেশ করায়ত্ব করণ।

(গ) নানারূপ বিদ্রোহ ও বিপ্লব হেতু রাজ্যের যে শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে পুনরায় তাহার স্থাপন।

(ক) ১। সম্রাটের যে সকল দক্ষ সেনাপতি ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে খাঁজামান অন্যতম। খাঁজামান তাহার ভ্রাতার সাহায্যে ভারতবর্ষের উত্তরে বেহারের সীমা পর্য্যন্ত সকল দেশ সম্রাটের শাসনাধীন করেন। সম্রাট তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলে, তিনি সম্রাটের যুবা বয়স এবং সৈন্য ও অর্থবল সামান্য বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি যতবারই বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন আকবর ততবারই তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। চিত্তের এইরূপ উদারতার জন্য সম্রাটকে অনেকস্থলে ক্ষতিস্বীকার করিতে

Elphinstone p. 500.

* Vide Blochman's Ain Akbari, p. 320.

হইয়াছিল। তিনি লোকের দোষ ক্ষমা করিয়া বিস্মৃত হইতে পারিতেন। খাঁজামানের প্রতি সম্রাটের ব্যবহার তাঁহার উদারতার একটি দৃষ্টান্ত।

এলাহাবাদের সন্নিকটে কড়ার যুদ্ধে এই শোকপূর্ণ ঘটনার শেষ অঙ্ক অভিনয় হইয়া গেল। সম্রাট স্বয়ং অতীব সাহসিকতার সহিত বিদ্রোহী খাঁজামানকে পরাস্ত করিলেন।

২। তৎপরে সম্রাটকে মালবের শাসনকর্ত্তার উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ধাত্রীপুত্র আদম খাঁ সেনাপতিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি মালবের শাসনকর্ত্তা রাজ বাহাদুরকে পরাস্ত করিয়া মালব হইতে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু তাঁহার জয়লব্ধ দেশ সম্রাটের শাসনভুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হইলে, সম্রাট তাঁহাকে স্বীয় শাসনাধীন হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং আদম খাঁর দোষ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু পুনরায় যখন হিংসাবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আদম খাঁ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী আতা খাঁকে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করেন, তখন সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। যে ধাত্রী মাহুম অনঙ্গের * স্তন্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, আদম খাঁ সেই মাহুম অনঙ্গের পুত্র হইলেও হত্যাকারী আদমকে সম্রাট ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

৩। মিরজাগণের বিদ্রোহ।—মিরজাগণ গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে সম্রাটকে বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। মিরজাগণের সহিত যুদ্ধে সম্রাট ও তাঁহার হিন্দুবন্ধুগণ সাহসিকতা ও বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহে যতগুলি বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কারনালের যুদ্ধ ও ক্রমাগত সৈন্যচালনা করিয়া নয় দিবস মধ্যে আগ্রা হইতে পাটনা আগমন—এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* এই মাহুম অনঙ্গ আকবরের প্রিয় ধাত্রী ছিলেন এবং সম্রাটের অন্তঃপুরের প্রধানা রমণী ছিলেন। ইনি অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন এবং কয়েক মাসের জন্য সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। আদম খাঁকে দুইবার দুর্গ প্রাচীর হইতে ধরাতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। পুত্রের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে মাহুম অনঙ্গ মনভঙ্গ হেতু প্রাণত্যাগ করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই মির্জাদের বিদ্রোহ দমন করা হইল। কয়েক বৎসর পরে মিরজা হুসেন নামক এক ব্যক্তি গুজরাটে পুনরায় বিদ্রোহ বিপ্লব উপস্থিত করায়, ধৃত হইলেন এবং কিছুকালের জন্য কারাগারে বন্দী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়ায়, সম্রাট তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। হোসেন মিরজার সহোদরার সহিত যুবরাজ সেলিমের বিবাহ হইয়া গেল। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,

ও

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ.

অমরসিংহ ও অমরকোশ।

"ইত্যমরসিংহকৃতৌ নামলিঙ্গানুশাসনে" ইত্যাকার বাক্য "নামলিঙ্গানুশাসন" নামক কোশের প্রত্যেক কাণ্ডের শেষেই লেখা আছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝায় যে, অমরসিংহ এই কোশের রচয়িতা। প্রয়োজন ব্যতিরেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের মধ্যে গ্রন্থ রচনার নিয়ম ছিল না। অমরসিংহও প্রয়োজনবশেই এই ক্ষুদ্রায়তন অভিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রয়োজন যে কি তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যথা,—

"সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি সঙ্ক্ষিপ্তৈঃ প্রতিসংস্কৃতৈঃ।
সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গৈর্নামলিঙ্গানুশাসনম্॥"

ইহার অর্থ এই যে, আমি অনেক তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সঙ্ক্ষিপ্ত ও প্রতিসংস্কৃত শব্দ দ্বারা সমগ্র নামলিঙ্গানুশাসন বর্গক্রমে বলিব। "অন্যতন্ত্রাণি" বাক্যে ত্রিকাণ্ড, উৎপলিনী ব্যাড়ি বররুচি বামন রুদ্র রভস প্রভৃতি কোশ বুঝায়। প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিভেদে শব্দব্যুৎপাদক গ্রন্থকে তন্ত্র কহে। অমর

* **Blochman's Ain Akbari p, 404.**

সিংহ স্বকীয় কোশের নাম লিঙ্গানুশাসন রাখিয়াছেন। কারণ, শব্দ ও তল্লিঙ্গব্যুৎপাদক অভিধান লিখাই তদীয় উদ্দেশ্য। অমরকোশ যে সকল তন্ত্রের সংগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে ব্যাড়িকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক সংগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু তাহা লোপ পাইয়াছে। * উৎপলিনী প্রভৃতি কোশ অসংক্ষিপ্ত, নামকারিকাদি কোশ লিঙ্গহীন, লিঙ্গকারিকাদি কোশ নামহীন, অমরমালাদি কোশ অসম্পূর্ণ, এবং বোপালিত আদি কোশ বর্গশূন্য। এই সমুদয় অভাব দূর করিয়া, অসার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু অর্থপ্রকাশক লঘুকৃত পদের যোজনা দ্বারা "সংক্ষিপ্ত," এবং স্বপর্য্যায়ে অমুক্ত হইলেও তদ্বিষয় ভঙ্গীক্রমে পরপর্য্যায়ে কথন হেতু অথবা অবয়বের পরিবর্ত্তনে বাচকত্বের হানি হয় না বলিয়া "প্রতিসংস্কৃত" শব্দ দ্বারা প্রচলিত সমগ্র শব্দ ও তল্লিঙ্গব্যুৎপাদক অভিধান সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদে প্রকরণাবদ্ধ করিয়া পাঠার্থিগণের সুখগ্রাহ্য করিবেন, ইহাই অমরসিংহের এই কোশ রচনার প্রয়োজন। অমরসিংহ প্রয়োজনানুরোধেই গ্রন্থপ্রয়োজনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আড়ম্বর ইহার উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থের প্রতি বর্ণ এই প্রয়োজনের আভাসে অনুরঞ্জিত: সুতরাং বৈদিক ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই কোশের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পণ্ডিতসমাজে অমরনামটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, গ্রন্থকারপ্রদত্ত লিঙ্গানুশাসন নাম তুচ্ছ করিয়া, অমরকৃত বলিয়া, অমরকোশ নামেই সকলে ইহাকে আখ্যাত করিয়াছেন।

বৈদিকগণ অমরকোশের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম মতের প্রশংসা করেন নাই, বরং কোশলক্রমে কেহ কেহ তাঁহার নিন্দাবাদই করিয়াছেন। তাঁহারা অমরসিংহের বিদ্যাবিষয়ক কৃতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া একদিকে যেরূপ আনন্দানুভব হেতু তদীয় সুখ্যাতি শিষ্যানুক্রমে প্রচার করিয়াছেন, অপরদিকে তদীয় বৌদ্ধত্বের পরিচয় পাইয়া তদ্ধর্ম্মমতের ও তদ্ধর্ম্মীর কুৎসা করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই।

অমরকোশেই অমরসিংহের বৌদ্ধত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম প্রমাণ, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত গ্রন্থারম্ভে স্বকীয় ইষ্টদেবতাকে বাচনিক

---

* ঋগ্বেদপ্রতিশাখ্যে শৌনকোক্তি এই—"ব্যাড়েঃ সর্ব্বত্রাভিধানলোপঃ।"

নমস্কার করিবার রীতি শিষ্টাচারসম্মত। অমরসিংহ এই শিষ্টাচারের অমর্য্যাদা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ॥"

অর্থাৎ,—যাঁহার জ্ঞান ও দয়া সিন্ধুবৎ অগাধ, যিনি নির্ম্মলগুণসম্পন্ন, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা সেই অক্ষয় পুরুষকে সেবা করুন।—এই অনুবাদে "স শ্রিয়ে চামৃতায় চ" এই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। কারণ, অমরসিংহ এতদ্দ্বারা কোনও দেবতাবিশেষকে নমস্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ না করিলেও বিশেষণ দ্বারাও বিশেষ্যের প্রতীতি হইয়া থাকে এতাদৃশ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া টীকাকারগণ তত্তদ্বাক্যের নানার্থ ধরিয়া বিবিধ দেবতাবিশেষের কল্পনা করিয়াছেন। অমরদীপিকাকার বুদ্ধপক্ষে ও সমুদ্রপক্ষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিতে বুদ্ধপক্ষে বিষ্ণুপক্ষে শঙ্করপক্ষে সমুদ্রপক্ষে ও গ্রন্থপক্ষে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী পরিশেষে বলিয়াছেন যে ইহাতে বিশেষণের যেরূপ সমাবেশ দেখা যায় তাহাতে বুদ্ধপক্ষের ব্যাখ্যাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। নামপারায়ণে ক্ষীরস্বামী একমাত্র বুদ্ধপক্ষেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিকাণ্ডরহস্যে রামনাথ বলিয়াছেন,—"যদাঽসৌ কবিরমরসিংহো গ্রন্থমেবং চকার তদানীমনাদৃতবেদপথানাং মদোদ্ধুরাণামতিপ্রাবল্যমাসীৎ। অতএব কৃষ্ণাদিপদোল্লেখে তেষামনুপাদেয়তা স্যাৎ, বুদ্ধাদিপদোল্লেখে তু দক্ষিণাপথপ্রবৃত্তানামনুপাদেয়তা স্যাদিত্যুভয়ানাং তত্রোপাদেয়তার্থমস্য মঙ্গলশ্লোকস্য তাদৃশী গূঢ়ার্থতা।"—অর্থাৎ, যে সময়ে কবি অমরসিংহ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে বেদদ্বেষী মদমত্ত ব্যক্তিদিগের অত্যধিক প্রাবল্য হইয়াছিল। সুতরাং, যদি অমরসিংহ মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণাদি দেবতার নামোল্লেখ করিয়া নমস্কার করিতেন, তাহা হইলে উহা বেদবিদ্বেষীদিগের উপাদেয় হইত না; পক্ষান্তরে, উক্তরূপ নমস্কারে বুদ্ধাদির উল্লেখ থাকিলে দক্ষিণাপথের লোকেরা গ্রন্থের আদর করিতেন না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অমরসিংহ এতদুভয়সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই শ্লোকটিকে এতাদৃশ গূঢ়ার্থব্যঞ্জক করিয়াছেন।—রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন,—"তদ্বদত্রাপি

বৌদ্ধবিদ্বেষিণাং প্রবৃত্তয়ে কবিনা বুদ্ধপদোপাদানমকৃত্বৈব শ্লেষেণায়ং শ্লোকঃ উক্তঃ”—অর্থাৎ, পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই স্থলে কবি অমরসিংহ স্বকৃত গ্রন্থ বৌদ্ধবিদ্বেষিগণের প্রবৃত্তির নিমিত্ত এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বুদ্ধকে গ্রহণ না করিয়া শব্দের নানার্থযোগ দ্বারা অস্পষ্ট ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন —কিন্তু ব্যাখ্যাসুধায় ভানুজী দীক্ষিত বলেন যে, মঙ্গলাচরণে জিনবাচক কোন শব্দ না থাকা সত্ত্বেও শ্লোকোক্ত কতিপয় বিশেষণের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া স্বকীয় বুদ্ধিবলে বুদ্ধাদির কল্পনা করা বৈদিকগণের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। সে যাহা হউক, স্থানবিশেষে বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের প্রতীতির আবশ্যকতা প্রাচীনেরা স্বীকার করিয়াছেন।

অমরসিংহের বৌদ্ধত্বের অপর এক প্রমাণ অমরকোশোক্ত “সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো” ইত্যাদি কতিপয় শ্লোক এবং “ধর্ম্মরাজৌ জিনযমৌ” এই শ্লোকাংশ। স্বর্গবর্গে “অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ” ইত্যাদি দেবতাসাধারণের নামোল্লেখ করিয়া দেবতাবিশেষের নামোল্লেখের প্রারম্ভেই “সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ” হইতে “গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ” পর্য্যন্ত তিনটি শ্লোকে ১৮টি বুদ্ধবাচক ও ৭টি শাক্যমুনিবাচক এই ২৫টি বুদ্ধাদির নামোল্লেখের পরে অমরসিংহ—

“ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ॥”

ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবতার উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতাপেক্ষা বুদ্ধাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। নানার্থবর্গে “ধর্ম্মরাজৌ জিনযমৌ” এই বাক্যের “জিনযমৌ” শব্দদ্বয়ে সমসঙ্খ্যক স্বর সত্ত্বেও জিন শব্দের পূর্ব্বনিপাত করিয়া তিনি যমাপেক্ষা জিনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। কোনও বৈদিক কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হইলে, তিনি, ছন্দোভঙ্গাদির আশঙ্কা না থাকায়, জিনাপেক্ষা যমকে প্রধান জ্ঞান করিয়া যম শব্দের পূর্ব্বনিপাত দ্বারা “যমজিনৌ” বাক্য লিখিতেন।

অমরসিংহ স্বকীয় বৌদ্ধত্ব হেতু বুদ্ধকে কেবল দেবতা বলিয়া নহে, ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও প্রধান দেবতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু

স্মার্ত্তেরা কোনক্রমেই বুদ্ধের দেবতাত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরাণে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র কৃষ্ণবলরাম বুদ্ধ ও কল্কী এই দশবিধ বিষ্ণবতারের কথা আছে। তন্মধ্যে বুদ্ধাবতার নবম। কলিযুগ সম্পূর্ণ প্রবৃত্ত হইলে দানবাসুরদিগকে সম্যক্ মোহিত করিবার নিমিত্ত বুদ্ধ অঞ্জনসুতরূপে কীকটদেশে (বিহারে) অবতীর্ণ হন। যথা,—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

কবি জয়দেবও লিখিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

অতএব দেখা যাইতেছে, দেবকার্য্যসাধনার্থ দেবদ্বেষীদিগের মধ্যে অবিদ্যাকৃত মুগ্ধত্ব উৎপাদন উদ্দেশ্যে স্বয়ং বিষ্ণুই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রুতিমূলক বৈধহিংসার নিন্দা করেন। সুতরাং বুদ্ধের উপদেশ দ্বারা বেদ উপবৃংহিত * না হওয়াতে উহা সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। এইরূপে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবহিতার্থ অসুরবিক্রম লাঘব করিবার জন্য জড়পদার্থসমূহের সংযোগবিয়োগবিশেষ দ্বারা চেতনা উৎপন্ন হয়, উহা জড়নিষ্ঠ স্বতন্ত্র কোন পদার্থ ধর্ম্ম নহে বলিয়া যে চার্ব্বাকদর্শন লোকমধ্যে প্রচার করেন, তাহাও বেদমূলক নহে বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। উপদেষ্টা স্বয়ং পুরুষোত্তম বিষ্ণুই হউন, কিংবা কোন খ্যাতনামা ঋষিই হউন, যদি তাঁহার উপদেশে অপৌরুষেয় বেদ উপবৃংহিত না হয় তবে সাধুগণ কোনক্রমেই সেই উপদেশের আদর করেন না। প্রত্যেক গ্রন্থ, প্রত্যেক উপদেশ ও প্রত্যেক অনুষ্ঠান বেদোপবৃংহণ রূপ পরীক্ষা দ্বারা সাধুজন কর্ত্তৃক বিচারিত হওয়াতে কালকৃত আবর্জ্জিতমতবাদ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের অবিকৃতি

---

* রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে উপবৃংহণ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বেদের বা শ্রুতির প্রমাণসিদ্ধ অর্থের (উদ্দেশ্যের) স্পষ্টীকরণের নাম বেদোপবৃংহণ। যথা,—

"উপবৃংহণ চ শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ বিশদীকরণং।"

সম্পাদিত হয়। এই স্থলেই সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব দ্বারাই পুরুষবিশেষের বা কালবিশেষের প্রাধান্য অগ্রাহ্য করিয়া ইহা আবহমানকাল তুল্যরূপে মোক্ষার্থিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধের দেবতাত্ববিষয়ে স্মৃতিনিবন্ধে যে আলোচিত হইবে তাহা বিস্ময়জনক নহে।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি শ্রাদ্ধবিবেকে লিখিয়াছেন,—"চতুর্থ্যন্তপদনির্দ্দিশ্যত্বম্ দেবতাত্বম্।"—অর্থাৎ, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদ দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় তিনিই দেবতা। "সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ" এই বাক্যের "সর্ব্বভূতেভ্যঃ" পদে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হওয়াতে "সর্ব্বভূত" দেবতাপদবাচ্য হইয়াছেন। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—"ত্যাগোৎপত্তে প্রাক্ চতুর্থ্যন্তপদনির্দ্দেশ্যত্বম্ দেবতাত্বম্। অন্যথা. জলাশয়োৎসর্গাদৌ সর্ব্বভূতান্তঃপাতিনঃ সুগতস্যাপি দেবতাত্বাপত্তেঃ, তস্য চাপাত্রত্বাৎ।"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র চতুর্থ্যন্ত পদে নির্দ্দিষ্ট হইলেই দেবতা বলা যায় না; যে কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত দান করা হয়, সেই কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, তিনিই দেবতা; তাহা না হইলে, জলাশয় উৎসর্গাদিতে পঠিত "সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বভূতের অন্তর্গত হওয়াতে সুগতেরও (বুদ্ধেরও) দেবতাত্ব প্রাপ্তিবিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু তদাশঙ্কা অমূলক, কারণ বুদ্ধ অপাত্র। এস্থলে দেবতাত্ব বিষয়ে শূলপাণির শাস্ত্রসঙ্গত অভিপ্রায় বিশদ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার যে অপাত্রত্ববাদে বুদ্ধের দেবতাত্ব খণ্ডিত করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয় স্মার্ত্তসমাজের সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা দর্শনেও দেখিতে পাই যে, সৎকার্য্যসিদ্ধান্তবাদী প্রামাণিক পক্ষের ও অসৎকার্য্যসিদ্ধান্তবাদী অপ্রামাণিকপক্ষের বিরোধ চলিয়াছে। বেদোপবৃংহিত সাঙ্খ্যাদি ষড়্দর্শন সৎকার্য্যসিদ্ধান্তবাদ পোষণ করেন, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ সৌগতদর্শন অসৎকার্য্যসিদ্ধান্তবাদ স্থাপনে প্রয়াসী। প্রামাণিক পক্ষ বলেন, "সতঃ স জায়ত" ইত্যাদি, অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, "অসতঃ স জায়ত" ইতি, অর্থাৎ, এই সৃষ্টিপ্রবাহের আদ্য কারণ অসৎ (অবিদ্যমান) ইহা সৌগতাদি অপ্রামাণিকপক্ষের মত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই বাক্য দ্বারা অসৎকার্য্যসিদ্ধান্তবাদেরই অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অসতঃ স জায়ত" ইতি বাক্যের বক্তা বুদ্ধাদি যদি আপ্ত* বলিয়া গৃহীত হন, তবে, "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই ন্যায়সূত্রের ও সাঙ্খ্যসূত্রের বলে বুদ্ধাদির উপদেশও আপ্তো-

---

* ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেন যে, যথাদৃষ্টার্থের কথনেচ্ছাপ্রযুক্ত সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা উপদেষ্টা বলিয়া কথিত হন; সাক্ষাৎকৃত (প্রত্যক্ষীভূত) অর্থের আপ্তি (প্রাপ্তি) এতাদৃশ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তিনি আপ্ত নামে কথিত হন; আপ্তব্যক্তির ও আপ্তোপদেশের এরূপ লক্ষণ ঋষি আর্য্য ও ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পদেশ রূপে বেদবৎ অভ্রান্ত বলিয়া মান্য হইবে এরূপ আশঙ্কায় বৌদ্ধের আপ্তত্ব নিরাকরণের জন্য বৈদিকদার্শনিকেরা যত্নের ত্রুটি করেন নাই। সাংখ্য সূত্রের বৃত্তিতে অনুরুদ্ধভট্ট লিখিয়াছেন,—শব্দপ্রমাণ আপ্তো-পদেশ হইলেও সেই আপ্তোপদেশ আপ্তকৃত নহে (আপ্তমুখরিত মাত্র), কারণ বেদ অপৌরুষেয় (কোন পুরুষকৃত নহে); সূত্রোক্ত "শব্দ" পদটি শব্দপ্রমাণজন্য জ্ঞানের কারণ রূপে কথিত হইয়াছে; ফলতঃ শব্দজন্য যে জ্ঞান জন্মে তাহাই শব্দ,* যে হেতু কার্য্যে কারণের উপচার হইবার নিয়ম আছে; অতএব শাক্যাদির (বুদ্ধাদির) বাক্য আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা বেদার্থের বিরুদ্ধতা হেতু সম্পূর্ণ অযুক্ত। অতঃপর অনুরুদ্ধভট্ট সূত্রোক্ত বহু যুক্তির ব্যাখ্যাব্যপদেশে বৌদ্ধপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সেই সকলের উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। তবে এইমাত্র বলি-লেই যথেষ্ট হইবে যে, স্মার্ত্তগণ বুদ্ধের দেবতাত্ব এবং প্রামাণিকদার্শনিকগণ বুদ্ধের আপ্তত্ব (যথার্থবাদিত্ব) খণ্ডন করিয়াছেন।

বৈদিকদৃষ্টিতে বিষ্ণুর অবতার হইয়াও স্বর্গে ছত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে যে বুদ্ধ স্থান পান নাই, এবং মর্ত্ত্যেও যিনি আপ্ত রূপে গৃহীত না হইয়া ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সাশীল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় উপেক্ষিত হইয়াছেন, সেই বুদ্ধপ্রচারিত বেদনিন্দাপর মতবাদ-গ্রহণজন্য অমরসিংহ যে বৈদিকগণ কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ অংশেও নিন্দিত হইবেন না ইহা সম্ভবপর নহে। আমরা দেখিতে পাই যে কোনও বৈদিক "অমরসিংহো হি পাপীয়ান্ সর্ব্বং ভাষ্যমচুচুরৎ" এতাদৃশ বাক্যে অমরসিংহকে বাস্তবিকই পাপিষ্ঠ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অমরসিংহের বৌদ্ধত্বেরই নিন্দাবাদ, তদীয় বিদ্যাবত্তার বা প্রতিভার নিন্দা নহে।

বিদ্যাবত্তার নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং উক্ত বৈদিক "সর্ব্বং ভাষ্যমচুচুরৎ"† এই বাক্যে অমরসিংহ সকল ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন তদ্বিষয়েই সাক্ষ্য দিয়াছেন। মুগ্ধবোধকার বোপদেব আটজন আদি শাব্দিককে "জয়ন্তি" শব্দ দ্বারা যে জয়যুক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অমরসিংহ অন্যতম। যথা,—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলীশাকটায়নাঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রাঃ জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

অপর কোন বৈদিক অমরকোশকে "সনাতন" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যথা,—

---

* অনুরুদ্ধভট্টকৃত শব্দের এ ব্যাখ্যাটি বৈশেষিকদর্শনসম্মত। যথা,—"শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ॥ ২। ২। ২১॥" অর্থাৎ কোন শব্দ কর্ণগোচর হইলে যে অর্থ প্রতীত হয় তাহাই শব্দ। ন্যায়দর্শনভাষ্যেও বাৎস্যায়ন শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† এস্থলে ভাষ্য চুরি করিয়াছেন বলিয়াই অমরসিংহ "পাপীয়ান্" শব্দে কথিত হইয়াছেন, আপাততঃ এরূপ অর্থের প্রতীতি হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, পাপিষ্ঠ বলিবার জন্যই অমরসিংহের উপর চৌর্য্যাপরাধ আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু চৌর্য্য পাপিষ্ঠত্বের নিদান নহে।

"মেদিন্যমরমালা চ ত্রিকাণ্ডো রত্নমালিকা।
রন্তিদেবো ভাগুরিশ্চ ব্যাড়িঃ শব্দার্ণবস্তথা।
দ্বিরূপশ্চ কলিঙ্গশ্চ রভসঃ পুরুষোত্তমঃ।
দুর্গোঽভিধানমালা চ সংসারবর্ত্তশাশ্বতৌ।
বিশ্বো বোপালিতশ্চৈব বাচস্পতিহলায়ুধৌ।
হারাবলী সাহসাঙ্কো বিক্রমাদিত্য এব চ।
হেমচন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চাপ্যমরোঽয়ং সনাতনঃ।
এতে কোশাঃ সমাখ্যাতাঃ সঙ্খ্যা ষড়্‌বিংশতি স্মৃতা॥"

এই ষড়্‌বিংশতি কোশের মধ্যে একমাত্র অমরকোশই সনাতন শব্দে বিশিষ্ট হইয়াছে। হেমচন্দ্র প্রভৃতি আভিধানিকেরা সনাতন শব্দের নানার্থ লিখিয়াছেন। এস্থলে শাশ্বত (নিত্য) অর্থটি গ্রহণ করিতে হইবে। যে পদার্থ সর্ব্বকাল-সম্বন্ধপ্রাপ্ত তাহাই শাশ্বত বা নিত্য। তাহা হইলে অমরকোশ ধ্বংসরূপ প্রাকৃত পরিণাম অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিবে ইহাই সনাতন শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায়। উপাদেয়ত্ব ও সর্ব্বজনাদৃতত্ব গুণেই গ্রন্থ অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বরচিত অলুপ্ত কোশ সমূহের বিবিধ অভাব যত্নে পরিহার করিয়া সার্দ্ধসহস্র শ্লোকাত্মক স্বল্পায়তনে প্রয়োজনীয় শব্দ সমূহের সন্নিবেশ দ্বারা এবং সঙ্ক্ষিপ্ত ও প্রতিসংস্কৃতপদসমূহনিবদ্ধ সমগ্র লিঙ্গানুশাসন বর্গক্রমে কথন দ্বারা অমরসিংহ অলৌকিক পাণ্ডিত্যের সহিত গ্রন্থের উপাদেয়তা ও সুগমতা এত বৃদ্ধি করিয়াছেন যে তৎকৃত কোশ অবিনশ্বর হইবে এরূপ অনুমান কোনক্রমেই অসঙ্গত হয় নাই। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল অমরকোশ রচিত হইয়াছে, কিন্তু এই কালের মধ্যে ইহার আদর আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, অধুনা অন্য দেশের সংস্কৃতাধ্যায়ী অনেক পণ্ডিতও ইহার গুণগ্রাহী হইয়াছেন। এস্থলে রঘুনাথচক্রবর্ত্তী ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিতে "ধীরস্তনোতি বিমলামরকোশটীকাম্" এই বাক্যে অমরকোশকে বিমল (দোষশূন্য) বলিয়া প্রশংসা করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বাস্তবিকই "অমরোঽয়ং সনাতনঃ"। কোশরচনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হওয়াতে অমরসিংহ প্রকৃতপক্ষেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যে জাতিতে, যে দেশে, এতাদৃশ কোশকার জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতি, সেই দেশ, ধন্য হয়। সেই জাতি ও সেই দেশ যখন সম্পূর্ণ অধঃপাতে যাইবে তখনই বিমল সনাতন অমরকোশের বিলোপ সম্ভবপর হইবে, নচেৎ নহে। ক্রমশঃ

শ্রীরসিকলাল ঘোষ দাস।

কলিকাতা ৫।১২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, মণিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ)

আনন্দ।

১। আনন্দই জীবের প্রয়োজন। সকলেই আনন্দ চায়। স্ফুরন্তি সীকরা যস্মাৎ আনন্দস্যাম্বরেঽবনৌ। সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥ যে ব্রহ্ম হইতে আনন্দকণা আকাশে ও ভূমিতলে স্ফুরণ হইতেছে, সর্ব্বজীবের জীবন সেই আনন্দ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। আনন্দই সকল বস্তুর জীবন। আনন্দের অভাব হইলে জীব বিকৃত হইয়া যায়, তাহার সুন্দররূপে পরিপুষ্টি হয় না। ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

২। উন্নতির তারতম্যানুসারে নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর আনন্দ ভোগে জীবের রুচি হয়। সর্ব্বোন্নত জীবের লক্ষ্য নিত্যানন্দ প্রাপ্তি। ইতর জীব ক্ষণিক সুখেরই প্রয়াস করে।

৩। ব্যবহারিক জগতের আনন্দ অস্থায়ী, ধর্ম্মজগতই স্থায়ী আনন্দের সংবাদ দেয়। ধর্ম্মজগতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, আমি তাহারই আলোচনা করিতেছি।

৪। কেহ বলেন কর্ম্মেই আনন্দ, কেহ বলেন উপাসনায় আনন্দ, আর কেহ বলেন জ্ঞানেই আনন্দ।

৫। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা বলেন, নিত্যানন্দপ্রাপ্তি জ্ঞানেই সম্ভব। জ্ঞান-লাভের ক্রম—কর্ম্মানন্দ, যোগানন্দ, উপাসনানন্দ। প্রথমেই কর্ম্ম, পরে যোগ, পরে উপাসনা এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান।

৬। বেদান্তাদি শাস্ত্রের ক্রম এই। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ এবং বিহিত কর্ম্ম-গ্রহণ প্রথম কর্ম্ম। বিহিত কর্ম্মও নিষ্কামভাবে করিতে হইবে। পরে চিত্তশুদ্ধি জন্য আত্মসংস্থ যোগে রাগ দ্বেষ ক্ষয় করিতে হইবে। এতদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে ইহাকে সর্ব্বদা আত্মাতে একাগ্র করিতে হইবে এই নিমিত্ত উপাসনা। সর্ব্বশেষে জ্ঞানবিচারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব উপস্থিত হইলেই নিত্যানন্দ লাভ হইল।

৭। কর্ম্ম ও উপাসনার বিষয় বাসনা ক্ষীণ করিয়া ভগবৎ কৃপার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু বিচার দ্বারা চিত্তকে ভগবানে মিশাইতে হইবে। কৃপা ভিক্ষা ভগবানকে চিত্তে আনিবার জন্য আর বিচার চিত্তকে ব্রহ্মে লইয়া যাইবার জন্য। ব্রহ্ম সর্ব্বদা শান্ত চলন রহিত আনন্দ সমুদ্র। তিনি ঈশ্বরভাবে জীবের কাতর চিত্তে আগমন করেন কিন্তু বিচার দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে মিশাইতে পারিলেই চিত্তক্ষয় হইল এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইল।

৮। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেই সকলকে আরম্ভ করিতে হইবে। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই একবারে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতে সমর্থ। ইঁহারা জ্ঞানজন্মা, সাধারণের ইহাতে অধিকার নাই।

৯। নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষ্য কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল ঈশ্বর-প্রীতি জন্য বিহিত কর্ম্ম করা। নববধূ শ্বশুরালয়ে আগমন করিলে স্বামী যদি বলিয়া দেন তুমি যদি আমাকে চাও তবে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি আমার প্রিয়া হইবার জন্য সম্পাদন করিও। ইহাতে সুখ দুঃখ মান অপমানে বিচলিত না হইয়া বিহিত অনুষ্ঠানগুলি নিয়মপূর্ব্বক যথা সময়ে সম্পাদন করিও। অন্যে প্রহার করিলেও তোমায় কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। এতদ্বারা স্বামী ধৈর্য্যশিক্ষা দিতেছেন। বিনা ধৈর্য্যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না। বিনা ধৈর্য্যে প্রেম নাই, বিনা প্রেমে স্বামীসঙ্গ ব্যভিচার মাত্র।

১০। বিহিত কর্ম্ম সংহিতা সমূহে লিপিবদ্ধ। অন্যস্থানে ইহা প্রদর্শন করা যাইবে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

মুদ্রা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি একটি পদার্থের কতকগুলি বর্ণিত গুণ না থাকিলে তাহার দ্বারা দ্রব্য বিনিময় কার্য্য সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ সকল গুণ একাধারে কোনও বস্তুতে পরিলক্ষিত হয় না। স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামান্য মূল্যের আবশ্যক দ্রব্যের বিনিময়, স্বর্ণ দ্বারা সাধিত হইতে পারা কতদূর সম্ভবপর তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। দেশে কনক ব্যতীত সুলভ ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার অস্তিত্ব না থাকিলে আধুনিক অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের একটি মুদ্রা এত ক্ষুদ্রকায় হইত যে প্রত্যেকবার এক একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহার দর্শনলাভ ঘটিত না। স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলেও অধিক মূল্যবান পদার্থাদির ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা জন্মিত; সুতরাং সকল দিক বজায় রাখিবার জন্যই দুই বা বহু ধাতুর মুদ্রা আজকাল প্রায় সকল সভ্য প্রদেশেই প্রচলিত হইয়া থাকে। গিনি সুবর্ণ নির্ম্মিত, টাকা রৌপ্য গঠিত এবং পয়সা তাম্রের। ইহাদিগের পরস্পরের মূল্যের সম্বন্ধাদি কৌশলে স্থিরীকৃত করিতে হয় এবং এসকল কৌশলও অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

কোনও কোনও প্রদেশে দুই তিন প্রকারের মুদ্রার ব্যবহার আছে কিন্তু তাহাদিগের পরস্পরের মূল্যাদির সম্বন্ধ নির্ণীত নাই। যে সকল প্রদেশে অপর রাষ্ট্রের মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশেই বিশেষতঃ এই পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। তুরুস্কের এবং দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রের এই প্রথা। * স্বাভাবিক হইলেও এই প্রথা দূষণীয়। মনে করুন যখন একটি সুবর্ণ লীরার † মূল্য একশত রৌপ্য পায়াস্ত্রী তখন একজন তুর্কী অপরের নিকট হইতে একটি

---

* Prof, Bastable in En. Britt.

† লীরা তুরস্কের মুদ্রা। এক্ষণে একশত রৌপ্য পায়াস্ত্রী=একস্বর্ণ লীরা বা মেদ্‌জিদি =১৮ সিলিং।

সুবর্ণ লীরা কর্জ্জ লইল। অবশ্য সে সেইটি ভাঙ্গাইয়া খুচরা দ্রব্যাদি ক্রয় করিল। তাহাতে সে একশত পায়স্ত্রীর মূল্যের দ্রব্যাদি পাইল মাত্র। তাহার তিন মাস পরে একটি লীরার মূল্য হইল একশত তিন পায়স্ত্রী। এখনও অধমর্ণ কিন্তু তাহার বেতন পাইল রৌপ্য মুদ্রাতে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার তিন পায়স্ত্রী বাটা লাগিল। ইহার জন্য অপরাধী কে? সুলতান সাহেব,—কি দীন প্রজা?

অতএব যুগ্মধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার* প্রচলন থাকিলে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আইন দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া রাষ্ট্র পরিচালকদিগের কর্ত্তব্য। একার্য্য কিন্তু সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত হিসাব করিয়া না করিলে অসৎ লোকের অসাধুতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। মনে করুন ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনজারি করিলেন—আজ হইতে এক তোলা বিশুদ্ধ রৌপ্য দ্বারা আমরা এক একটি টাকা মুদ্রিত করিব। এইরূপ পঞ্চদশটি টাকার পরিবর্ত্তে ১২৩·২৭৪৪৭ গ্রেণ ওজনের ইংরাজী স্বর্ণের একটি সভারেণ্ পাওয়া যাইবে। গৃহীতাকে আইনমত স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয় মুদ্রাই লইতে হইবে। যে কোন ধাতু দ্বারাই হউক, দেয় মুদ্রা প্রদত্ত হইলে, পাওনাদারের সকল দাবীই মিটিয়া যাইবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন এই আইন লিপিবদ্ধ করিলেন তখন বাস্তবিকই হয়ত পনর তোলা রৌপ্য এক সুবর্ণ পাউণ্ডের সহিত সমান মূল্যবান। তাহার এক বৎসর পরে, নানা কারণবশতঃ রজতের মূল্য হ্রাস হইল। এখন এক সভারেণের পরিবর্ত্তে আসল রূপা ১৬ তোলা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি বশতঃ এক সভারেণের ওজনের অমুদ্রিত স্বর্ণ ধাতুর মূল্য হইল ১৬ টাকা, সুতরাং একটি সভারেণকে গলাইয়া ধাতুরূপে বিক্রয় করিলে তাহার পরিবর্ত্তে ষোড়শটী মোহরাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যাইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের আইনমত একটি মোহরযুক্ত সভারেণ কিন্তু ১৫ টাকার অধিক মূল্যে গৃহীত হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় কোন্ নির্ব্বোধ তাহার দেয় অর্থ স্বর্ণে প্রদান করিবে? সকলেই রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার দ্বারা প্রতি পাউণ্ডে এক টাকা করিয়া লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুবর্ণ মুদ্রার কার্য্য বন্ধ হইয়া

* এই প্রণালীকে ইংরাজিতে Bimetallism বলে।

যাইবে সকলেই লাভ প্রয়াসে সভারেণ গলাইতে আরম্ভ করিবে এবং অচিরেই দেশ হইতে স্বর্ণ মুদ্রার অস্তিত্ব লোপ হইবে। অবশ্য যদ্যপি দুইটি ধাতুরই মূল্য সমভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কোনও অসুবিধার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কেবল একটি ধাতুর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে উপরি লিখিত বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিবে।

সকল দিক না দেখিয়া, এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত করিলে চতুর প্রজার কার্য্য-গতিকে শেষে কেবল যোগ্যতম মুদ্রাটি রহিয়া যায়। অর্থনীতিজ্ঞ গ্রেসহাম্ সাহেব বহু পূর্ব্বে এই নীতি প্রাঞ্জলভাবে সূত্রাকারে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি বলেন—Bad money drives out good money. মানব কিরূপে অদক্ষ আইনকর্ত্তার ভ্রম হইতে স্বার্থ লাভ করে তাহা Gresham's Law নামক নীতি হইতে বেশ বুঝা যায়। *

এই সকল কারণে প্রতীয়মান হইতেছে, যদ্যপি যুগ্মধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন নিয়ম সিদ্ধ হয় এবং আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয়ে উভয় ধাতুই সমভাবে গৃহীত হইবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা প্রচলন জনিত ইষ্ট, অনিষ্টোৎ-পাদক হয় মাত্র। সুতরাং যুগ্মধাতুর মধ্যে একটি মুদ্রা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য। অপরটি সামান্য মূল্যাদি প্রদান জন্য প্রচলিত হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডে ও অধুনা অস্মদ্দেশে প্রধান মুদ্রা স্বর্ণ নির্ম্মিত, ফ্রান্স প্রভৃতি কতি-পয় দেশে রৌপ্য নির্ম্মিত। ইংলণ্ডে মুদ্রা প্রণালী বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ কোনও ব্যক্তি অপরকে চল্লিশ শিলিংএর অধিক রৌপ্য প্রদান করিলে সে তাহা লইতে বাধ্য নহে †। সুতরাং স্বর্ণই প্রধানতঃ মুদ্রার কার্য্য করে। দুই পাউণ্ডের উপর পাওনা হইলেই তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় প্রদান করিতে হইবে, তাহা না হইলে আদালত দান গ্রাহ্য করিবে না। ভারতবর্ষে রৌপ্য টাকা বা স্বর্ণ গিনি যে পরিমাণে প্রদত্ত হউক, গৃহীতাকে

---

* প্রঃ ব্যাষ্টেবেল বলেন, প্রাচীন গ্রীসের আরিষ্টফেনী এই নীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইতিহাসলেখক গ্রোট কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। (Grote's History of Greece Vol. III).

† ইহাকে ইংরাজীতে Legal tender বলে।

তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু এক টাকার অধিক মূল্যের পয়সা গ্রহণ করিতে কেহ বাধ্য নহেন।

যুগ্মধাতুমুদ্রা জনিত সমস্যার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অপর একটি উপায় প্রচলিত আছে। প্রধান মুদ্রাটির মূল্য তৎপরিমাণ ধাতুর মূল্যের প্রায় অনুরূপ, অপরাপর মুদ্রাগুলির মূল্য যথার্থ পক্ষে তৎপরিমাণ ধাতুর মূল্যের অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অধিক, সেইজন্য ইহাদিগকে ইংরাজিতে token money বা সঙ্কেতমুদ্রা বলা যায়। আমাদিগের টাকায় বার ভাগের ১১ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য আছে, সুতরাং রৌপ্যের বা স্বর্ণের মূল্য পরিবর্ত্তিত হইলে কেহ মুদ্রা গালাইয়া তাহা ধাতুরূপে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারিবে না। রৌপ্যের মূল্য যতই কেন পরিবর্ত্তিত হউক না একটি টাকা গালাইয়া কেহ এক টাকা মূল্যের রৌপ্যধাতু পাইবে না। ভারতীয় সুবর্ণ মুদ্রার মূল্য স্থির রাখিবার জন্য টাকশালার নিট্ লভ্য হইতে গোল্ড রিজার্ভ ফণ্ড Gold Reserve Fund নামক একটি ফণ্ড আছে।* তাহার উদ্দেশ্য অত্যধিক অভাববশতঃ সুবর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের পার্থক্য ঘটিলে সকল বিষয় সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া।

তাহার পর ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের ক্রয় শক্তির সহিত তাহাদিগের পরিমাণের ধাতুর মূল্যের বিশেষ কোনও সংশ্রব নাই। এক পয়সায় যে পরিমাণ তাম্র পাওয়া যায়, তাহাতে একের অধিক পয়সা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহারা কেবল সঙ্কেত মাত্র। ৬৪টি পয়সা দান অর্থে এক টাকার মূল্যের বস্তু বুঝায়।+

যুগ্মধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার সম্বন্ধ স্থিরীকরণ সমস্যা প্রাচীন জাতিদিগেরও

* Gold Reserve Fund এর অর্থ দ্বারা বিলাতী stock ক্রয় করা হয়। যদ্যপি ভারতীয় আমদানী রপ্তানির পার্থক্য বশতঃ ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পরিবর্ত্তিত হয় এই অর্থ দ্বারা তাহা পুনরায় স্থির করিয়া ফেলা যাইতে পারে। যাহার গৃহে অর্থ আছে সে ক্ষণস্থায়ী কারণ বশতঃ মূল্যবৃদ্ধির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। সুতরাং Governmentকে অধিক মূল্যে মুদ্রা বা ভারতীয় হুণ্ডি ক্রয় করিতে হয় না।

+ আধুলি সিকি প্রভৃতি যে রৌপ্য মুদ্রা দেখা যায় তাহারা টাকার ক্রমিক অংশানুক্রমে নির্ম্মিত মাত্র।

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। চীনদিগের লৌহ এবং তাম্র মুদ্রা ছিল। শেষে কিন্তু উপরোক্ত সমস্যা ভঞ্জনের জন্য তাহাদিগকে লৌহ মুদ্রা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গ্রীকদিগের মধ্যে রজতই প্রধানতঃ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু শেষে তাহারা ব্যবসার জন্য স্বর্ণ, এবং সঙ্কেত মুদ্রার জন্য তাম্র ব্যবহার করিত। রোমে রৌপ্যের পূর্ব্বে তাম্রের প্রচলন ছিল; রৌপ্য ব্যবহারে কিন্তু অবশেষে তাম্র মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের সময় হইতে স্বর্ণের থান বিদেশীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। ইউরোপেও প্রথমে রৌপ্যমুদ্রা, শেষে রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন সময়ে সময়ে রাজ আজ্ঞা দ্বারা ইহাদিগের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত।* স্যার আইজক নিউটন্, লক, পেট্টী হ্যারিস এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক ম্যাককলক্,টুক্ জন ষ্টুয়ার্ট মিল্,হেনেরি ফসেট † প্রভৃতি সকলেই আধুনিক বিলাতী প্রথার পক্ষপাতী। এ প্রথা সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

একধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা ও দ্বিধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার উপযোগিতা লইয়া যে সকল গ্রন্থাদি ও গবেষণাদি হইয়াছে তাহার পরিচয় দিবার সময় স্থান বা যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে যাঁহাদের ইংরাজি মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠে অবসর নাই তাঁহাদের জন্যই এই সামান্য প্রবন্ধের সৃষ্টি।

কোনও বিশেষ রাষ্ট্রে কি পরিমাণে মুদ্রা প্রচলিত করিলে তত্রত্য অধিবাসী-দিগের সুবিধা ও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে—একথা দুরূহ ও সমস্যা পূর্ণ হই-লেও রাজপুরুষদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে এ প্রশ্নের মীমাংসার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়। দুই চারিজন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অর্থনীতিজ্ঞেরা এবিষয় সিদ্ধান্ত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন ‡ বলিয়া-ছিলেন—

* এই বিষয়ক পরিবর্ত্তনের সম্যক ইতিহাস জন্য Jame's Essay on Money দ্রষ্টব্য।

† Sir Isaac Newton, Locke, Petty, Hariss, Mc. Cullock, Tooke, J. S. Mill, Fawcett.

‡ Sir William Petty.

একটী দেশের জমী হইতে যত আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক, বাটীর ভাড়ার এক চতুর্থাংশ, এবং সমগ্র দেয় পারিশ্রমিকের একের দ্বিপঞ্চাশতাংশের পরিমাণের মুদ্রা রাখিলেই রাষ্ট্রের কার্য্য চলিয়া যাইবে। অপর এক জনের* মতে দেশে যত পারিশ্রমিক বেতন বিতরিত হইবে, তাহার এক পঞ্চাশত অংশ ভূম্যধিকারীর আয়ের এক চতুর্থাংশ এবং বণিকদিগের বাৎসরিক আয়ের এক বিংশাত্যাংশ যত হইবে, সেই মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেই কোন গোলযোগ থাকিবে না।

অল্প চিন্তাদ্বারাই এই সকল মতের অসারবত্বা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ রাষ্ট্র মধ্যে বিভিন্ন আয়-ব্যয়ের সমষ্টির তালিকা সংগ্রহ করা তদানীন্তন সময়ে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। আজকাল এবিষয় অপেক্ষাকৃত সহজজ্ঞেয় হইলেও রাজপুরুষেরা এরূপ ভাবে মুদ্রার সংখ্যা স্থিরীকৃত করেন না।

এবিষয় স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রধানতঃ মুদ্রার দ্বারা কি কার্য্য সম্পাদিত করিতে হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেশের লোক সংখ্যার সহিত মুদ্রার পরিমাণের বিশেষ একটা সংস্রব আছে। রাজ্যে অধিক লোক থাকিলে অধিক মুদ্রার আবশ্যক হয়। দ্বিতীয়তঃ আদান প্রদান, ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্যাদির আধিক্য হইলেই অধিক সংখ্যক মুদ্রার আবশ্যক হইবে এবং তাহাদিগের হ্রাস হইলে মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদ্যপি ক্রয় বিক্রয়াদি নগদ না হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্য ধারে চলে তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ মত মুদ্রারও পরিমাণের হ্রাস করা যাইতে পারে।

তাহার পর, দেশের প্রজাবৃন্দ কিরূপ ভাবে মুদ্রার সহায়তা গ্রহণ করে তাহাও বিবেচ্য। আমাদিগের দেশে অনেক স্থলে ভূম্যধিকারীর কর, মজুরের মাহিনা প্রভৃতি শস্যাদিতে প্রদত্ত হয়; অবশ্য তাহা হইলে সেই মূল্যের মুদ্রার কোনও প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেক বিভিন্ন দেশীয় প্রথা, দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াতের আধিক্য বা অভাব প্রভৃতি এতৎকল্পে বিচার্য্য।

* Locke.

ইহা ব্যতীত "দেশের অধিবাসীদিগের ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা, তাহাদিগের দেশ-ভ্রমণ-রীতি এবং বাণিজ্য ও তেজারতী পেশার উপর মুদ্রার বাহুল্য ও স্বল্পতা নির্ভর করে" * ।

ভারতবর্ষের মত স্থানে অপর একটি বিষয়ও এতদ্বিষয়ক বিচারের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়। যে প্রদেশের প্রজাবৃন্দ, স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা লৌহ কোষে আবদ্ধ করিয়া রাখে বা তাহাদিগকে গলাইয়া ললনাদিগের অঙ্গ ভূষণ নির্ম্মাণ করে, তথায় অধিক সংখ্যক মুদ্রা নির্ম্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়! যে মুদ্রা হস্তান্তরিত হয়, যাহা দেশমধ্যে সঞ্চালিত হয়, যাহা কেবল দ্রব্য-বিনিময়ের সহায়তা করে, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রা বলা যায়। যে মুদ্রা যক্ষ-রক্ষিত, যাহা ধনবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা না করিয়া কেবল, ভাণ্ডার মধ্যে অথবা মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত থাকে তাহা কেবল ধাতু মাত্র।

কাগজ বা নোট মুদ্রার কথা বারান্তরে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

বিশ্বাস।

একদিন পড়ে মনে তোমায় আমায় সখা,
জীবনের সুপ্রভাতে মিলেছিল সেই দেখা।
সেই দিন হ'তে আজো ভুলিতে নারিনু মুখ,
জানিনাক মনে হ'লে পাই কি অতুল সুখ।
না জানি যে তব মুখে কি অমিয় ছিল মাখা,
দেখিতে তাহাই শুধু ভাল বাসিতাম সখা।
না জানি চাহে যে কেন এখন (ও) আমার প্রাণ,
কহিতে তোমারি কথা গাহিতে তোমারি গান।

---

* *Money* by F. A. Walker.

ওরূপ এখন (৩) কেন প্রাণেতে অঙ্কিত করি,
পুজিতে বাসনা হয় সর্ব্বদা মানস ভরি।
জানি না তোমার প্রেমে সুধা কি গরল আছে,
আমি ত থাকিতে চাই সদা তব কাছে কাছে।
ন্যায় কি অন্যায় তব জানিতে তা নাহি চাই,
বিশ্বাসে বেঁধেছি হিয়া তুমি ছাড়া আমি নই।
তোমাকে পাইব ব'লে রাখিয়াছি দৃঢ় আশা,
বিশ্বাসে আশ্বাস করে মিটাই মনের তৃষা।
তোমারি কারণে যবে উচাটিত এই মন,
তোমারি লাগিয়া যবে প্রেম রহে অনুক্ষণ—
তোমারি সে মুখ চেয়ে আছি হেথা একাকিনী,
একদিন পাব জানি অবশ্য হৃদয় খানি।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

অমরসিংহ ও অমরকোশ।

(শেষাংশ)

এই দ্বিসহস্র বৎসরে অমরকোশের কিরূপ সমাদর হইয়াছে তাহা অমরকোশেব টীকা সমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই জানা যাইতে পারে। বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রী হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতীয় বিবিধ প্রদেশবাসী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক-প্রাকৃতভাষাসমূহে পাঠার্থিগণের সুবিধার নিমিত্ত অমরকোশের যে সমুদয় টীকা লিখিয়াছেন সে সকলের অবধারণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তাহা না হইলেও কতিপয় টীকার পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

সংস্কৃত টীকা সমূহ মধ্যে (১) রায়মুকুটচূড়ামণিকৃত পদচন্দ্রিকা, * (২)

* রায়মুকুট পদচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন,—"ইয়ং ষোড়শটীকার্থসারমাদায় নির্ম্মিতা।"—এই ১৬ খানি টীকার নাম যথা,—(১) ভট্টক্ষীরস্বামিকৃত অমরকোশোদ্ঘাটনাত্মক নামপারায়ণ; (২) সুভূতি; (৩) হড্ডচন্দ্র; (৪) কলিঙ্গ; (৫) কঙ্কট; (৬) সর্ব্বধর;

ভানুজিদীক্ষিতকৃত ব্যাখ্যাসুধা, (৩) অচ্যুত উপাধ্যায়কৃত ব্যাখ্যাপ্রদীপ, (৪) নয়নানন্দশর্ম্মকৃত কৌমুদী, এবং (৫) রঘুনাথচক্রবর্ত্তীকৃত ত্রিকাণ্ড-চিন্তামণি, পাণিনিব্যাকরণের মতানুযায়ী। (৬) মথুরেশবিদ্যালঙ্কারকৃত সারসুন্দরী নাম্নী টীকায় পদ্মনাভদত্তকৃত সুপদ্মব্যাকরণের মত অনুসৃত হইয়াছে। (৭) ভরতমল্লিককৃত মুগ্ধবোধিনী, বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধব্যাকরণের মতানুসারে লিখিত। (৮) নারায়ণচক্রবর্ত্তিকৃত পদার্থকৌমুদী, (৯) রামনাথ-বিদ্যাবাচস্পতিকৃত ত্রিকাণ্ডবিবেক, (১০) নীলকণ্ঠশর্ম্মবিরচিত সুবোধিনী, (১১) শ্রীরামতর্কবাগীশকৃত অমরটীকা, (১২) রামপ্রসাদতর্কালঙ্কারকৃত বৈষম্য-কৌমুদী, এবং (১৩) লোকনাথশর্ম্মবিরচিত পদমঞ্জরীতে শর্ব্ববর্ম্মকৃত কলাপ-ব্যাকরণের মত গৃহীত হইয়াছে। এরূপ কোন না কোন ব্যাকরণের প্রণালী অনুসারে (১৪) নারায়ণবেদান্তবাগীশকৃত অমরপঞ্জিকা, (১৫) নারায়ণবিদ্যা-বিনোদাচার্য্যকৃত শব্দার্থসন্দীপিকা, (১৬) রামেশ্বরশর্ম্মকৃত প্রদীপমঞ্জরী, (১৭) মহাদেবকৃত বুধমনোহরা বা বিধানমনোহরা, (১৮) মহেশ্বরকৃত অমরবিবেক, (১৯) লিঙ্গসূরিকৃত পদবিবৃতি, (২০) রামশর্ম্মকৃত পদমঞ্জরী, এবং (২১) রামনাথকৃত ত্রিকাণ্ডরহস্য লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস, ত্রিলোচনদাস, সুন্দরানন্দ, বনদেবভট্ট, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ, গোবিন্দানন্দ, রামানন্দ, গোপাল-চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকেই অমরকোশের টীকা রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত কত টীকা লোপ পাইয়াছে ও পরে কত টীকা রচিত হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যাইতে পারে না। অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থের টীকা করিতে যাইয়াও মল্লিনাথ, নারায়ণ, ভরতমল্লিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ পুনঃপুনঃই "ইত্যমরঃ" বলিয়া অমরের দোহাই দিয়াছেন। জৈন পুরুষোত্তমদেব অমরকোশেরই পরিশিষ্টরূপে ত্রিকাণ্ড-

(৭) সর্ব্বানন্দকৃত টীকাসর্ব্বস্ব; (৮) অভিনন্দ; (৯) রাজদেব; (১০) দ্রাবিড়; (১১) মাধবী; (১২) মধুমাধবী; (১৩) গোবর্দ্ধন; (১৪) ভোজরাজ; (১৫) ব্যাখ্যামৃতটীকা-সর্ব্বস্ব; এবং (১৬) হরদত্ত। ক্ষীরস্বামিই যে অমরকোশের টীকা সর্ব্বাগ্রে রচনা করেন তদ্বিষয় তিনি "উদঘাট্যতে যঃপন্থাঃ গৃহীত্বা নামরত্নানি" নামপারায়ণোক্তএই বাক্যদ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ ও দ্রাবিড় অমরকোশের টীকা-কার নহেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের কোশ কৃত হইতে রায়মুকুট সাহায্য লইয়াছেন এরূপ অনুমান বলিয়া হয়।

শেষ রচনা করেন। অমরকোশের অপর একটি নাম ত্রিকাণ্ড; সেই ত্রিকাণ্ডের শেষাংশ বলিয়াই পুরুষোত্তম স্বকীয় কোশের নাম ত্রিকাণ্ডশেষ রাখিয়াছেন। এতাদৃশ সমাদর অতি অ[illegible]্যক গ্রন্থকারের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

অমরকোশের শ্রীকণ্ঠ টীকা দৃষ্টে বোধ হয় যে অমরসিংহ ও দুর্গসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত টীকায় কথিত হইয়াছে,—

"দুর্গসিংহ প্রচারান্তে নামলিঙ্গানুশাসনম্।
লভ্যতেঽমরোপাধিং রাজেন্দ্র বিক্রমেণ চ।
বিদ্যাকীর্ত্তিপ্রভাবে চাঽমরত্বং লভতে নরঃ।
স রত্নো নবরত্নস্য তদ্‌গুণেন সুশোভিতঃ॥"

অর্থাৎ,—নামলিঙ্গানুশাসন নামক কোশ প্রচারের পরে দুর্গসিংহ রাজেন্দ্র বিক্রম হইতে অমর উপাধি প্রাপ্ত হন; বাস্তবিক বিদ্যাকীর্ত্তিপ্রভাবেই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে; তিনি নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব গুণে সুশোভিত ছিলেন।

একাধিক ব্যক্তি দুর্গসিংহ নামে পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু কাতন্ত্রবৃত্তি-কার দুর্গসিংহ ও নামলিঙ্গানুশাসনকার অমরসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা দেখা উচিত। কারণ, কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ সংস্কৃতপাঠার্থিমাত্রেরই পরিচিত।

অমরসিংহের ন্যায় দুর্গসিংহও কাতন্ত্রবৃত্তির মঙ্গলাচরণের শ্লোকে দেবতা-বিশেষের নির্দ্দেশ না করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়াছেন। * কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষা করেন নাই। কাতন্ত্রবৃত্তির টীকায় দুর্গসিংহ যে নমস্কার করিয়াছেন তাহাতে বুদ্ধশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।† অমরসিংহ অমরকোশের কোনস্থলেই গর্ব্ব করেন নাই, দুর্গসিংহ তাহা করিয়াছেন। "আমার ও

---

* "দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকং॥"

† "শিবমেকজং বুদ্ধার্হ্যাগ্রং তং স্বয়ম্ভুবং।
কাতন্ত্রবৃত্তিটীকেয়ং নত্বা দুর্গেন রচ্যতে॥"

ভাষ্যকার পতঞ্জলির বুদ্ধি কুশাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম” * এরূপ উক্তি করিয়া দুর্গসিংহ কেবল স্বকীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব প্রতিপাদনে যত্ন পান নাই, কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলির বুদ্ধি ও নিজের বুদ্ধি যে তুল্যরূপ তীক্ষ্ণ ছিল তৎপ্রদর্শনেও চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সহিত মূর্ত্তনরের পাণ্ডিত্যের বা জ্ঞানের তুলনা করিতে গেলে ধৃষ্টতাই প্রকাশ পায়। ইহা শিষ্টসম্মত নহে। অমরসিংহ এরূপ ধৃষ্টতা অমরকোশের কোথাও প্রকাশ করেন নাই। দুর্গসিংহের এতাদৃশ ধৃষ্টতা সত্ত্বেও তৎকৃত কাতন্ত্রবৃত্তি ও টীকা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাণিনীয় সূত্র-জ্ঞান বিষয়ে পাঠার্থিগণের বররুচিকৃত বার্ত্তিক এবং পতঞ্জলিকৃত ভাষ্য অত্যাবশ্যক; শর্ব্ববর্ম্মকৃত কলাপসূত্রজ্ঞান বিষয়ে দুর্গবৃত্তি এবং টীকাও অত্যাবশ্যক। ব্যাকরণ-জ্ঞানবিষয়ে পাণিনির সহিত যেরূপ কলাপের তুলনা হইতে পারে না, সেইরূপ মহাভাষ্যের সহিত দুর্গবৃত্তিরও কোন তুলনা হইতে পারে না। তুলনা না হউক, বৈয়াকরণদিগের মধ্যে দুর্গসিংহের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠটীকাকার দুর্গসিংহ ও অমরসিংহের অভিন্নত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তৎপরে অমরকোশের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্গবৃত্তির কোন কথা বলেন নাই। ইহাতে এই বোধ হয় যে, অমরসিংহের পূর্ব্বনাম দুর্গসিংহ ছিল, কিন্তু কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। অমরসিংহ বিনয়ী, কিন্তু দুর্গসিংহ গর্ব্বিত। এই উভয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু উভয়ের রীতি এক নহে। নামের সাদৃশ্য দেখিয়া ব্যক্তির অভিন্নতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে ষড়্বিংশতি কোশের নাম বলা হইয়াছে তন্মধ্যে ১৩শ সঙ্খ্যক দুর্গকোশ এবং তৎপরেই ১৪শ সঙ্খ্যক অভিধানমালার উল্লেখ আছে। এই দুর্গকৃত কোশের নাম নামমালা। আর এক দুর্গসিংহ নানার্থকোশ লিখিয়াছেন। † ইহাঁরা কেহই অমরসিংহ নহেন। বিক্রমাদিত্য তদ্‌সভাসদ দুর্গসিংহকে নামলিঙ্গানুশাসন নামক কোশ প্রণয়ন দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন দেখিয়া অমরোপাধি দান করেন, এবং তদবধি দুর্গসিংহ

---

* “অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রৈকধীয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধে পারম্ কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥”

† “অজয়রুদ্রাগঙ্গাধরধরণিরভসকোষানালোক্য সংক্ষেপাৎ
নানার্থধ্বনিমঞ্জরীয়মভিহিতা শ্রীমদ্দুর্গসিংহেন।”

অমরসিংহ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, শ্রীকণ্ঠটীকাকারের মত গ্রহণ করিলেও আমরা এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারি, ইহার অধিক পারি না।

অমরসিংহ উজ্জয়িনীর রাজা হর্ষবিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত নয় জনের অন্যতম ছিলেন। যথা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণে,—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

(১) ধন্বন্তরি, (২) ক্ষপণক, (৩) অমরসিংহ, (৪) শঙ্কু, (৫) বেতালভট্ট, (৬) ঘটকর্পর, (৭) কালিদাস, (৮) বরাহমিহির, এবং (৯) বররুচি, এই নয় জন পণ্ডিতরত্ন দ্বারা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা গঠিত হয়। স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যা চাধিকেষু হি।
ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্য রাজঃ সোঽথ প্রণশ্যতে॥"

অর্থাৎ,—কলিযুগের ৩,০২২ বৎসর অতীত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন, কিন্তু তিনিও বিনষ্ট হইবেন। এক্ষণে ৫,০০৫ কলিগতাব্দ চলিতেছে। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের ১,৯৮৩ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কবি কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণের এক স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—বিক্রম ৯৫ জন শককে নৃপতি-সংহার করিয়া কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন।······আমি (কালিদাস) ৩,০৬৮ কলিগতাব্দে বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সম্পূর্ণ করিলাম।" এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজ্যলাভের ৪৫ বৎসর পরে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা করেন। ৯৫ জন শক নৃপতিকে বধ করিয়া বিক্রমাদিত্য যে অব্দ স্থাপন করেন তাহা সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা গৌণ চান্দ্রমাসে * গণিত হইলেও প্রত্যেক চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদে ইহার বৎসর পরিবর্ত্তিত হয়, এবং ১২ চন্দ্রোদয়ে (মলমাস † হইলে

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য-বিরচিত তিথিতত্ত্বের টীকায় কাশিরামবাচস্পতি লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণপ্রতিপদাদিপৌর্ণমাস্যন্তং গৌণচান্দ্রং", কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে গৌণচান্দ্রমাস, এবং "শুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তং মুখ্যচান্দ্রং", শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে মুখ্যচান্দ্র মাস ধরা যায়।

† অমাবস্যাদ্বয়যুক্ত রবিসংক্রান্তিরহিত মাসেরনাম মলমাস।

১৩ চান্দ্রোদয়ে) বৎসর পূর্ণ হয়। এক্ষণে ১৯৬১ সংবৎ চলিতেছে। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ১২শ চান্দ্রমাসে বা ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডে এক চান্দ্রবৎসর গণনা করেন, সুতরাং এই হিসাবে চান্দ্রবৎসর হইতে সাবন-বৎসর ১০ দিন ৯ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ১২ সেকেণ্ড অধিক। মলমাস প্রভৃতির হিসাব করিয়া সংবৎ শকাব্দায় বা কল্যব্দে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ১৯৬১ চান্দ্রবৎসর হইতে প্রতি বৎসরের ১০ দিনাদির অল্পতা ধরিয়া ৫৬ বৎসর বিয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে ৩১০০ কল্যব্দে, অথবা ৫৬ বৎসর বিয়োগ না করিলে ৩,০৪৪ কল্যব্দে, অথবা এতদুভয়ের কোন মধ্য সময়ে সংবৎ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইলে, বিক্রমাদিত্যের রাজ্যলাভের ৭৮ বৎসর বা ২২ বৎসর পরে বা এই অব্দদ্বয়ে কোন মধ্য সময়ে সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে যখন সংবতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না তখন ৩,০৬৮ কল্যব্দের পরে সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল ইহা বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে যে ৩০২২, ৩০৪৪, ৩০৬৮ ও ৩১০০ কল্যব্দ লব্ধ হইয়াছে তাহাতে ইহা বলা যাইতে পারে যে অনধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অথবা অন্ততঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে অমরকোশ রচিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্ষীরস্বামিকৃত নামপারায়ণ অমরকোশের সর্ব্বপ্রথম টীকা বলিয়া অনুমিত হয়। ভোজরাজ, বিশ্বকর, মহেশ্বর প্রভৃতির গ্রন্থে নামপারায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে নামপারায়ণ নামক অমরকোশোদ্ঘাটন রচিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দুর্গসিংহ নামক কোনও বৌদ্ধ পণ্ডিত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের তৃতীয় রত্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নামলিঙ্গানুশাসন নামক কোশ লিখিয়া অমরোপাধি প্রাপ্ত ও অমরসিংহনামে প্রসিদ্ধ হন। অমরকোশ পূর্ব্বরচিত কোশসমূহের অসম্পূর্ণতা ও অভাবাদি পরিহার পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় সমগ্র শব্দ ও বিষয় বর্গক্রমে সঙ্ক্ষিপ্তভাবে অতিশয় পাণ্ডিত্যের সহিত রচিত হওয়াতে ইহা এত উপাদেয় হইয়াছে যে তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ শিষ্যপরম্পরায় অন্য সকল অভিধান অপেক্ষা ইহার অধিক আদর করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, কোনও বৈদিক পণ্ডিত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অমরসিংহের এই কোশ রূপ কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্য এ পর্য্যন্ত সফল

হইয়াছে, এবং সংস্কৃত ভাষার আলোচনা যতদিন থাকিবে ততদিনই অমর-কোশের সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া কোনও বৈদিক তাঁহার প্রতি ভঙ্গিক্রমে পাপিষ্ঠারোপ করিলেও তজ্জন্য তাঁহার বিদ্যা-কীর্ত্তির কোন অংশে লাঘব হয় নাই বা উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত হওয়ার ব্যাঘাত হয় নাই। কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহ, কোষকার জৈন পুরুষোত্তম দেব, কোশকার হেমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতই বিদ্যাবত্তার জন্য বৈদিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন। এই দৃশ্যটি ভারতবর্ষেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ দাস।

রাঠোর বালক।

তৃতীয় সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিভৃত মন্দির মাঝে চন্দন জননী
একমনে পূজারতা। মনের বাসনা—
অবিদিত নহে তব দুর্গের ঈশ্বরি !
কেন দাসী নিদ্রা ত্যজি লয়েছে শরণ
অভয় চরণ তলে। রজনী প্রভাতে
পাপিষ্ঠ যবন দল বেষ্টিবে আসিয়া
তোমার আশ্রিত দুর্গ। অসুরনাশিনি !
দেবগণে উদ্ধারিলে কত দৈত্য রণে
করস্থিত খড়্গ তব রহিবে অচল
ভক্তমৃত্যু নিরখিয়া স্থির অবিচল।

বল দেবি ! কোন দোষে রাজপুত দল
রাজ্যহারা, দুর্গহারা, ভ্রমিছে কান্তারে

ধর্ম্মপথে চিরদিন কেন বা না জানি
নির্ম্মম অদৃষ্ট লিপি তাহাদের ভালে ?
কিবা পাপ গুরু হেন নাহিক মার্জ্জনা—
এত রক্ত, হৃদিরক্ত অবিশ্রান্ত দানে—
ভ্রাতা পুত্র পরিজন হারা একে একে—
মর্ম্মদাহ হৃদি অগ্নি কি বলে নিবারি
এখন বুঝিছে সবে স্বদেশের তরে
ইথেও হলনা দয়া পাষাণী তোমার ?

কুসুম প্রতিমা কায়া রাজার কুমারী—
ক্রোড়ে ক্রোড়ে কি আদরে আজন্ম পালিত
মাখম নবনী ভোগ্য, কোমল শয়ন—
রাজ্যহারা পিতাসনে গহ্বরে গহ্বরে,
তৃণের চাপেটী ভক্ষ্য—মৃত্তিকা শয়ন—
কখন বা অনশনে ক্ষুধায় কাতর—
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি আকুল চৌদিক
তরুলতা মর্ম্মাঘাতে হইল চঞ্চল
মাগো পাষাণনন্দিনি ! পাষাণ হৃদয়ে
প্রতিঘাত হ'ল নাকি সে করুণস্বর ?

ধর মাগো সেই মূর্ত্তি দেবের আশ্বাস
মাত রণে রণপ্রিয়া শিবের ঘরনি !
চৌষট্টি যোগিনীসহ তাণ্ডব সমরে
নাশিয়া যবনবৃন্দ, রণরঙ্গে মাতি
রাখ মা সন্তানগণে অভয়চরণে
তুমি না রাখিলে দেবি কে রাখিবে বল
তোমারই আমাদের কেবা আছে আর
দাসীর মিনতি রাখ কর মা আশীষ—

দেশবৈরী ধর্ম্মবৈরী নির্ম্মূল হইয়া
সুবিমল শান্তিছায়া উঠুক ভাতিয়া ।

অশ্রুধারা মুছি মাতা হইলা নীরব
মুদিয়া নয়নপদ্ম লাগিলা পূজিতে
দেশতরে পুত্রতরে কাতর হৃদয়—
অস্থি মজ্জা মেদে মেদে স্বদেশ সম্মান
রাজপুত নারী, ধন্যসৃষ্টির গরিমা
মনে পড়ে সেই দূর অতীত কাহিনী—
বেণী কাটি বিনাইলা ধনুকের গুণ
আর্য্যের রমণী এক। এলাইয়া বেণী
স্বামীগণে উৎসাহিলা আশ্রিরক্ষণে
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য, রহিবে কাহিনী।

নমিয়া দেবীর পদে বন্দিলা চন্দন
মাতার চরণপদ্ম, অতি ভক্তিভরে
তারে আদরে তুলিয়া আশীর্ব্বাদি মাতা
সস্নেহে আঘ্রাণি শির চুম্বিলা বদন
দেবীর চরণপুষ্প, অতি সমাদরে
স্থাপিলা পুত্রের শিরে। জগতের মাতা
রক্ষুন তোমারে বৎস আপদে বিপদে
চিরদিন ধর্ম্মপথে করি বিচরণ
উজ্জ্বল করহ কুল বীরত্বপ্রভায়
নিয়োজিয়া মনপ্রাণ স্বদেশ রক্ষায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমাচরণ ধর।

ক্ষমা।

(১)

কলিকাতা।
৫।৫।৯১

সুষমা

তোমার পত্র পাইয়াছি। পত্র পাঠে সুখীই হইয়াছি। যদিও চিঠির সুরটি করুণ ও বেদনাব্যঞ্জক তথাপি বিশেষ দুঃখিত বা ব্যথিত হইয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তোমার নিকট হইতে যাহা আসে তাহাই সুখের। গরল পাঠাইলেও তুমি পাঠাইয়াছ বলিয়া তাহা অমৃত বলিয়া বোধ হয়, কাজেই তোমার ভৎ'সনা গুলি বড়ই সুমিষ্ট লাগিল।

তুমি আমার চিঠি না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছ কিন্তু তোমার শোকের কোনও কারণ নাই। তোমায় ''ভুলিয়া গিয়া" চিঠি লিখিনাই একথা প্রলাপ মাত্র। বাস্তবিক এমন সময় নাই যখন তোমার উপস্থিত আমি অনুভব করি না। উত্তপ্ত নিদাঘের দ্বিপ্রহরের তপন তাপে আমার সেই চাঁদিনী রাত্রিটি মনে পড়ে —যে রাত্রে তোমাদের ছাদের উপর তোমার কোমল মুখ খানি তুলিয়া দেখিয়াছিলাম। বাস্তবিকই মিনার কথা সত্য—সুষমা তোমার সৌন্দর্য্য এজগতের নহে। আর তাহার উপর তোমার সরলতা—তাহা ত নৈসর্গিক—পবিত্র, নির্ম্মল, হৃদয় উন্মাদকারী।

তোমায় চিঠি লিখি বলিয়া ভুজেন ভায়া কিছু মনে করেনা ত? মনে করিবারই বা কি আছে? শ্যালীকে চিঠি লেখা হিন্দু সমাজে ত দূষণীয় নহে। সেত আমার স্ত্রীকে চিঠি লেখে। সে কিরণকে কাল তোমার চিঠির সঙ্গে কি বলিয়া চিঠি লিখিয়াছে জান? "আমার প্রাণের কিরণ"। কিরণ বলিতেছিল সুষমার স্বামীটি রসের সাগর। এত উত্তাপেও শুকাইয়া যায় নাই। খাল বিল হইলে টিকিত না।

তুমি আমায় আবার কবে চিঠি লিখিবে সুষমা? তোমার হাসিটি আমার বড় ভাল লাগে। চিঠির ভিতর কতকটা পাঠাইয়া দিতে পার?

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
অমর নাথ।

(২)

উত্তরপাড়া

১৩-৫-৯১

ভাই কিরণ দিদি

তুমি আমার স্বামীকে সুখ্যাতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছ কিন্তু আমি বুঝিতে পারিয়াছি তাহা পরিহাস। বাস্তবিক ভাই আমায় জ্বালাতন করিয়াছে। তোমার চিঠি পড়িয়া মহাখুসি। আমায় আদর করিয়া কি বলিল জান? বলিল—"সুষমা! তোমার কিরণ দিদি আমার সেই মুসলমান পোষাক পরিয়া ফটো তুলা দেখিয়াই আমি যে রসিক ছেলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। বাবা! আমি কি কম্ ছেলে?" আমিত হাসিয়া বাঁচিনা। পোড়া কপাল আর কি? সে ছবি দেখে তুমি ত তাকে বাঁদরের মত দেখিতে হইয়াছে বলিয়াছিলে।

অমর বাবু কেমন আছেন? আহা কেমন মিষ্ট কথা! তোমার উপর ভাই আমার হিংসা হয়। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মেজাজটি যেন শিবের মতন—হবেই ত, এম্ এ পাশ।

তুমি এবার আমায় দু'কথায় চিঠি সারিয়াছ কেন? তোমাদের বাড়ী আমায় কবে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবে? তোমার ননদের বিবাহে আমায় লইয়া যাইতে ভুলিও না। এখানে আমার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমার ভগ্নিপতি যে সুরসিক। কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়া মারে।

অপর চিঠি খানি অমর বাবুকে দিইতে ভুলিও না। হয়ত তুমি ব্যস্ত থাকিবে তাই অধিক লিখিলাম না।

অমর বাবুকে আমার ভালবাসা ও প্রণাম দিবে এবং তুমিও জানিবে। তিনি কেমন আছেন? তোমাদের কুশল দানে সুখী করিবে। ইতি

তোমার ভগ্নি

শ্রীমতী সুষমাবালা দেবী।

(৩)

সাহেবগঞ্জ।

৩-১-৯১

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী—

সাবিত্রীসমতুল্যাষু।

মেজদিদি

বড়ই দুঃখিত হইলাম। সুষমা যে মরিয়াছে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। খুড়ি-মার যেমন বুদ্ধি ঐ মেয়েকে আবার মেম রাখিয়া দিয়া পড়াইয়াছিলেন। তা মরিল মরিল অমর বাবুর কাছে মাথা খুঁড়িতেছে কেন? জামাইবাবু বুদ্ধিমান লোক ও রাক্ষসীকে চিনিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইবে না। আমাদের যত সমবয়স্কা আছে সকলের মধ্যে সুষমা রূপসী বটে। ওঃ তবে ত মাথা কিনি-য়াছে! আমার যেমন গ্রহ তাই অমর বাবুর সঙ্গে ওর ভাব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন কে জানিত ও এমন হবে।

তোমার শরীর খারাপ হইবার কারণ ত কিছু দেখি না। তুমি বুঝি সারা-দিন ভাব? ছি, স্বামীর উপর তোমার অবিশ্বাস! সুষমার চিঠি গুলা জোগাড় করিতে পার? তাহা হইলে পূজার সময় বাড়ী গিয়া একবার তাহার মুণ্ড-পাত করি।

এখানে ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার ছোট দেবরটির একটু অসুখ করিয়াছে। আশা করি শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

বাড়ীর খবর কি? মার মাথার ব্যারাম কেমন আছে। তুমি না হয় কিছুদিন হাটখোলায় গিয়া থাকিয়া আসিও। বড়দিদি নাকি শীঘ্র বাড়ী আসিবেন?

জামাই বাবু কি আমাদের ভুলিয়া গিয়াছেন? তাঁহাকে আমাদের চিঠি লিখিতে বলিবে। আমরা এক রকম সুস্থ শরীরে আছি। তুমি আর অধিক চিন্তা করিও না। অধিক আর কি লিখিব।

তোমার স্নেহের

মৃণালিনী।

(৪)

কলিকাতা

৮-৭-৯১

ভাই সুষমা,

পরশু দিন তোমাদের বাটিতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া উনি এখনও ফিরিলেন না কেন? কয়দিন ধরিয়া যে রূপ জলবৃষ্টি হইতেছে ভয় হয় পাছে কোনও বিপদ আপদ হয়—নৌকার রাস্তা।

এখানে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী রাগ করিতেছেন। তাঁহাকে পাঠাইয়া দিইও। ভাবিও না আমার ইহাতে কোনও স্বার্থ আছে। তাঁহার যাহাতে সুখ আমার তাহাতে বিষাদ আসিতে পারে না। তিনি তোমাদের ওখানে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, তোমার রসিক স্বামী ভুজেনের সহিত রঙ্গ রস করিতেছেন ভালইত। তবে শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কীয় লোকের বাটিতে থাকিলে আমাদের সমাজের প্রাচীনেরা কিরূপ রাগত হন জানইত।

তোমরা কেমন আছ? এখানকার সব মঙ্গল। আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার

কিরণ দিদি।

(৫)

কলিকাতা।

৭-১০-৯১

প্রিয়তম সুষমা—

তোমার চিঠি পড়িয়া হৃদয়ে শেল বিঁধিল। পূজার সময় মিনি তোমার সঙ্গে কোঁদল করিয়াছে? তাহার কি ক্ষমতা তোমায় কিছু বলে? আমার ইচ্ছা—আমি তোমায় ভাল বাসিব। তোমার পত্র পাইয়া কাল খুব ঝগড়া করিয়াছি। আমাদের প্রেমের কথা তাহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিয়াছি। তোমার গুণে এবং শিক্ষায় আমি যে মুগ্ধ, তুমি যে আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী, তোমার রূপের জ্যোতি যে ভুবনবিজয়ী, তোমার প্রেম যে অতি গভীর, আমাদের ভালবাসার স্রোত যে তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র লতা গুল্মের প্রতি-

রোধ উপেক্ষা করিতে সক্ষম, আমার চিত্তের গতিপরিবর্ত্তন প্রয়াস যে তাহার পক্ষে বাতুলতা তাহা তাহাকে সবিশেষ বুঝাইয়া দিয়াছি। সে শুনিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। বোধ হইল যেন কাঁদিতেছে। তাহার কি একটা উৎকট রোগ হইয়াছে—দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে। যাক্, সেকথা এখন যাক্।

সুষমা, তোমায় আবার কবে দেখিব? নির্ব্বোধ ভূজেনকে আর একবার পাঠাইয়া দাও না আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাক্। লেখাপড়া না শিখিলে মানুষ কেমন হয় দেখিলে? তাহার উপর তোমার দয়া হয় না?

আর অধিক লেখা বাহুল্য, সাক্ষাতে সব কথা বলিব। সুষমা এখন বিদায় হই।

অভিন্নহৃদয়
অমর।

(৬)

উত্তরপাড়া
১২-১০-৯১

প্রাণাধিক্ অমর

কেমন সাহস দেখিলে? তাহারই হস্তে তোমায় চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এরূপ বুদ্ধিমান স্বামী প্রত্যেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের হইলে আত্ম-ঘাতীর সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হইত। গালাটি দেখিয়া লইয়াছ ত? রাস্তায় যদি খুলিয়া পড়িত! ভয় কি? সে আমায় যমের মত ভয় করে। উড়াইয়া দিতাম। বলিতাম সে বড় রসিক কিনা তাই আমিও একটু রসিকতা করিয়াছিলাম।

আজ রাত্রে আসিতে ভুলিও না। নিমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া দিবার জন্যই আজ এই চিঠি লেখা। চাতকিনীর ন্যায় আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। আমার মাথা খাও, আসিও।

সেবিকা
সুষমা।

(৭)

কলিকাতা
২-১ ৯২

স্নেহের মিনা—

বড় শীত পড়িয়াছে। কবিরাজ মহাশয় বড়ই ভাবিত—বলিলেন যক্ষ্মার কারণ কি? বুড়া অনেক শ্লোক আওড়াইল। হা অদৃষ্ট! শাস্ত্রে কি আর সকল কথা থাকে? মনে মনে বলিলাম—এ ব্যারাম ওঝা না ডাকিলে যাইবেনা। বৈদ্যের বাড়ীতে সর্পাঘাত আবার কবে সারে?

আমি তোর বড় বোন্। তোর পায়ে পড়ি মিনা আর এ বিষয় গোলমাল করিস্ না। তোর চিঠি পাইয়াই ত আমার শ্বশুর ঠাকুর রোগ ধরিতে পারিলেন। প্রথমে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। আমার শাশুড়ির যত্নে আমার আরও কষ্ট হয়। তুমি পীড়ার সংবাদ দিলে বলিয়াই ত ব্রাহ্মণের মেয়ের এত কষ্ট। এখন সবাইকে ভাল দেখিয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া যাইতে পারিলে হয়। আজ তিন দিন অসুখ বড় বাড়িয়াছে। আর উঠিতে পারি না। বোধ হয় শান্তি নিকট।

তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে।

তোমার অভাগিনী দিদি
কিরণবালা।

(৮)

উত্তরপাড়া
২-৪-৯২

প্রাণের মিনা—

ভাই কিরণ দিদির মৃত্যুর কারণ যে আমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়াছি। এক বৎসর পূর্ব্বে বুঝিলে হয় ত ভাল হইত। কি করিব? অপরিমিত সবল বাসনার বন্যাস্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিলাম। পতঙ্গ যখন বহ্নির উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়া আকৃষ্ট হয় তখন সে বুঝিতে পারে না উহা কেবল দগ্ধই করিতে পারে, উহা কুসুম নহে, উহার প্রাণমনহারী পরিমল নাই। নরকের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—ঝম্প প্রদান করিয়া

দেখিলাম তাহাতে কেবল তীব্র অগ্নি—যে শান্তিবারি লোভে ইহকাল পরকাল জলাঞ্জলি দিলাম এখন দেখিতেছি তাহা হলাহল। শাস্তি যথেষ্ট হইতেছে এখনও কত বাকি আছে কে জানে?

মিনা ভাই, আমায় কি তুমি ক্ষমা করিবে না? কিরণ দিদির নাম স্মরণ করিলে আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। এ অনুতাপের হাত হইতে কিসে রক্ষা পাব জানিনা। লোক লজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু পাপীর মৃত্যুকে যে বড় ভয়!

সুদীর্ঘ জীবনের অবশিষ্টকাল পুড়িয়া মরি, নরকের ধূমে শ্বাসরোধ হইয়া যাক, হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উন্মত্ত যৌবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি'।

'দয়া করিয়া এক একখানি চিঠি লিখিস ভাই। তুইও যেন অভাগিনী পতিতাকে ঘৃণা করিস না।

হতভাগিনী

সুষমা।

(৯)

কলিকাতা

৩-৪-৯২

সুষমা,

কি হারাইয়াছি বুঝিতে পারিয়াছি। প্রেমের ভাগীরথী উপেক্ষা করিয়া শুষ্ক বাপীতে জলপান করিতে গিয়াছিলাম, বহুমূল্য রত্ন যৌবন গর্ব্বে পশু বুদ্ধিতে দূরে ফেলিয়া দিয়া কাচ সংসর্গে শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলাম, দেবীর পরিবর্ত্তে রাক্ষসীর আরাধনা করিয়া অশান্তি উপহার পাইলাম। না, তোমার কি দোষ, এ পাপের অনুষ্ঠাতা আমিই।

কে বলিল কিরণ মরিয়াছে? এই ত সারাক্ষণই তাহার পবিত্র স্বর্গীয় শ্রী তপূর্ণ মুখটি আমার অনুসরণ করিতেছে। অভাগিনী কিরণ আমার! আমায় এখনও ছাড়িতে পার নাই; বাসনা আমি আরও কত পাপ করিতে পারি দেখ। না কিরণ, আর ত তোমার হৃদে ক্ষয় রোগের সঞ্চার করিতে পারিব না; আরত মাথা খুঁড়িলেও তুমি আসিয়া আমার পাশবিক অত্যাচার নীরবে দেখিতে

পাইবে না। নৃশংস নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ স্বামীকে আরত নিজে মরিতে মরিতে রাত্রে তালবৃন্ত ব্যজনে শান্তি দিতে পারিবে না! আর যদি তোমায় দগ্ধ করিয়া যাতনা দিতে পারিব না তবে আর পাপ করিব কেন!

কিরণ মরিয়াছে, ভালই হইয়াছে—তাহার গভীর ভালবাসার অর্থ বুঝিতে পারিলাম, বিদ্যাভিমান যে জঘন্য গর্হিত কর্ম্ম তাহা জানিলাম। তাই বলিতেছি, সুষমা এস, পিশাচ পিশাচী আমরা দুই জনে বসিয়া চিরকাল অনুতাপ করি আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি—কিরণ! কিরণ! আমাদের ক্ষমা কর।

হতভাগ্য—

অমর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

অঞ্জলি।

এসেছি দুয়ারে দেব! চরণ সেবিব বলি।
রেখ হতাদরে পায়, ঠেলিওনা অবহেলি॥
কত সিন্ধু হ্রদ নদী, অতিক্রমি নিরবধি
এসেছি অঞ্জলি লয়ে, লহ সখা করে তুলি
বুকভরা ভালবাসা, অতীতের স্মৃতিগুলি।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালা।

সংস্কৃতোদ্ভব ভাষাগুলি এক্ষণে যেমন পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্ন, তাহাদিগের বর্ণমালায়ও তেমনি একটি বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাবী শিখ্‌দিগের গুরুমুখী অক্ষর, মধ্যভারতের দেবনাগরী অক্ষর, বিহারের কায়েতী অক্ষর ও বাঙ্গালা অক্ষরের মধ্যে বেশ একটী সুন্দর বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ সামান্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় গুরুমুখী, দেবনাগরী, কায়েতী, বাঙ্গালা,

আসামী প্রভৃতি অক্ষরগুলি একই কোনও প্রাচীন বর্ণমালার রূপান্তর মাত্র। সবিশেষ আকারের পার্থক্য সত্বেও মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় এগুলির উচ্চারণ একই, উড়িয়া বর্ণমালার কতিপয় অক্ষর বাঙ্গালার মত হইলেও তাহাদের আকার প্রায় অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় অক্ষরের মত।

এই সকল বর্ণমালা যে একই পুরাতন কোনও লুপ্ত বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বা আধুনিক কোনও বিশেষ বর্ণমালা এই সকল বর্ণমালার আদর্শ তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। অধুনা সংস্কৃত পুস্তকাদি দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এতদ্‌কারণে দেবনাগরী অক্ষরই যে প্রাচীন সংস্কৃতরচয়িতাদিগের ভাবপ্রকাশের উপায় ছিল, এ ধারণা ভ্রমমূলাত্মক। প্রাচীন সংস্কৃত আমরা কতকগুলি পুরাতন স্মৃতিফলক প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, কিন্তু তল্লিখিত অক্ষরের সহিত দেবনাগরী অক্ষরের বহু পার্থক্য আছে। সুতরাং অস্মদ্দেশীয় দেবনাগরী প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণমালাই যে কোনও পুরাতন বর্ণমালা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রাচীন বর্ণমালার অক্ষরসমন্বিত যাহা কিছু লুপ্তবস্তু উদ্ধার করা গিয়াছে তন্মধ্যে মহামতি বৌদ্ধভূপাল অশোকের গিরিখোদিত উপদেশমালাই সর্ব্ব-প্রাচীন। তদপেক্ষা অধিক পুরাতন অক্ষর এখনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের করতল-গত হয় নাই। সর্ব্বপ্রাচীন না হইলেও মনিষীরা ইহাতেই এরূপ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, এই লিখনপ্রণালী ভারতে স্বাধীনভাবে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

বৌদ্ধভূপাল অশোকের উপদেশগুলি দুইপ্রকার অক্ষরে লিখিত। কপুর্দ-গিরি খোদিত অক্ষরগুলি আধুনিক আরব্য ও পারস্য ভাষার ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামদিকে পড়িতে হয়। অবশ্য ইহা গ্রীক ও সাইদীয়দিগের বর্ণমালায় লিখিত এবং উক্তজাতীয় ব্যক্তিদিগের উন্নতির জন্যই মহামতি অশোক এই সকল উপদেশমালা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকারের অক্ষরগুলি প্রাচীন বর্ণমালার। বলা বাহুল্য, এই অক্ষরগুলির সহিত আধুনিক ভারতীয় বর্ণমালা-গুলির সবিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই অক্ষর দেখিয়া উর্ব্বরমস্তিষ্ক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিতে বসিলেন, প্রাচীন হিন্দুদিগের বর্ণমালা তাহাদের স্বদেশজাত না কোনও বিদেশীয় জাতির নিকট হইতে হিন্দুরা তাহা নিজদেশে আমদানী করিয়াছিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছিলেন ভারতের বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, সাহিত্য, গণিত

সকলই গ্রীক শিক্ষিত তাঁহারা অবশ্য বলিয়া উঠিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মদাতা গ্রীকদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষে একটী বর্ণমালাও আমদানী করা হইয়াছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ উদারচেতা অপর মনীষিগণ ধীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া এই গ্রীক বাদিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। মিঃ টমাস্, জেনেরাল ক্যানিংহাম প্রভৃতির অনুশীলনের ফলে নির্ণীত হইল, অপরাপর বিষয়ের মত হিন্দুরা একটি বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জেনেরাল ক্যানিংহামের যুক্তির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জেনেরাল ক্যানিংহাম বলেন অক্ষের দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে কোনও বস্তুর বাহ্যিক প্রকৃত আকৃতি চিত্রিত না করিলে সেই বস্তু বুঝান যায় না। আদিম সমাজের ইহাই প্রথা ছিল এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহার বহুল পরিমাণে উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা চাক্ষুষ যেমন পদার্থ দর্শন করি তদনুরূপ চিত্রদ্বারাই মেক্সিকোর লিখন কার্য্য সম্পাদিত হইত। প্রাচীন মিসরবাসীরা এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উন্নতি করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রণালী মতে কোনও বস্তুর একটি অংশ মাত্র সম্পূর্ণ বস্তুটি প্রকাশকল্পে ব্যবহৃত হইত। একটী মনুষ্য-শির অঙ্কিত থাকিলে পাঠক বুঝিত মনুষ্য বুঝাইতেছে, ইত্যাদি। তাহার পর এই প্রথার অধিকতর উন্নতির কালে একটি বস্তু কোনও এক শব্দের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। শৃগাল পশু জগতে ধূর্ত্ততার শীর্ষস্থানীয়, মর্কটকুল ক্রোধপ্রকাশে যেরূপ পটু এমন আর কোন পশুই নহে। সুতরাং প্রাচীন মিসরবাসীরা শঠতা বুঝাইবার জন্য জম্বুকমূর্ত্তি, ক্রোধ বুঝাইবার জন্য বানরমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত করিত। তাহার পর সকল প্রণালীর মত এ প্রণালীও উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। তখন অসিধারী হস্ত যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভ্রমণের সঙ্কেত হইল ভ্রমণকাল ব্যবহারানুরূপ বিভিন্ন পদযুগল, এবং চক্ষু চিহ্ন দর্শনের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষ চিত্রলিপি দ্বারা মানবহৃদয়ের স্নেহশান ও সুকোমল বৃত্তিরাশি প্রকাশ পাইত না। প্রাচীন জগতের সভ্যতা কবিতাময়ী; সুতরাং কবিতার ভাব প্রকাশ হেতু এই প্রণালী অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশদ করিতে হইল। প্রত্যেক চিত্রহরফকে এক একটি বস্তু জ্ঞান না করিয়া মিসরবাসীরা প্রত্যেক অক্ষরকে এক একটি বর্ণের ধ্বনিজ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে লাগিল। মিসরে মুখকে রু বলিত। সুতরাং এক্ষণে বদন চিত্রানুরূপ অক্ষর দেখিয়া মিসরবাসীরা মুখ বা মানব না বুঝিয়া র এই শব্দ বুঝিতে লাগিল। টুট্ বা হস্তচিহ্ন এইরূপে ট শব্দ বুঝাইতে লাগিল ইত্যাদি। এক্ষণে একটি মুখ ও একটি হস্ত আঁকিলে মিসরবাসী মুখ ও হস্ত না বুঝিয়া "রট" এই কথা লিখিত হইয়াছে বুঝিতে শিখিল।

ক্রমশঃ।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩১১। ষষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালা।

(শেষাংশ)

অবশ্য ঠিক্ ঐতিহাসিক না হইলেও উপরোক্ত গবেষণায় বেশ একটা বাস্তবের ভাব আছে। সভ্যতার প্রথম রশ্মি দ্বারা আলোকিত হইয়া মনুষ্য সমাজের আবিষ্কারক্ষম প্রতিভার যে এতদ্‌প্রকারে বিকাশ হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া বিশেষ আপত্তিকর নহে। দূরে মনোভাবপ্রকাশ জন্য মানবের পক্ষে চিত্রলিপি উদ্ভাবন করা আশ্চর্য্য কিসে? তখন মানব সভ্যতার শৈশব অবস্থা। শৈশবে যেমন বুদ্ধি ক্ষিপ্র,মানবের উন্নতিও তখন সেইরূপ হইয়াছিল। প্রকৃত সম্পূর্ণ চিত্রের পরিবর্ত্তে আংশিক চিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ বস্তু নির্দ্দেশ, তাহার পর গুণের প্রতিনিধি স্বরূপ তদ্‌গুণপ্রবল পশুচিত্র, তাহার পর ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য তৎক্রিয়াকালীন ব্যবহৃত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সর্ব্বশেষে এই চিত্র সঙ্কেত জ্ঞাপক বাক্যের প্রথম শব্দ চিত্রের অর্থরূপে ব্যবহার—এ সকল প্রথা স্বভাবতঃই আপনা আপনি জাতীয় উন্নতির সহিত সম্ভূত হইয়াছিল।

মিসরে যাহা ঘটিয়াছিল ভারতেও তাহা ঘটিল। ভারতসভ্যতার উন্নতির স্রোতে তখন আর্য্যদিগের জড়তা প্রভৃতি মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ সকল ভাসিয়া গিয়া কোন্ মহাসমুদ্র মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। প্রতিভাবলে, তাহাদিগের স্বাভাবিক

সর্ব্বদিকস্পর্শী মৌলিকতার অনুকম্পায় ভারতবর্ষেও একটি বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং অশোকের সময় লিখিত বর্ণমালা হইতে কানিংহাম্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঠিক উক্তরূপ ক্রমোন্নতির দ্বারাই প্রাচীন সংস্কৃতের বর্ণমালা সমুদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় বা মিসরীয় বর্ণমালা একটি অপরটির নকল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ভারতের প্রথা স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং ক্রমোন্নতির দ্বারা তাহার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল।

ভারতীয় বর্ণমালার দুই একটি অক্ষরের প্রকারানুরূপ অক্ষর মিসরদেশীয় বর্ণমালায় দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি বর্ণমালা যে একই প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহার একটি প্রমাণ। ভ্রমণকালে মনুষ্যের দুইটি বিভিন্ন পদের যে প্রকার আকৃতি হয় অশোকের বর্ণমালার "গ' অক্ষরের আকৃতিও তদনুরূপ। ঠিক এই প্রকারের একটি অক্ষর মিসরের বর্ণমালায় লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন একটি বর্ণমালা অপরটির অনুকরণে লিখিত। এই সমাকৃতিবিশিষ্ট অক্ষরটির দুই ভাষায় কিন্তু উচ্চারণ দুই প্রকারের। গমন চিত্রানুরূপ অক্ষরের উচ্চারণ অস্মদ্দেশে গ। কিন্তু এই চিহ্নটির উচ্চারণ মিসরে শ। ইহার কারণও অতি সরল। আমাদিগের গমন শব্দ ভ্রমণজ্ঞাপক আদিম ধ্বনি গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং গমন চিত্রানুরূপ অক্ষরের ভারতবর্ষে উচ্চারণ গ। মিসরদেশীয় ভাষা অনুরূপ তথায় এই আকারের অক্ষরের মূল্য "শ"। ইহারও বিশেষ একটি কারণ আছে। তথায় গমনজ্ঞাপক শব্দটি "শ" পূর্ব্বক। সুতরাং একই আকারের অক্ষরের মূল্য এক দেশে "গ" এবং অন্য প্রদেশে "শ"। একই প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া অক্ষরের আকার এক প্রকারের হইয়াছে মাত্র। যদ্যপি প্রাচীন ভারতবাসীরা মিসর দেশ হইতে তাহাদের লিখন প্রণালী শিক্ষা করিত তাহা হইলে অপহৃত হইয়া এদেশে আসিয়াও ঐ চিহ্নটি তাহার আদিম উচ্চারণ "শ"ই বুঝাইত। বলা বাহুল্য অশোকের 'গ' য়ের সহিত বাঙ্গালা ও দেবনাগরী 'গ'য়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

তাহার পর কানিংহাম সাহেব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অশোকের প্রত্যেক বর্ণটী তাহার আকৃতি অনুরূপ বস্তুর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ

করে। যেমন অশোকের "খ" বর্ণ একটি খনন যন্ত্রের মত দেখিতে। সুতরাং খন্ ধাতুর প্রথম অংশের যেরূপ ধ্বনি ইহার উচ্চারণও তদনুরূপ। তিনি বলেন এই প্রকারে যব হইতে ব, দন্ত হইতে দ, ধনু হইতে ধ, পানি হইতে প, মুখ হইতে ম, বীণা হইতে ব, রজ্জু হইতে র, নাশা হইতে ন, হস্ত হইতে হ, লঙ্গ্ (হাল) হইতে ল, শ্রবণ হইতে শ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে একে একে অক্ষরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। কালে অনেক অক্ষরের জন্ম হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকালীন আর্য্যেরা দেখিলেন মাত্র ৫৮টি অক্ষরেই তাঁহাদের সকল প্রকার মনোভাব ব্যক্ত হইবে। তখন দৃষ্ট হইল এই ৫৪টি বর্ণের পরস্পর সংযোগ বিয়োগ দ্বারা প্রত্যেক ধ্বনিই ব্যক্ত হইতে পারে। সুতরাং এ প্রথাকে আর বৃথা বিশদ না করিয়া ইহার উদ্ভাবয়িতৃগণ এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলেন। আর অধিক অনাবশ্যকীয় একধ্বনিজ্ঞাপক একের অধিক বর্ণের সৃষ্টি হইল না। *

অবশ্য প্রথম যখন লিখনপ্রণালী বা বর্ণমালা উদ্ভাবিত হইয়াছিল তখন তাহাতে বর্ত্তমান বর্ণমালার ন্যায় অক্ষরের ক্রমিক স্থান সকলও স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সকল ভাষার উন্নতির সহিত, ব্যাকরণের উন্নতির সহিত সংসাধিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ সালের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চিত্রাদির সহিত এবং মিসরদেশীয় চিত্রলিপির সহিত সবিশেষ তুলনা করিয়াই কানিংহাম সাহেব এইরূপ সিদ্ধান্তে নীত হইয়াছেন। অপরাপর যুক্তি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস এসকল সাদৃশ্য অর্থহীন নহে।

অবশ্য যে প্রকার যুক্তি এবং চিন্তাশীলতার সহিত উক্ত পণ্ডিত এই সকল সিদ্ধান্তে নীত হইয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক যুক্তি বা অনুমানটি নির্ভুল না হইতে পারে। মোটের উপর তাঁহার গবেষণা যে সত্যের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত করে, তাহা নিঃসন্দেহ।

---

* অনেকে মনে করেন ন, ণ বা জ, য, স, র এ সকল একধ্বনি জ্ঞাপক দুই অক্ষর। আমরা বাঙ্গালায় ইহাদের উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষা করিতে পারি না; কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থলের অধিবাসীবর্গ এ সকল যুগ্ম বর্ণের ঠিক পার্থক্য রাখিয়া উচ্চারণ করেন। আবার ফার্সি জাল, জোয়াদ, কাফ্ প্রভৃতি অনুরূপ অক্ষর সংস্কৃতোদ্ভব বর্ণমালায় নাই কারণ এরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট শব্দ সংস্কৃত ভাষায় দৃষ্ট হয় না।

স্বার্থপরতা।

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশি-বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হ'তে!"

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে অন্ধ স্বার্থপরতা যাহা পরের সুখ ঐশ্বর্য্য, আশা ও কামনা সমস্ত ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করিয়া আপনার ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত অন্ধ ও উন্মত্তভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে, তাহাই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং উহাই সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। অধুনা পৃথিবী মধ্যে যে জাতি যত সভ্য বলিয়া খ্যাত, সে জাতি সেই পরিমাণে স্বার্থপর। স্বার্থ যেন তাহাদের মূলমন্ত্র—স্বার্থেই তাহারা পরিচালিত। আহারে বিহারে, আদান প্রদানে, সুখে দুঃখে, সাম্রাজ্য বিস্তারে ও তাহার ধ্বংসে এমন কি পরোপকারে ও পরের অনিষ্ট সাধনেও একমাত্র স্বার্থই যেন তাহাদের হৃদয়ে প্রধান বলীয়ান্ হইয়া কার্য্য করে।

স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ নহে কে? এই বিপুল সংসার একমাত্র স্বার্থ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই গ্রহ তারা আদি জগৎ নিখিল, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীস্থ কোটী কোটী অনন্ত কোটী জীবগণ একমাত্র স্বার্থসূত্রে সংবদ্ধ। স্বার্থে ইহাদের গতি, স্বার্থেই ইহাদের পুষ্টি। স্বার্থশূন্য হইলে জীবের অস্তিত্ব সম্ভবে না এবং জীবের অনস্তিত্বে সংসারের অস্তিত্ব কোথায়!

এই সুবিশাল পৃথিবীতলে নিস্বার্থ কে? স্বার্থশূন্য সংসারে—স্বার্থে চালিত সংসারে কোন্ ব্যক্তি নিস্বার্থ ভাব ধারণ করিতে পারে? পৃথিবী অপেক্ষা যিনি গুরুতর, মনুষ্যাকারে যিনি দেবী, জগদীশ্বরী, একমাত্র আরাধ্যা, যিনি কায়মন অর্পণ করিয়া স্বীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া সন্তান পালন করেন—সেই জননীর তাঁহার কর্ম্মাবলীতেও স্বার্থের সুস্পষ্ট সুন্দর ও উজ্জ্বল ক্ষীণ রেখা দৃশ্যমান হইয়া থাকে। জননী যে সন্তানের জন্য এত কষ্ট এত দুঃখ সহ্য করেন, তাহার নিমিত্ত যে স্বীয় জীবন অবধি উৎসর্গ করিতে উদ্যত হন তাহারও মূলমন্ত্র ওই

একমাত্র স্বার্থ। সন্তানের প্রতি তাঁহার যে অপরিমিত করুণা ও অসীম স্নেহ তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল ইহাতে তাঁহার সুখ ও হৃদয়ের শান্তি। এই সুখ ও এই শান্তিই তাঁহার স্বার্থ। এ স্বার্থ স্বর্গীয় পদার্থ, এ স্বার্থ না থাকিলে সংসার অরণ্য হইত। এ স্বার্থবশে যে দয়ার সঞ্চার হয় এবং সেই দয়া হইতে যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তাহাই প্রকৃত দান। অপরের দুঃখে ও দৈন্যে কাতর হইয়া যিনি অন্তরের সহিত কাঁদিতে পারেন, যিনি অকাতরে দান করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দাতা, তাঁহারই সার্থক দান। এরূপ দানশীলতায় অভিমান নাই, গর্ব্ব নাই, মত্ততা নাই। এ দানশীলতা প্রশংসার অপেক্ষা করে না, সংবাদপত্রে নাম বাহির করিবার অভিলাষ রাখে না, অর্থশালী বলিয়া পরিচয় দিবার আশা করে না। পরের দুঃখে ও দৈন্যে, পরের কষ্টে ও যাতনায় যে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারে সেও দাতা—ঐ অশ্রুবিন্দুই তাহার দান। কিন্তু এমন দানশীলতায়ও স্বার্থ আছে,—দুঃখভার হৃদয়ের তৃপ্তি ও শান্তিই দাতার স্বার্থ। এ স্বার্থ অমূল্য বস্তু। এ স্বার্থ আছে তাই জগৎ চলিতেছে। নতুবা এই অসংখ্য অসংখ্য মানবের অবাসভূমি পিশাচের রঙ্গস্থল হইত, নররাক্ষসে পূর্ণ হইত। এই স্বর্গীয় স্বার্থভাব যতদিন অবধি লোভযুক্ত অন্ধ স্বার্থপরতায় পরিণত না হয় ততদিন দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট থাকে। কোনও ইংরাজ দার্শনিক এই জন্যই লিখিয়াছেন; "So long as self-love does not degenerate into selfishness, it is quite compatible with true benevolence."

যে স্বার্থ লোভপরতন্ত্র-অন্ধ-স্বার্থপরতায় কলুষিত হয় নাই সে স্বার্থের অস্তিত্ব সকলের মধ্যেই আছে। জীবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভেদে তাহা কেবল রূপান্তরিত হয়। কেহ তাহাকে কলুষিত করিয়া ফেলে, কাহারও বা অসীম শক্তি প্রভাবে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে। এ স্বার্থের পূর্ণ বিকাশ বিশ্বব্যাপী স্বর্গীয় প্রেমে। এ স্বার্থে যে ব্যক্তি অনুপ্রাণিত-সেই আপনাকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করিয়াছে। আপনার প্রতি যাহার প্রকৃত ভালবাসা জন্মিয়াছে সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, জগৎকে প্রেম বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমিত্বের পূর্ণ প্রসার তাহার দ্বারাই হইয়াছে। এই স্বার্থ হইতে আমিত্ব যতই প্রসারিত হয় ততই সে আমিত্বের

ধ্বংস হইতে থাকে। এ ধ্বংসে তাহার উপকার এবং জগতের উপকার। এমন উপকারী সংসারে অতি দুর্লভ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ইহারই প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। আর এক জলন্ত দৃষ্টান্ত মহারাণা প্রতাপ সিংহ। তবে প্রতাপ সিংহের অন্তর্নিহিত স্বার্থের বিকাশ পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভুর ন্যায় প্রেম ও ভক্তির পরিবর্ত্তে প্রেম ও তেজে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রেম ও তেজের প্রভাবে মোগল সম্রাট আকবর শাহের অন্ধ-স্বার্থপরতা-জনিত অমিত বল হীন ও নতশির হইয়াছিল। এই লোভহীন স্বার্থের নিকট অন্ধ-স্বার্থপর কুরুরাজের ক্ষমতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি নররূপী ভগবান যিনি পাণ্ডবের সহায় ছিলেন, তাঁহারও এ মহা আহবে মহান উদ্দেশ্যের ভিতর একটু স্বার্থ ছিল। সে স্বার্থ এই :—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যে ব্যক্তি আপনাকে ভালবাসে না, নিজের সুখ চায় না, সে অনায়াসে জীবন ত্যাগ করিতে পারে। ইহার উদাহরণ বঙ্গ-বিধবা। কিন্তু এমন লোকে সংসার চলে না, সমাজ স্থাপিত হয় না, রাষ্ট্রের উন্নতি হয় না। সংসারের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আপনাকে ভালবাসিতে হইবে, আপনার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে নহে। রুষ যেমন জাপান ধ্বংস করিয়া আপনার উন্নতির মুখ প্রসারিত করিবেন মানস করিয়াছেন, সে ভাবে নহে। কারণ পূর্ব্বে যে রুষ আত্মপ্রেমের প্রভাবে এমন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে তাহার চিহ্ন এখন ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। সে আত্মপ্রেমের পরিবর্ত্তে এখন ইহারা আত্মগরিমায় উন্মত্ত, নীচ স্বার্থপরতায় অন্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংসারে যাহা কিছু সংঘটিত হয় সমস্তই স্বার্থ হইতে, স্বার্থই তাহার মূল। এই স্বার্থ হইতেই ক্রমে লোভের উৎপত্তি। এ রিপু বড় ভয়ানক রিপু। সকলের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু যে ইহার তৃপ্তি সাধনে একবার চেষ্টিত হইয়া ইহার কবলে পড়িয়াছে তাহারই সর্ব্বস্ব ধ্বংস হইয়াছে।

এই লোভযুক্ত স্বার্থপরতায় মনুষ্য অন্ধ হয়, জ্ঞানশূন্য হয়, অপরের মুখ চায়

না, সুখ দুঃখ দেখে না, কেবল আপনার ঘৃণ্য ও নীচ প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্তি চায়, উদর পূরণে ব্যতিব্যস্ত থাকে। বর্ত্তমানের তিব্বৎ মিশন্ ও রুষ-জাপযুদ্ধ এই অন্ধ স্বার্থপরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বিগত বূয়র যুদ্ধের জয়পতাকা ও অদ্যাবধি এই ঘোর স্বার্থ কলঙ্ক-কালিমা অঙ্গে লেপন করিয়া পৎ পৎ রবে পাশ্চাত্য সভ্যতার একদেশদর্শী অভিমান ও গর্ব্ব ভরা আত্মগান গাহিতেছে। সে যুদ্ধের শান্তি হইয়াছে; কিন্তু সে লোভবুক্ত অন্ধ স্বার্থ-পরতা শান্ত হওয়া দূরে থাক্ দ্বিগুণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারই ফলে তিব্বৎ গ্রাসের আয়োজন। একে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিযুক্ত, আপনার মনে আপন সুখে দিন কাটাইতে চায়,—আর অপরে লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অন্ধ স্বার্থপরতার বশে তাহাদের সুখের ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আপন বর্ত্তমান সুখবৃদ্ধির জন্য লালায়িত, দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় সুবিশাল উদর পূরণে সদাই ব্যস্ত। একে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আশ্রিত, অপরে পাপের ভীষণ স্রোতে ভাসমান্। একে পারলৌকিক সুখের চিন্তায় মগ্ন, অপরে ঐহিক সুখের আশায় উন্মত্ত ও দারুণ অন্ধ। এই শেষোক্ত সুখ ও স্বার্থ পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।

পাশ্চাত্য জগতে ছলে বলে, কৌশলে ও প্রবঞ্চনায় অন্যকে তাহার অর্থ ও সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির আশয়ে যে, যে পরিমাণে কৌশল বিস্তার করিতে সক্ষম সেই ততোধিক সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। স্বীয় মঙ্গলোদ্দেশে অপরকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করিবার ভীষণ জীবধ্বংসকারী "টরপিডো"প্রভৃতি যাঁহারা যদধিক আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারা আধুনিক সভ্যতালোকে ততোধিক উন্নত আসন অধিকার করিতেছেন। স্বার্থের বল এতই প্রবল যে মনুষ্যকে জ্ঞানশূন্য করিতেছে। শুনা যায়, রুষ-সাম্রাজ্যে নাকি কেহ কাহাকেও আর প্রত্যয় করে না। এমন কি স্বামী স্ত্রীর নিকট নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে পারে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—একমাত্র ঘোর অন্ধ-স্বার্থপরতা।

এমন স্বার্থে-যাহারা অনুপ্রাণিত তাহারা যতই সভ্য হউক না কেন তাহাদের মত দুঃখী বোধ হয় আর কেহই নাই।

এই কারণেই বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি গাহিয়াছেন,—

"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ঙ্করী ; দয়াহীন সভ্যতা নাগিণী
তুলেছে কুটিল-ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

স্মৃতি।

(১)

"সে আজ পনের বৎসরের কথা—"

দুইদিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টি পতনে রাস্তা ঘাট সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে, কাহারও বাটীর বাহির হইবার উপায় নাই। কাজকর্ম্ম সমস্তই বন্ধ। বিধিনির্ব্বন্ধে বন্ধু অমরনাথের সাহচর্য্য না পাইলে নিতান্ত বেকারাবস্থায় কি প্রকারে এই দুইদিন কাটাইতাম বলিতে পারি না। অমর কল্য প্রাতে আসিয়াছে। অনতিবিলম্বে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাহার বাটীতে বলিয়া পাঠাইলাম বৃষ্টি না ধরিলে অমরকে ছাড়া হইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেঘগুলোর যেন একটু আলস্য বোধ হইল; বৃষ্টিপতনও যেন কিছু মন্দা পড়িল। বন্ধু এবং আমি বারান্দায় দুইখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিয়া বসিলাম। রাস্তার জল কলকল করিয়া ছুটিয়াছে। দলবদ্ধ লোকপ্রবাহ জল ভাঙ্গিয়া আপন আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়াছে। অকস্মাৎ মনে একটা অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠিল। অমরনাথের আরও নিকটে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া গিয়া বসিলাম "সে আজ পনের বৎসরের কথা, সে দিনও এমনিতর সমস্তদিন ধারাবর্ষণের পর এমনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল। দাদার বিয়েতে আমি নিতবর হইয়াছিলাম। কনের সঙ্গে এক পাল্কিতে চড়িয়া মাঠের উপর দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। মাঠের জল কলকল করিয়া একধার হইতে অন্যধারে যাইতেছিল। পাল্কীর দুই

পার্শ্বে নিবিড় হরিদ্বর্ণ ধান্য সমূহ বায়ু ভরে নাচিতে ছিল। নববধূ সমস্তদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া একটু চুপ করিয়াছিল।

মনে পড়ে, সেই অবসরে আমি তাহাকে কত কথা শুনাইয়াছিলাম। তখন আমি সবে কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। ক্রিকেট ম্যাচ, ফুটবল প্লে, ইডেন গার্ডেনে বেড়ান প্রভৃতি নিজের ছোট খাট বাহাদুরীর কথা তাহাকে এক নিশ্বাসে শুনাইয়া যাইতেছিলাম, আর সেই লাল চেলিপরা টুকটুকে কনেটী আমার মুখপানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক শুনিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে আমার এত কথা কেহ কখন শুনে নাই, শুনিবার যোগ্যও মনে করে নাই। সেদিন আমি শ্রোতা পাইয়াছিলাম, আমার মহা আনন্দ হইয়াছিল। ক্রমশঃ আমাদের পাল্কী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; বরকনে লইয়া যাইবার জন্য তালপুকুরের পাড়ে নকুড় সর্দ্দার তুবড়ি, রঙমশাল এবং বাদ্যকরেরা ঢোল, কাঁসি প্রভৃত্রি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনে পড়ে আমি নকুড় সর্দ্দারের নিকট হইতে একটা রঙমশাল চাহিয়া লইয়া পাল্কির একধারে হাত বাড়াইয়া পোড়াইতে ছিলাম, আর যখন উহার গুল ভাঙ্গিয়া নালার জলের উপর পড়িয়া পট্‌কা পোড়ার ন্যায় শব্দ হইতেছিল তখন নূতন কনে আমার বাহাদুরীটা দেখিতেছে কিনা দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে এক একবার চাহিতেছিলাম।

(২)

তারপর বৈশাখ মাসে যখন গ্রীষ্মের ছুটির পর বাটী যাই, তখন নূতন বউ সবে মাত্র আমাদের বাটী আসিয়াছিল। সে আসিয়া আমায় চুপে চুপে বলিল "ঠাকুরপো, আমি আজ পনের দিন আসিয়াছি; রোজ রোজ ভাবি তুমি কবে আসিবে; খাওয়া হলে একবার অবশ্য করে উপরে যাইও, তোমায় কত জিনিষ দেখাইব।"

দাদার ঘরে গিয়া দেখি নূতন বউ একরাশ পুঁতির খেলানা টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে হাসিয়া বলিয়াছিল "আচ্ছা ঠাকুর পো, ঠিক করে বল দেখি এই গাড়ীখানা কেমন হয়েচে? এসব গুলো আমি নিজের হাতে গেঁথেছি; মা বল্লে এ সব মাথামুণ্ড সেখানে নিয়ে গিয়ে কি কর্‌বি; আমি কিন্তু তোমাকে দেখাবার জন্য তার মানা না শুনে নিয়ে এসেছি।"

বাস্তবিক সেগুলি অতি পরিপাটী হইয়াছিল। আমি বলিলাম "বউদিদি,তুমি এত সুন্দর গাঁথিতে পার ? আমি পূজার সময় যখন বাটী আসিব তখন তোমার জন্য অনেক পুঁথি ও তার লইয়া আসিব।"

বউদিদি একমুখ হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল"না ঠাকুর পো পুঁথি আন্‌তে হবে না বরং কতকগুল কাল রঙের উল নিয়ে এস; আমি গলাবন্ধ বুন্‌তে শিখেছি তোমায় একটা তৈয়ারি করে দেব।"

অমর! আজও সেই গলাবন্ধ আমার গলায় দোদুল্যমান রয়েছে, কিন্তু হায়, ইহার রচয়িত্রী কোথায় ? কয়টা বৎসরের জন্য এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দুঃখপূর্ণ অংশ অভিনয় করিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে বলিবে ? সে বিদ্যুদ্দামতুল্য রূপরাশি, সে সরলতাময়ী সদাপ্রফুল্ল আনন চিরকালের জন্য আমার চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে। হায় বড় বউ, হায় কারুণ্য প্রতিমা দয়াময়ী বড় বউ, এ অভাগার স্মৃতি-মন্দিরে কেন এই নিষ্ঠুর চিহ্ন রাখিয়া গেলে ?

(৩)

ইহার সাতবৎসর পরে দাদার কোন একটা সওদাগরি আপিষে চাকরী হইল, তিনি কলিকাতা আসিলেন। আমি তখন এণ্ট্রাস পাস করিয়া এ'লে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। তিনি আমার মেসে থাকিয়াই কার্য্য করিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহার একাগ্রতা ও দক্ষতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্র তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আপিষের বন্ধু নিশানাথ বাবু দাদার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। কি জানি কেন, প্রথম হইতেই লোকটাকে আমার আদৌ ভাল লাগিত না। এই ভাবে দুই চার মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম দাদা সন্ধ্যার পর দুই তিন ঘণ্টা বাহিরে কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বহিঃর্গমনের সাজসজ্জা দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা ভয় এবং সন্দেহ হইতে লাগিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি প্রত্যহই সন্ধ্যার পর কোথায় যান ?"

অন্যদিকে চাহিয়া তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না তাই নিশানাথ বাবুর বাটী একটু গান বাজানা করিতে যাই।" উত্তর শুনিলাম বটে কিন্তু মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর করিতে পারিলাম না।

তারপর সে দিন সরস্বতীপূজা। পড়াশুনা বন্ধ। সমস্তদিন তাস পিটিয়া

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ মনে পড়িল "দাদা দশটার সময় খাইয়া বাহির হইয়াছেন জলখাবার সময় উত্তীর্ণ হইল এখনও আসিলেন না; মনে বড়ই দুঃর্ভাবনা হইল চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম, বাহিরে যাইতে পারিলাম না। রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। রমেশ আসিয়া বলিল "কি হে চুপ করে শুয়ে যে, দাদা কোথায়? সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে গেছেন নাকি?"

তাহার নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার অন্তর বিদ্ধ করিল, কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, ঠাকুর খাইতে ডাকিলেন। ক্ষুধা আদৌ ছিল না, কোন প্রকারে নিয়ম রক্ষা করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। দুশ্চিন্তায়, বেদনায়, মন জ্বলিয়া যাইতেছিল, নয়ন অবসাদভরে রোধিয়া আসিতেছিল। আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। ভাই অমর, সেই দিন নিশিশেষে যে স্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। কখন ভুলিব কিনা জানি না। সে বীভৎস স্বপ্ন কাহিনী স্মরণে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে; দেখিলাম আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। সম্মুখে যতদুর দৃষ্টি যায়, সফেন তরঙ্গ রাজি ভ্রূকুটি করিয়া ছুটিতেছে। সাগর গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া আসিতেছে। দেখিলাম তন্মধ্যে আমার অগ্রজ পড়িয়া নিমজ্জিত হইতেছেন। কূলে বড়বধূ দাঁড়াইয়া; তাঁহার স্বর্ণবর্ণ কালিমাময়, অনিন্দ্যসুন্দর বদন শবের ন্যায় শুষ্ক। কম্পিত হস্তে বারিমধ্যে দেখাইয়া আমার দিকে অতি দীন, অতি করুণ নেত্রে চাহিয়া তিনি যেন ভগ্নস্বরে বলিতেছিলেন "দেখ দেখ আমার স্বর্ব্বস্ব যায়, পার যদি তুমি রক্ষা কর।" দারুণ মর্ম্মদংশনে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, দাদা তখনও আইসেন নাই।

(৪)

একদিন আহার করিতে করিতে দাদা বলিলেন "সুকুমার, আমার আপিষ এখান হইতে অনেক দূর হয়, বড়বাজারেই একটা সুবিধামত বাসা পাইতেছি সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করি।" তখনই আমার মনে হইল তিনি তাঁহার পাপাচারের পথ একেবারেই পরিষ্কার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র কণ্টকটীকে উৎপাটিত করিয়া সুদূরে নিক্ষেপ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। অভিমানে কিছুই উত্তর দিলাম না। নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইবার উপক্রম হইল।

বহুকষ্টে তাহা রোধ করিলাম। আমার স্বভাব, হৃদয়ে যখন বড়ই বেদনা পাই মুখে কোন কথাই বাহির হয় না। সর্ব্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হইবার ব্যবস্থা দেখিয়াও, তাঁহাকে নিকটে রাখিবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, স্বভাবদোষে কোন কথা বলা হইল না।

দুই দিন পরে দাদা নূতন বাসায় উঠিয়া গেলেন। বাটীতে মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলাম। বিধিমতে নিষেধ করিয়া দিলাম বধূ ঠাকুরাণী যেন ইহার বিন্দুমাত্রও না জানিতে পারেন। চিন্তায়, মনকষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। দাদার সহিত বাসায় দেখা করিতে যাইলে দেখা পাইতাম না। অগত্যা মধ্যে মধ্যে তাঁর আপিষে গিয়া সাক্ষাৎ করিতাম। একবার বাটী যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতাম; ভাবিতাম সে সারল্য প্রতিমা পুণ্যময়ী, বধূ ঠাকুরাণীকে দেখিয়া তিনি তাহার পূর্ব্বের চরিত্র ফিরিয়া পাইতে পারেন। কিন্তু হায়, সমস্তই বিফল হইয়াছিল। তিনি প্রতি সপ্তাহে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেন মাত্র, কিন্তু কখনও যাইতেন না।

একদিন শুনিলাম তহবিল তছরুপাত করাতে দাদা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। সাহেব তাঁহার উপর আন্তরিক স্নেহ বশতঃ শুদ্ধ মাত্রই বিদায় দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দাদা লজ্জায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া বাটী গিয়াছেন।

নিষ্কলঙ্ক বংশে কলঙ্কের এই গভীর ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মনের নিভৃততম প্রদেশে যেন একটা শান্তির ছায়া বোধ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, দাদামহাশয় এইবার বোধ হয় রক্ষা পাইলেন।

(৫)

পূজার সময় বাটী গিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণীকে আর চিনিবার যো নাই; তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা কোথায়" তিনি কাঁদিয়া কহিলেন "বাবা সুকুমার, শেষ অবস্থায় যে বিধাতা আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখিয়াছেন তাহা কখনও ভাবি নাই। নবকুমার আজ দুই দিন বর্দ্ধমান গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে। বোধ হয় তোর সহিত দেখা করা তার ইচ্ছা নয়।"

"কেন? তাঁহার এতদূর লজ্জিত হইবার কোনও আবশ্যক ছিল না।

ভুল মনুষ্যের জন্যই, পদে পদে মনুষ্যের ভুল হইয়া থাকে। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অসৎসংসর্গে পড়িয়া কয়টা মাসের জন্য দূষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে আপনাকে সংশোধন করিতে পারিয়াছেন ইহাই আমাদের পরম লাভ মনে করা উচিত।"

"শোধরাইয়াছেন আমার মাথা আর মুণ্ড। কতকগুলো ছাইপাশ খেতে শিখে এসেছে, চব্বিশ ঘণ্টা তাই খাচ্চে আর আমাদের হাড়ে নাড়ে জ্বালাতন করচে। ঐ আবাগী পরের মেয়েটা—সাতচড়ে মুখে রা নাই, ওর অদৃষ্টে এত কষ্ট! গায়ের গহনা গুলা একটা একটা করে নিচ্চে আর শুঁড়ির দোকানে দিচ্চে। বলব আর কি বাবা সুকুমার, বলবার কথা নয়—নে তুই এখন কাপড় ছাড়, মুখে হাতে জল দে।"

সাহস করিয়া তখন আর আমি বড় বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিলাম না। হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিলাম।

(৬)

দাদার ঘরে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। দেখিলাম আটমাস পূর্ব্বে যে মন্দিরে সুতন্বী, আভাময়ী, সদা প্রফুল্লমুখী পুণ্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা কোন নরাধম তস্কর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সেই স্থলে দাবদগ্ধা, অতিদীনা, অতিহীনা, শীর্ণশরীরা নারী কঙ্কাল রাখিয়াছে। যে নয়ন দেখিয়াছিলাম কত উজ্জ্বল, কত মধুর, আজ তাহা কোটরপ্রবিষ্ট, নিষ্প্রভ, মলিন। বড়বধূ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ ম্লান হাসিয়াছিলেন। ভাই অমর, সে হাসি যে কি তুমি বুঝিবে না, বুঝিতে পারিবে না। সে হাসি মানব হৃদয়ের অনন্ত যাতনার একটা বিকাশ মাত্র, তাহাতে মাধুরী নাই, আনন্দ নাই, অতি ম্লান, অতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তিনি বলিলেন "ঠাকুর পো তুমি এত রোগা হইয়া গিয়াছ?"

"আর তুমি—বউদিদি তুমি—একি তোমার হাতে কি হইয়াছে" চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "পড়িয়া গিয়াছিলে না কি?"

বধূ ঠাকুরাণীর চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না!!!

কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিয়াছিলেন "ভাই ঠাকুরপো, একবার যদি আমায় বলিতে, একবার আমায় সংবাদ দিতে"—

হঠাৎ পথিমধ্যে ভীষণ সর্প দেখিলেও পথিক ততদূর চমকিত হয় না। আমি যে কি সর্ব্বনাশী ভুল করিয়াছি, আজ তাহা বুঝিতে পারিলাম। ভয়ানক আত্মগ্লানি মর্ম্মস্থল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। হায় হায় কি করিয়াছি, কেন বলিলাম না। তাহার জিনিষ সেত বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। কেন তাহাকে করিতে দিলাম না। বড়বধূর দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না; নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলাম।

আমাকে তদবস্থা দেখিয়া বধূঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন "না ঠাকুরপো, তাহা বলিতেছি না, তোমার দোষ কি? অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা'ত হইবেই। আমার দেবতুল্য স্বামী, তাঁর স্বভাব দূষিত হইবার নহে। নিশ্চয় জানিও কোনও কুগ্রহের কুদৃষ্টিতে পড়িয়াই এই সব ঘটিতেছে। শান্ত হও, অধৈর্য্য হইও না ভোগ শেষ হইলেই এই সবেরও শেষ হইবে। আবার আমাদের সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে।"

(৭)

বাহির বাটীর আসবাব পত্র কিছুই ছিল না। পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমাদের সুশৃঙ্খল আবাস বিশৃঙ্খলতার উদাহরণ স্থল হইয়াছিল। বাটীতে কেহই আসিত না। সন্ধ্যার সময় ছোট বোন যামিনী আসিয়া বলিল "ছোটদাদা! দাদা না হয় উচ্ছন্ন গেছেন, বাটীতে একটা স্ত্রীহত্যা হয় তোমার ত একটা বিহিত করা উচিত। বড়বউ, দাদার খাওয়া না হলে কিছুতেই খায় না; দাদা কখন আসেন তার ঠিক নাই, ওর অদৃষ্টে মাসের মধ্যে পনের দিন খাওয়া হয় না। পিত্তি পড়ে পড়ে শরীর ভেঙ্গে গেছে; রোজ বৈকালে একটু করে জ্বর হয়। না হয় ওকে দিন কতক বাপের বাটী পাঠিয়ে দাও। তুমি বল্লে তোমার কথা রাখ্‌তে পারে, আমরা অনেক বার বলেচি।"

পূজার কটা দিন কেটে গেলে, বড়বধূকে একবার বাপের বাটী যাবার জন্য বললুম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিয়াছিল "ঠাকুরপো তুমি আমায় অনুরোধ করো না। ওঁর এই অবস্থা, আমি চলে গেলে ওঁকে কে দেখবে। মা বুড় হয়েছেন তিনি কিছু পারিবেন না। এখান থেকে গেলে আমি এক-দণ্ডও সুস্থির হতে পারব না।" অগত্যা আমি নিরস্ত হইলাম। কবিরাজ

ডাকাইয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। বাটীতে মন টিকিল না। কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

(৮)

কলিকাতায় আসিয়াও পড়াশুনায় তেমন মন দিতে পারিলাম না। কেবল একটী দুশ্চিন্তার ভার হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলাম। বন্ধুসঙ্গ, ক্রীড়ামোদ, ভাল লাগিত না। যতদূর পারিতাম পড়িতে চেষ্টা করিতাম। ভাল না লাগিলে গোলদীঘির ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন কলেজ হইতে আসিয়া দেখি দাদার হস্তলিখিত শিরোনামাযুক্ত একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। বহুদিন পরে দাদার চিঠি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ব্যস্ত হইয়া খুলিয়া ফেলিলাম। পত্র পড়িয়া আমার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে আত্মস্থির করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম।

(৯)

বাটী আসিয়া দেখি সব ফুরাইয়া গিয়াছে! দাদা আমাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার মমতা হইল না। হৃদয়ে অগ্নি দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে পারিলাম না। মনে মনে বলিলাম "কিছুদিন পূর্ব্বে হইলে বোধ হয় সব ফিরিয়া পাইতে পারিতে। এখন আর তোমায় কিছু বলিবার নাই, কিছু বলিতেও পারিব না। ভগবান করুন তোমার অনুতাপ যেন আর তোমায় পাপপথে যাইতে না দেয়—যেন সমস্ত জীবন এই অনুতাপ বারি তোমার নয়নে অজস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া ঘোর পাপ কালিমা প্রক্ষালিত করিতে চেষ্টা করে। যে রত্ন হারাইয়াছ তাহা দুর্ল্লভ। সেদিন যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছে আজ আর তোমার শত ক্রন্দনেও সে ফিরিয়া আসিবে না। পাপিষ্ঠ, স্বার্থপর মানবের নিষ্ঠুর নিষ্পীড়ন তুচ্ছ করিয়া সে কোন পুণ্যময়, সুরভিত, সুন্দর প্রদেশে চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। স্বার্থের দুর্দ্দমনীয় স্রোত ততদূর প্রবাহিত হইতে পারে না, পাপের সর্ব্বধ্বংসী অনল সে পুণ্যময় দেশ দহন করিতে পারে না। মদমত্তের নিষ্ঠুর হস্ত দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে না। অনন্ত শান্তি মধ্যে অনন্ত প্রেমে অনন্ত কাল ধরিয়া সে দেবী প্রতিমা তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

* * * * * *

উভয়ে কতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলাম বলিতে পারি না। পথিকের উচ্চসঙ্গীতে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথিক আপন মনে গাহিতেছিল ঃ—

খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এ জগত খানা

"খেল্‌তে খেলা ভবের বাসে

কোথেকে সব মানুষ আসে

*   *   *

খানিক খেলে খেলনা ফেলে কোথায় পালায় যায় না জানা।

শ্রীউমাচরণ ধর।

রাঠোর বালক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"অক্ষয় কবচ মাতা, তোমার আশীষ,—

চরণপ্রসাদে তব ডরে না চন্দন

শত যোদ্ধা মধ্যে একা হতে অগ্রসর ;

জনম লয়েছি যবে মরিব নিশ্চয়—

রুদ্ধ কক্ষ মধ্যে মাতা, তিল তিল ক্ষয়ে

জরা ব্যাধি সন্তাপিত, শীর্ণ কলেবরে

জ্বালাময়, ভয়াবহ, মৃত্যু আলিঙ্গন—

অথবা দুর্দ্দমতেজে স্বাধীনতা-ধ্বজা

বিস্তারিয়া মহানন্দে সুনীল অম্বরে

বিশাল অনন্ত ক্রোড়ে লয় বরণীয় ?

অবধান কর দেবি! দাসের বচন

চিতোরের মহারাণী নিবসে হেথায়—

সন্ধান পাইয়া যত ম্লেচ্ছ দুরাচার
আসিতেছে মহানন্দে দুর্গ অবরোধে ;
কেমনে রক্ষিব মান ভাবিয়া অস্থির
নিঃশব্দে ভ্রমিতেছিনু আপন প্রকোষ্ঠে
হেনকালে পূজ্য ভ্রাতা তেজসিংহ বীর
উপযুক্ত পরামর্শ করিয়া প্রদান
—অতি বিচক্ষণ তিনি নবীনে প্রবীণ—
লাঘবিলা হৃদিভার চিন্তায় আকুল—

লইয়া যাবেন তিনি দুর্গম অরণ্যে
মহারাণা পরিজন। যথা ভীলগণ
নির্ভয় স্বাধীন প্রাণ, বিচরে সগর্ব্বে
তুচ্ছ করি দিল্লীশ্বর বৃথা আস্ফালন
যতক্ষণ বিন্দুরক্ত ভীল ধমনীতে
একটী যবন নাহি পশিবে তথায়—
ধন্য বীর ভীলগণ আপদে বিপদে
কতবার রক্ষিয়াছে রাজপুত মান,
শ্রীচরণে নিবেদন শুনগো জননি !
তুমিও গমন কর উহার সহিত।

হেথা দুর্গরক্ষা তরে রহিল কিঙ্কর—
পুরাইতে রণ আশ দুষ্ট যবনের—
শৃগাল কুক্কুরদলে তাড়াইব দূরে
দুর্গশিরে উড়াইব বিজয় পতাকা,
রণজয়ী সেনাবৃন্দ গাহিবে উল্লাসে
মহারাণা জয়গান। দামামা নির্ঘোষ
বিজয়ের পুণ্য বার্ত্তা ঘোষিবে চৌদিকে ;
বিদায় দেহ গো দেবি ! মিলিব আবার

তাড়াইয়া অরিদলে ; সুন্দর চিতোর
সুমঙ্গল গীত বাদ্যে হবে মুখরিত।"

"জননী তোমার আমি, রাজপুত বীর
ধরিয়াছি গর্ভে বৎস তোমা হেন সুতে
স্তন দুগ্ধে পালিয়াছি সিংহের বালক
শুনায়েছি কীর্ত্তিকথা উপন্যাস ছলে—
ফল ফুলে সুশোভিত স্বরোপিত বীজ—
পরীক্ষার দিন পুত্র সম্মুখে তোমার
কোথা যাব আমি ? স্বচক্ষে হেরিব
আজন্মের দীক্ষামোর কি ফল প্রদানে
আমার চন্দন সিংহ তরবারি করে
কেমনে বিতাড়ে দূরে ম্লেচ্ছ কুলাঙ্গার।

হলে প্রয়োজন পুত্র রাজপুত নারী
আবদ্ধ রবে না কভু কক্ষের ভিতর—
অভয়া কিঙ্করী আমি, মার পদ স্মরি
মিলিব তোমার সনে প্রচণ্ড আহবে
দেখাইব বৈরিদলে গৃহ কার্য্যাসনে
কেমনে করেছি শিক্ষা রক্ষিতে সম্মান !
মা আমার হররাণী দানব দলনী
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তব পূত পদরজঃ
তোমারে ভরসা করি ভাসিব অর্ণবে
সে সময়ে কিঙ্করীরে ভুলনা জননী !"

ক্রমশঃ

শ্রীউমাচরণ ধর।

লাভ।

মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর ও জড় জগতের বহির্ভূত হইলেও তাহার শরীর রক্ষার জন্য মানবজাতি জড়জগতের উপর একান্ত নির্ভর করে। ফলতঃ জড়জগতের সাহায্য ব্যতিরেকে মানবের জীবন ধারণ সম্ভবপর নহে *। আবার এই জড়জগতের অন্তর্ভূত মানবজাতির নিত্য নৈমিত্তিক অভাবনীয় বস্তু সকলের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় তাহাদিগের উৎপত্তি, প্রকৃতির বদান্যতা এবং মানবজাতির শ্রমশীলতার দ্বারাই হইয়া থাকে। শ্রম বিনা লাবণ্যময়ী হাস্যমুখী প্রচুরশস্যা ধরিত্রী মানবের দেহ রক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে না। আবার প্রকৃতিজাত পদার্থ লইয়া শ্রম না করিলেও সুদীর্ঘ কালব্যাপী কঠোর কায়িকশ্রমও আমাদিগের শারীরিক অভাব দূরীকরণ বিষয়ে পণ্ড শ্রম। একথা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু সরল ও নিত্যলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ আমরা সামান্য কথার আলোচনা করি না।

এই দুইটি ব্যতীত অপর একটি উপকরণও আবশ্যক দ্রব্যোৎপত্তি বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃতি বদান্য হইলেও আমাদের পরিশ্রমের ফল উহা বিলম্বে প্রদান করে। কৃষক ছয় মাস কাল কঠোর পরিশ্রম করিলে তবে মেদিনী শস্যশ্যামল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করে। যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাকে ত আবার আরও অধিক সময় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার কার্য্য ফলবতী হইয়া তাহাকে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত শস্যোৎপাদন করিতে কৃষি উপযোগী যন্ত্রাদি ও পুরাতন শস্য আবশ্যক। সূক্ষ্ম শিল্পীরও শিল্পের জন্য যন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক। এই সকল পদার্থ এবং যে সময় শ্রমজীবি ভবিষ্যৎ ধন আশে শ্রম করিবে তৎকালীন ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী গৃহে না

---

* **Man is a being who doubly presupposes Nature, as he is a spirit which finds its organism in an animal body, and it is in the system of Nature that he finds the presupposition and environment of his life.**

—Caird in his Critical Philosophy of Emanuel Kant P. 10.

থাকিলেও ত বাঞ্ছনীয় পদার্থোৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যকে তাহার পূর্ব্বকৃত শ্রমফল হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ ও সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিতে হয় এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে হয় *। এই পূর্ব্বসঞ্চিত উদ্বৃত্ত বস্তুকে মূলধন কহে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপত্তি—প্রকৃতি, পরিশ্রম ও মূলধন এই তিনটিরই সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। †

এই তিনটি উপকরণের মধ্যে প্রকৃতিজাত দ্রব্য পৃথিবীগর্ভ হইতেই সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু মানবের ঐতিহাসিক স্মৃতির বহু পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা নিজস্ব করিয়া লওয়া হইয়াছে।‡ তাহার পর পরিশ্রমও সকলে করিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় আবার দক্ষশ্রম অপর কতকগুলি ব্যক্তির নিজস্ব। তাহার পর মূলধনের অধিকারীও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য আমরা সময়ে সময়ে একই ব্যক্তির নিকট হইতে তিন প্রকার উপকরণ প্রাপ্ত হই—অর্থাৎ যাহার জমি, মূলধন ও শ্রম তাহারই হইতে পারে—কিন্তু ভাবের সরলতার জন্য আমরা অতঃপর মানিয়া লইব এই তিন উপকরণ তিন প্রকার লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যখন দ্রব্য বা ধনোৎপত্তি § বিষয়ে তিন শ্রেণীর লোকের সহায়তার প্রয়োজন হয় তখন উৎপাদিত ধনের অংশ এই তিন শ্রেণীর মানবের মধ্যে বিভাজ্য হওয়া ন্যায়সঙ্গত। যাহার ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয় ভূম্যধিকারীস্বত্বে তাহার উক্ত শস্যের একটি অংশ পাওয়া বিধেয়। আবার যাহাদের শ্রমে

* Capital is the result of saving—J. S. Mill.

† Marshall প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞেরা এই তিনটি উপকরণ ভিন্ন আবশ্যক বস্তু প্রণয়নে Business organisation কেও একটি উপকরণ বলিয়া থাকেন।

‡ Blackstone প্রভৃতি বলিতেন Adverse possession ripened by prescription" অর্থাৎ বহুকাল একাদিক্রমে দখল এবং অপরকে তথা হইতে বর্জ্জিত করিয়া মনুষ্য পৃথিবীর এক একটি অংশ নিজস্ব করিয়াছে। আধুনিক মতের জন্য Maine's Ancient Law দ্রষ্টব্য।

§ ধন অর্থে বাঞ্ছনীয় পদার্থ।

বা মূলধনে শস্যের উৎপত্তি তাহারাই বা এক একটি অংশ না লইবে কোন্ হিসাবে? অবশ্য বলা বাহুল্য এই তিনটি উপকরণ—ভূমি,শ্রম ও মূলধন এক দুই বা তিন ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত হইলে তদসাহায্যোৎপাদিত ধন যথাক্রমে এক দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে।

উৎপাদিত ধনের যে অংশ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য তাহাকে ভূমির খাজনা বা ভাড়া কহে। শ্রমকারীর অংশ ভাষায় পারিশ্রমিক, মজুরী, বেতন প্রভৃতি উক্ত হয়, এবং যে অংশ মূলধনের অধিকারীর তাহাকে লাভ বলে। লাভের বিষয় গুটিকতক কথা এস্থলে অবতারণা করিব।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে কোন ব্যবহারোপযোগী বস্তু উৎপাদন করিবার জন্য যে মূলধন খরচ করিতে হয়, বস্তু প্রস্তুত হইলে তাহার যে অংশ ইহার পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া যায় চলিত ভাষায় তাহারই নাম লাভ।

প্রকৃত পক্ষে এই মূল ধনের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভবিষ্যৎ ধনোৎপত্তির জন্য উপস্থিত ধন হইতে কিয়দংশ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দেওয়ার কতকটা উপস্থিত সুখ লাভের উপায় বিসর্জ্জন করিতে হয়, আপনাকে কতকটা উপভোগ সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। উপস্থিত ভোগ সুখ বর্জ্জিত হইবার জন্য ভবিষ্যতে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাকেই যথার্থ লাভ বলা যাইতে পারে। এ বৎসর আপন পরিশ্রমফলে যাহা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা হইতে হিসাব মত ব্যয় অন্তে বর্ষ শেষে দেখিলাম একশত টাকা উদ্বৃত্ত করিয়াছি। অবশ্য ইচ্ছা করিলে আমি এই বর্ষ মধ্যে সে শত মুদ্রা যথেচ্ছা ব্যয় করিয়া আমার বিলাস-বাসনার অধিকতর পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া আমি আমার বিলাসিতা কুঞ্চিত করিয়া যখন একশত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছি তখন আমার ত্যাগস্বীকার জন্য কিছু পুরস্কার পাওয়া ন্যায়বিগর্হিত নহে। আগামী বৎসর সেই মুদ্রা অপর ব্যক্তিকে কর্জ্জ দিয়া আবার যদি আমি বৎসরের শেষে তাহার নিকট হইতে একশত ছয় টাকা পাইতে পারি তাহা হইলে ঐ ছয় টাকা আমার লাভ হইবে। ইহাকে ভাষায় সুদ কহে এবং প্রকৃত পক্ষে এই ত্যাগস্বীকারের পারিতোষিককেই লাভ বলা বিধেয়।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা লাভ শব্দ অপরার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি।

যখন বলি কোনও ব্যক্তির দোকানের লাভ হইয়াছে এক বৎসরে ৫০০৲ শত মুদ্রা তখন বাস্তবিক ঠিক মূলধন ব্যবহারের পুরস্কার ব্যতীত ঐ লাভ শব্দের মধ্যে আমরা অপর বিষয়ও সন্নিবেশিত করি। উক্ত ব্যবসায়ী যখন তাহার মূলধন ব্যবহার করিয়াছিল তখন প্রথমতঃ তাহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এত কষ্টের অর্থ, কত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, নিজের নিবুর্দ্ধিতায় ব্যবসায় করিতে গিয়া এই অর্থ লোকসান করিয়া অবশেষে কি বিপন্ন হইব? এ চিন্তা সত্বেও কিন্তু সে বুঝিল নিজস্কন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে কিছুই হইতে পারে না, লোকসান হয় হইবে, লাভ ও ত হইতে পারে।

এই যে ঘাড় পাতিয়া দায়িত্বটুকু লওয়া ইহার জন্যও মানবের একটা পুরস্কার পাওয়া ন্যায়সঙ্গত। সকল বিপদ আপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, সঞ্চিত অর্থ লৌহকোষে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া বাণিজ্য করার জন্য মানবের লাভ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। সার্দ্ধ তিন টাকা হারের সুদে কোম্পানীকে অর্থ কর্জ্জ না দিয়া ব্যবসায় অর্থ খাটাইলে দেখিতে পাই লভ্য অধিক হয়। আবার যে ব্যবসায়ে লোকসানের ভয় যত অধিক, যে ব্যবসায়ে যত বেশী দায়িত্ব, সেই ব্যবসায়ে লাভও সেই পরিমাণে বেশী। সুতরাং উপস্থিত সুখ বিসর্জ্জনের পারিতোষিক ব্যতীত ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণও লাভের একটা উপকরণ।

তাহার পর কোনও ব্যবসাজীবির লাভ ব্যবচ্ছেদ করিলে উপরোক্ত বিষয় গুলি ব্যতীত তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পারিশ্রমিক লুকাইত থাকে তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

যাহাকে লাভ বলি তাহা অনেক সময় মূলধন অধিকারীর পারিশ্রমিকের নামান্তর মাত্র *। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার দোকান করিবার সময় দৃষ্টান্তোল্লিখিত ব্যবসায়ীকে মূলধন ব্যবহার করিতে হইয়াছিল এবং কতকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুধু তাহাই নহে, তাহাকে বহু শ্রমে এবং দক্ষতার

---

*Adam Smith বলেন—The greater part of apparent profit is real wages disguised in the garb of profits—Wealth of Nations.

সহিত সমস্ত বৎসর খাটিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র দোকান খানি হইতে ৫০০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল; সুতরাং লাভ বলিলে মূলধন সরবরাহকারীর নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য পুরস্কার বুঝায়।

(ক) উপস্থিত সুখ বিসর্জ্জন করিয়া অর্থ সঞ্চয়।

(খ) দায়িত্ব গ্রহণ।

(গ) ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতা।*

যে হারের দ্বারা এই উপরোক্ত তিন প্রকার অনুষ্ঠান জন্য ঠিক যথাযোগ্য পুরস্কার পাওয়া যাইতে পারে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পলাভ, অবশ্য ইহা না পাইলে কেহ কাহারও মূলধন ব্যবহার করিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লাভের হার বিভিন্ন। সামান্য ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত অত্যধিক লাভ পাওয়া যায় কিন্তু বৃহদনুষ্ঠানে লাভের হার অতি অল্প। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও অত্যন্ত সহজ। অবশ্য সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রভেদ থাকিলেও একই দেশে একই সময়ে দায়িত্ব বা পরিশ্রম ব্যতিরেকে মূলধন ব্যবহার করিলে তাহার মুনাফা প্রায় এক। আমাদের দেশে কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া অর্থ খাটান সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে বাৎসরিক শতকরা ৩।৹ টাকা সুদ পাওয়া যায়। তাহার পর ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক হারে সুদ পাওয়া যায় বটে কিন্তু ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেও সামান্য দায়িত্ব ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। কোম্পানীর কাগজের সুদের সহিত ব্যাঙ্কের সুদের হারের যে পার্থক্য তাহাই দায়িত্বের নিশানা; যে ব্যাঙ্কের সুনাম যত অল্প তাহার সুদের হারও সেই পরিমাণে অধিক। অপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে লোকসানের আশঙ্কা অধিক বলিয়াই তথায় টাকা রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। পূর্ব্বে বলিয়াছি দায়িত্ব অধিক হইলে লাভ অধিক হওয়া উচিত সুতরাং তথায় সুদের হার অধিক।

লাভের হারের পার্থক্য লাভের শেষ দুইটী উপকরণ অর্থাৎ দায়িত্ব ও

---

*Adam Smith এর মতানুযায়ী James Mill প্রভৃতি উপরোক্ত তিনটি বিভাগে "লাভ"কে ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। শেষ দুইটিকে একত্র করিয়া কিন্তু Marshall একটি পারিভাষিক নাম দিয়াছেন যথা Earnings of undertaking or Management.

পরিশ্রমের বিভিন্নতা বশতঃ সমুপস্থিত হয়। প্রথমতঃ দুইটী পৃথক্ প্রদেশ বা রাষ্ট্রের লাভের হারের বিষয় অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে রাষ্ট্রে শান্তি ও শাসনের যত অভাব সে রাষ্ট্রে লাভের হারও সেই পরিমাণে উচ্চ। ভারতবর্ষের একই ব্যবসায়ে মুসলমান আমলে যেরূপ লাভ হইত এক্ষণে সেই ব্যবসায়ে লাভের হার তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অল্প। মধ্য আসিয়ার বণিকদিগের লাভের সহিত ইয়ুরোপীয় বণিকদিগের লাভের তুলনাই হইতে পারে না। ইহার কারণ অপর কিছুই নহে। কেবল দায়িত্বের পার্থক্য, লোকসানের আশঙ্কাই ইহার একমাত্র কারণ। তাহার পর একই দেশে একই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় ব্যবসায়ের দায়িত্বের ও পরিশ্রমের বিভিন্নতা প্রযুক্ত লাভেরও বিভিন্নতা জন্মে। ভারতবাসী এ রীতি বুঝে না বা বুঝিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করে না এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া গোলামী করিয়া লাঞ্ছিত হয়। দায়িত্বের বিভিন্নতায় লাভেরও যে বিভিন্নতা জন্মে তাহা নিম্নলিখিত নিত্য পরিলক্ষিত উদাহরণদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কাপ্তেন বাবুরা শতকরা ৫০৲ টাকা অবধি সুদ দিয়া অর্থ কর্জ্জ করিয়া থাকেন। আপিসের দ্বারবানেরা, অল্পোপার্জ্জনক্ষম বিলাসপ্রিয় ফিরিঙ্গী কেরাণীদিগকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার দেয়। এ সকল ব্যাপারে লোকসানের আশঙ্কা অধিক বলিয়াই, লাভ অধিক।

তাহার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ে পরিশ্রমের বিভিন্নতা প্রযুক্ত লাভের বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। যে সকল সামান্য কারবারে ব্যবসাদারকে অশেষ প্রকার দক্ষতা ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কার্য্য চালাইতে হয় সে সকল ব্যবসায়ে লাভও অধিক। প্রকৃতপক্ষে এ লাভ মূলধনের সুদ ও কায়িক পরিশ্রমের পুরস্কার মিশ্রিত। অনেক সময় দেখিতে পাই যাহার একটী মনোহারী বা মুদীর দোকান আছে সে বহুদূর হইতে পাইকারী সওদা করিয়া মুটেভাড়া বাঁচাইবার জন্য আপন পণ্য দ্রব্য আপনি বহন করিয়া আনিতেছে। অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহার ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা লাভ আছে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই পূর্ত্ত কার্য্যের লাভের হার বেশ উচ্চ। ইঞ্জিনিয়ার বা সৌধ নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্টারগণ অপর ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করেন। তাহার কারণ অপর কিছুই নহে। কার্য্যকারীর

দক্ষতাই ইহার একমাত্র কারণ। ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার ব্যবসায়ে কেবল মূলধন খরচ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না। তাঁহার বিদ্যা ও কার্য্যশীলতাও তাঁহার সহায়তা করে। কোনও বড় পূর্ত্ত ব্যবসায়ীর নিকট চাকুরি করিলে তিনি বেশ মোটা বেতন পাইতেন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার এই কারবারে সেই বেতনের সমতুল্য আয়, মূলধনের নীট সুদ ও দায়িত্বের পুরস্কার না পাইলে তিনি কার্য্য করিবেন কেন? এই জন্যই তাহার ব্যবসায়ে এত লাভ।

উপরিউক্ত বিষয় নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝা যাইতে পারে।
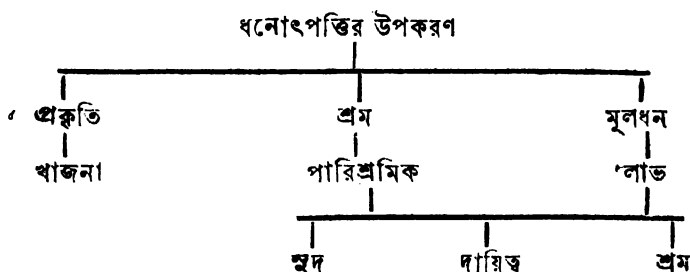
পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রত্যেক ব্যবসায়ের এমন একটি হার আছে যাহাপেক্ষা অল্পহারে কেহই তাহার অর্থ খাটাইতে রাজি হইবে না। যদ্যপি কোম্পানির কাগজের সুদ অপেক্ষা কম লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন কোনও বাতুল নাই যে এরূপ স্থলে তাহার মূলধন খাটাইতে স্বীকৃত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না কোনও ব্যবসায়ের লাভের হার এই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পহার হইতে যতগুণ ইচ্ছা অধিক হইতে পারে। কিম্বা এরূপও হইতে পারে না যে একই দেশে একই সময়ে এক ব্যবসায়ের লাভ অপর ব্যবসায় লাভ হইতে অধিক হইতে পারে। ফলতঃ সকল ব্যবসায়েরই লাভাংশ সমান হইতে চেষ্টা করে। *

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব কি কারণে একটি ব্যবসার লাভ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পহার অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। পূর্ব্বে কাম

*In all trades, profits tend to equality.

কারবার, ব্যবসা বাণিজ্য সকলই মামুলি প্রথার দ্বারা স্থিরীকৃত করিত। যদ্যপি দুইজন ব্যক্তি একটি ব্যবসায় একচেটে করিয়া লইয়া তাহা হইতে শতকরা দুইশত মুদ্রা লাভ করিত পুরাকাল হইতে প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে অপর কেহ সে ব্যবসায় করিতে পাইত না। সুতরাং মামুলি রীতির আশীর্ব্বাদে কেহ ধনকুবের হইয়া স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্প আয়াসে কমলার বরপুত্র হইয়া ঐহিক সুখের চরম করিয়া লইত অথচ তদনুরূপ যোগ্যতা বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা লইয়া হয় ত তাহার প্রতিবাসীকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত। এখন সকল বিষয়েই Competition হইয়াছে। লাভের জন্য ব্রাহ্মণ তনয়-কেও চর্ম্মব্যবসায়ী হইতে হইতেছে কাজেই এক্ষণে ওরূপ মামুলি রীতির দোহাইয়ে লাভ করা হইতে পারে না। সুতরাং যদ্যপি কোনও ব্যবসায়ে অপর ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায় তাহা হইলে সকলেই স্ব স্ব মূলধনের সাহায্যে সেইরূপ ব্যবসায় খুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই এক প্রকারের কারখানা বা দোকানে একটির স্থলে ধরুন দশটি সমুদ্ভূত হয়। তাহার পর সেই দশজনেই ইচ্ছা করে আমার কারখানার বিক্রয় অপর নয়টি কারখানা অপেক্ষা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে, আমি যদি আমার কারখানাজাত দ্রব্যের মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিই। প্রথম ব্যবসায়ী যাহা বুঝিল দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর মস্তিষ্কেও ঠিক সেই প্রকারের একটা যুক্তি আপনা আপনিই জন্মগ্রহণ করিল। সে ভাবিল আমি যদি আবার উহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ ন্যূনমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে আমার "মালের" কাট্‌তি আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক হইবে। অধিক মাল বিক্রয়েই অধিক লাভ, সুতরাং সুর না বদ্‌লাইলে এ যাত্রা ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইবে।

এইরূপে Competitionএর অনুগ্রহে উত্তরোত্তর দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইতে লাগিল। সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি প্রয়াসে তাহার বিপণীস্থিত বস্তু সমূহের মূল্য হ্রাস করিতে লাগিল। কিন্তু এই মূল্য হ্রাসের নিম্নসীমা কতদূর পর্য্যন্ত নামিতে পারে তাহা বুঝিতে পারা দুরূহ নহে। যখন সেই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পহার অপেক্ষা লভ্যাংশের হার হ্রাস হইবে তখন আর কেহ সেই ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে স্বীকৃত হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, কোনও ব্যবসায়ের লাভ সেই ব্যবসায়ের সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পহার অপেক্ষা বহুদিন অধিক থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শীঘ্রই সেই ব্যবসায়ে অধিক সংখ্যক লোকের সমাবেশ হইবে এবং ফলে লাভের হার নামিয়া আসিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি,এল্।

কবিতা-কুঞ্জ।

প্রতিশোধ।

তুমি   কাঁদ কাঁদ কাঁদ, কাঁদ দেখি সখি
আমি   হৃদয় পাষাণ করেছি।
তুমি   প্রাণভরি' কাঁদ প্লাবিয়া দু'আঁখি
আমি   অনিমিখে চেয়ে রয়েছি।
         কত শত জ্বালা দহেছে হৃদয়
আমি   কত যে বেদনা সহেছি—
তুমি   নিবারিতে নারি দেখেছ নীরবে
আমি   কত যে গো কত কেঁদেছি।
তব   হৃদয় শোণিত নীরে পরিণত
         পড়ুক ঝরিয়া ঝরিয়া—
আমি   সহাসে দেখিব কুড়া'ব সেগুলি
         পড়িব গাঁথিয়া গাঁথিয়া।
বঁধু   আমিও সহেছি তুমি ওগো সহ'
         সহিতে যে মোরা এসেছি—
তুমি   বিষাদের সুরে বাঁধ হৃদি-বীণ্
আমি   বিষাদ সাধিয়া সজেছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

তুমি।

তুমি—নভে রাকা শশী, মনোমুগ্ধকর ;
ঊষার রক্তিম-রবি,—অতীব সুন্দর।
প্রভাতের বায়ু তুমি—প্রাণ-স্নিগ্ধকর ;
কোমল-কুসুম তুমি,—সৌরভ আকর।
বিমল-কৌমুদী তুমি, শীতল কিরণ
মানস-কুমুদ ফুল্ল যাহে অনুক্ষণ।
নিশা শেষে শুকতারা পূরব গগনে,
প্রাণ ভরি' হেরি বসি মুক্ত বাতায়নে।
প্রসূনে সুবাস তুমি.—পিক কণ্ঠ স্বর।
(তুমি) চন্দ্র-তারা যুত অসীম-অম্বর।
তুমি স্নিগ্ধ পয়োধারা, সৃষ্টির পোষণ ;
প্রকৃতির চারু শোভা, প্রাণ বিমোহন।
তুমি সপ্ত-সিন্ধু-মণি কৌস্তুভ রতন,
মাধবের প্রিয়-নিধি, হৃদি-আভরণ।
শিশুমুখে হাসি তুমি, অশ্রু বিরহীর,
পবিত্র সে নেত্র-ধারা, যথা গঙ্গা-নীর।
তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান, যত সংযত যোগীর ;
কাম-কল্প-তরু তুমি সংসারী ভোগীর।
সাধনার সিদ্ধি তুমি, যা'র যা মনন,
মরণের পথে তুমি শান্তি-নিকেতন।
মনের আশ্রয় তুমি,—প্রাণের আধার,
তব শান্তিপদে নাথ ! কোটি নমস্কার।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

কবে ?

কবে কোন দিবসের শুভলগ্নে সখা
এ বিশ্বের সমতা হেরিব ?
কবে হায় ! পরমের শুভ্র জ্ঞানালোকে
প্রাণময় জগত হেরিব ?
সীমাহীন, সংখ্যাহীন কত দিনে বল
শান্ত হ'বে এ মহাপ্রয়াণ ?
বর্ত্তমান ভবিষ্যের আবর্ত্ত থামিবে
আমিত্বের হ'বে অবসান ?

সেইদিন।

সেই দিন, সেই কোন শুভদিনে সখা
এ বিশ্বের সমতা হেরিবে,
লোকময় জগতের অভিশাপে যবে
শমনের সাহানা বাজিবে ;
সীমাহীন, সংখ্যাহীন প্রয়াণের ভব—
হয়ে যাবে চির অবসান,
মায়াময় জগতের আবর্ত্ত থামিবে
আমিত্বের হইবে নির্ব্বাণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহিন্তা।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ।)

১ম বর্ষ।] ভাদ্র ১৩১১। [৭ম সংখ্যা।

লাভ।

(শেষাংশ।)

যেমন সমব্যবসায়ী সকল ব্যক্তির লাভের হার বাণিজ্যনীতির কার্য্যবশতঃ আপনা আপনি, সমান হইয়া যায়, সেই প্রকার একই সময়ে একই দেশে সকল ব্যবসার লাভের হার সমতা প্রাপ্ত হয়। আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইয়া সমান ভাবে লাভবান হই একথা প্রথম শুনিলে অত্যন্ত অসমীচীন ও আজগুবি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লাভের মাত্রা বিভিন্ন। একশত টাকা লইয়া চিকিৎসালয় খুলিলে তাহা হইতে যে লাভ পাওয়া যায় তাহার সহিত ঐ মূলধনের সাহায্যে স্থাপিত কাপড়ের দোকানের লাভের সহিত তুলনা হইতে পারে না। আবার পল্লীবাসী মনোহারীর দোকানের অধিপতির লাভের হার সহরের ঐ শ্রেণীর ব্যবসাজীবির লাভের হার অপেক্ষা বহু গুণ অধিক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং একই দেশে একই সময়ে সকল ব্যবসায়ের লাভের হার আপনা আপনি সমান হইয়া যায়—আদম্ স্মিথ প্রমুখ ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞদিগের এই ধারণা নির্ভুল ও সত্য বলিয়া সহজে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

কিন্তু লাভের বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা স্মরণ থাকিলে এ নীতিটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সারগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত পক্ষে, মূলধনের সুদ বা টাকার "ব্যাজ"কেই লাভ বলা যাইতে পারে। আমরা কিন্তু লাভ অর্থে দায়িত্ব * ও মুলধন অধিকারীর পারিশ্রমিক ও বুঝি। শেষোক্ত উপকরণ দুইটির বিভিন্নতা বশতঃই ভিন্ন ভিন্ন কারবারে লাভাংশ বিভিন্ন হয়। এই দুইটী উপকরণ ছাড়িয়া দিলে মূলধন ব্যবহার জন্য যে অধিক ধন পাওয়া যায় তাহাই সকল ব্যবসায়ে সমতা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে। প্রকৃত মূলধনের সুদ চিকিৎসালয় হইতেও যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা কাপড়ের দোকান বা পাটের আড়ৎ হইতেও ঠিক ঐ পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তবে কোন কোন ব্যবসায়ে অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় ও অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সে ব্যবসায়ের গ্রোস্ বা মোট্ লাভের হার অধিক।

প্রত্যেক সমাজে এইরূপ সকল ব্যবসায়ের লাভের হারের পার্থক্য কি কারণে লোপ পাইয়া যায় তাহা অল্প চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি competition আধুনিক বাণিজ্য জগতের সাম্য স্থাপনের প্রধান সহায়। মনে করুন কোনও প্রদেশে তণ্ডুল ব্যবসায় হইতে শতকরা দশ টাকা হিসাবে লাভ পাওয়া যায় কিন্তু সেই প্রদেশেই অপরাপর ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইলে তাহা হইতে যে লাভ পাওয়া যায় তাহা উহার অর্দ্ধেক মাত্র। অবশ্য স্বার্থলোলুপ অধিক লাভপ্রয়াসী মনুষ্যের নিকট তণ্ডুল ব্যবসায়ের উচ্চ লাভহারের কথা বহুদিন অবিদিত থাকিতে পারিবে না। তখন সকলেই বুঝিবে—চাউল ব্যবসায়ী হইতে পারিলেই অর্থদৈন্যের বহুল পরিমাণে উপশম হইবে। এ ব্যবসা বড়ই লাভের। তবে কেন অন্য ব্যবসায়ে টাকা বদ্ধ করিয়া রাখিয়া মিছামিছি খাটিয়া মরি। একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি চাউলের কারবার করিয়া যদ্যপি কমলার কৃপা কটাক্ষ পাইতে পারি।

* এই দায়িত্বকে Prof Marshall *Trade Risks* এবং *Personal Risks* এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রকার গবেশনার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সমাজের অনেক লোকই তণ্ডুল ব্যবসায়ী হইয়া উঠিবে। তখন আবার অনেকে দেখিবে দশ টাকা লাভে চাউল বিক্রয় করিলে যগুপি মাসিক শতমন বিক্রয় হয়, নয় টাকা হিসাবে বে চলে বিক্রয়ের পরিমাণ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইবে, কারণ সুলভ মুল্যে সামগ্রী পাইলে কেহ আর একই দ্রব্য দুর্লভ মুল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইবে না। এইরূপ পরস্পরের কম্‌পিটিসনের দ্বারা চাউল ব্যবসায়ের লাভের হার ঠিক শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য সুদের হার স্বাভাবিক ও সেই দেশ প্রচলিত অবস্থায় লইয়া আসিতে হইলে যে অপর ব্যবসায় হইতে মূলধন উঠাইয়া লইয়া আসিয়া সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই এবং সাধারণতঃ এইরূপ কার্য্যতও হয় না। প্রত্যেক দেশে অব্যবহৃত মূলধন অনেকেরই হস্তে পড়িয়া থাকে। যে কেহ কোনও প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় তাহারই সেই সঞ্চিত অর্থ ব্যবহারের জন্য একটা প্রয়াস মনোমধ্যে জাগরিত থাকে। সুতরাং এই প্রকার কোনও ব্যবসায়ের লাভ অপরাপর ব্যবসার লাভ হইতে অধিক হইলে এই অব্যবহৃত মূলধন সেই ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারাই উপরোক্ত স্বাভাবিক অবস্থাটি ঘটিয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিট্ লাভ বা মূলধন ব্যবহারের জন্য সুদের অবস্থা উক্ত প্রকারে সাম্যভাব ধারণ করে। গ্রোস বা মোট লাভ কোনও দুইটি ব্যবসায়ে এক হইতে পারে না। কোনও কারবারের লাভকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে ঠিক "টাকার ব্যাজ" সকল কারবারে সমান। কিন্তু গ্রোস্ লাভের হার সকল ব্যবসায়ে বিভিন্ন। সমবয়স্ক বা সম আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি ব্যক্তির শারীরিক বল সমান বলিলে যেমন অসত্য ও হাস্যাস্পদ কথা বলা হয় সেই প্রকার সমান মূলধন হইতে সমান গ্রোস্ লাভ পাওয়া যায় একথা বলিলেও অন্তঃসারবিহীন হাস্যাস্পদ একটি নীতি বর্ণনা করা হয়। এমন কি প্রত্যেক দোকানের লাভের হার তাহার পরিচালকের বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, সততা প্রভৃতি অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। তাহার পর আধুনিক জগতে competitionএর প্রাদুর্ভাব থাকিলেও এখনও লোকে

পুরাতন রীতির উপর কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে, সুতরাং নিট লাভের হার সকল ব্যবসায়ে ঠিক 'পাই পয়সা' অবধি সমান হইতে পারে না; তবে মোটের উপর নিট লভ্যের হারের বিভিন্নতা আপনা আপনি লোপ পাইতে চেষ্টা করে। এই হারকেই আমরা লাভের সাধারণ হার বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।*

সাধারণতঃ লোকবিশ্বাস প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্যের উপর লাভের সাধারণ হার নির্ভর করে। সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে লাভের হার অধিক হয় এবং কোনও দ্রব্যের বিনিময় মূল্য স্বল্প হইলে প্রস্তুতকারী ব্যবসাদারের লাভের হার কুঞ্চিত হয়। আমরা সচরাচর মনে করি খরিদদার না থাকিলে কেহও ধনোৎপাদন দ্বারা লাভবান হইতে পারিত না। আমাদের শিল্পজাত বস্তুগুলি বাজারে বিক্রীত হয় বলিয়াই আমরা লাভ করিতে পারি।

যে কেহ প্রকৃত পক্ষে লাভের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে সেই বুঝিতে পারিবে উপরি উক্ত ধারণা অজ্ঞতা পরিচায়ক। যদ্যপি এক মণ ধান্য ব্যবহার করিয়া দুইমণ ধান্য উৎপাদন করিতে পারি তাহা হইলে যে একমণ ধান্য অধিক প্রাপ্ত হই তাহাই লাভ। সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিলে তাহার সাহায্যে যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহা হইতে সেই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাদ দিলে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই লাভ বলা যায়। ইহাই লাভের প্রকৃত অর্থ।

যদ্যপি পৃথিবীতে দ্রব্য বিনিময় না রহিত, মানব সমাজের সভ্যতা ও পরস্পর সহায়তার প্রধান কারণ শ্রমবিভাগ যদ্যপি মনুষ্য মধ্যে বিরল থাকিত তাহা হইলে ক্রেতা বা বিক্রেতার অস্তিত্ব থাকিত না। বন্য পশু যেমন তাহার সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু আপনি সংগ্রহ করে মনুষ্যকে যদ্যপি সেই প্রকার সকল দ্রব্য আপনাকে সংগ্রহ করিতে হইত তাহা হইলেও লাভ লোপ পাইত না। আপন আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যবহৃত পূর্ব্ব প্রস্তুত দ্রব্য বাদ দিয়া আমাদিগের উৎপাদিত ধনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাই আমাদিগের লাভ হইত এবং আমাদের পরস্পরের শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতির বিভিন্নতা বশতঃ আমাদের লাভেরও বিভিন্নতা হইত। সুতরাং

* ইহাকে পূর্ব্বতন অর্থনীতিজ্ঞেরা General rate of profit বলিতেন Marshall প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞেরা ইহাকে Normal rate of profit বলেন।

শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার উপরই লাভ লোকসান নির্ভর করে, তাহা ক্রয় বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে না ।

অতএব বুঝা যাইতেছে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিই লাভের কারণ। শ্রমের সাফল্যের উপরই লাভ নির্ভর করে। অবশ্য শ্রম অর্থে কায়িক ও দক্ষ শ্রম * উভয় প্রকার শ্রমকেই বুঝায়। যদ্যপি কোনও প্রদেশের শ্রমজীবিরা তাহাদিগের পারিশ্রমিকে যে ধন ব্যয় হয় তাহা অপেক্ষা শতকরা দশ মাত্রা অধিক উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে শতকরা দশটাকা লাভের হার হইবে ।

সুতরাং ধনোৎপাদক শ্রম ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তাহার উপরই লাভের স্বল্পতা বা আধিক্য নির্ভর করে। যদ্যপি ধনোৎপাদক অল্প ব্যয়ে দক্ষ শ্রম পাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার লাভ অধিক হইবে। আর বস্তুতঃ মূলধন খরচ অর্থে শ্রম ক্রয় করিবার খরচ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। দ্রব্য প্রস্তুত জন্য যাহা কিছু মূলধন ব্যবহার হয় তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে মূলধন ব্যবহার অর্থে শ্রম ক্রয় করিবার মূল্য। জমির খাজানা ধনোৎপত্তির খরচার অন্তর্ভূত হয় না। † দ্রব্য প্রস্তুত জন্য যে সকল যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় তাহাও অপরের পরিশ্রম জাত। সুতরাং মূলধন সাহায্যে যন্ত্র খরিদ অর্থে সেই শ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ করা বুঝায় ।

এস্থলে বলিয়া রাখি শ্রমের মূল্য এবং পারিশ্রমিক দুইটি বিভিন্ন ধারণা। সামগ্রী প্রস্তুত করিতে মহাজনের যে ব্যয় হয় তাহাই শ্রমের মূল্য। পারিশ্রমিক অর্থে শ্রমজীবির আয়। পারিশ্রমিক অধিক বা অল্প হইলেই যে শ্রমমূল্য অধিক বা অল্প হইবে এমন কোনও কারণ নাই। অস্মদ্দেশে দুই একটি জেলায় এক টাকায় পাঁচ ছয়টি মজুর পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের সময় ধূমপানে, আলস্যে ও কলহেই অতিবাহিত হয়। তাহাদিগকে

* Skilled and unskilled labour.

† এ বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিব। Rent is not an element in the cost of production ইহা অর্থনীতির একটি প্রধান প্রতিজ্ঞা। Ricardo এই নীতি বাহির করেন।

নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মনিব বিশেষ কোনও সুবিধা পায় না। এইরূপ পাঁচটি মজুরে যে কার্য্য করিবে অপর জেলার দুইটি মজুরেই ঠিক সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রথম স্থলে পারিশ্রমিক অল্প বটে কিন্তু মহাজনের পক্ষে শ্রমের মূল্য সমান। সুতরাং পারিশ্রমিক অল্প হইলেই শ্রমের মূল্য অল্প হয় না।

আবার শ্রমের মূল্য স্বল্প হইলে যে প্রকৃত পারিশ্রমিক বা শ্রমকারীর উপার্জ্জন অল্প হইবে এমত কোনও কারণ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে লাভের হার দুই প্রকারে হিসাব করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে দেখা যাইতে পারে এই কালমধ্যে মূলধন অপেক্ষা কিরূপ পরিমাণে অধিক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এবং দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতে পারে প্রত্যেক বার মূলধন ঘুরিয়া আসিলে তাহা হতে কত লাভ হয়। * মনে করুন এক ব্যক্তির ব্যবসার মূলধন মোট ৫০০ টাকা। সে এই পাঁচ শত মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য তিন মাসে সমুদয় বিক্রয় করিয়া আবার পুনরায় বিক্রয়ের মুদ্রা হইতে ৫০০৲ কারবারে খাটাইতে পারে। এই রূপে সে ঐ ৫০০৲ টাকা এক বৎসর মধ্যে চারিবার খাটাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং এক বৎসরে সে দুই সহস্র মুদ্রার কার্য্য করিবে। এই কারণে প্রত্যেকবার সামান্য লাভ ও মূলধনকে ঘুরাইবার চেষ্টা করা বিধেয়।

মহাজন বা বৃহৎ ব্যবসায়ীর পক্ষেও উপরোক্ত নীতি সকল যেরূপ ব্যবহার্য্য সামান্য ব্যবসায়ীর পক্ষেও এগুলি সেইরূপ উপদেশমূলক। প্রত্যেক ব্যবসাদারের একথা স্মরণ করা উচিত তাহার ব্যবসার লাভ তাহার পণ্য দ্রব্যের উৎপত্তির খরচের স্বল্পতার উপর নির্ভর করে সুতরাং ব্যবসাদারের মিতব্যয়িতা ব্যতীত তাহার কারবারের উন্নতি আশা করা অবিধেয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্।

---

* ইংরাজীতে এই দুই প্রকার হিসাবকে যথাক্রমে profit per annum এবং profit per turnover বলে।

পল্লীগ্রামে একদিন।

রবিবার সকালে বন্ধু নরেন্দ্রনাথ বলিল "রমেশ! চল হে, আজ একবার তোমাদের দেশে যাওয়া যাক। রবিবারটা দুপুর বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়ে বৈকালে বিডন গার্ডেনের গণ্ডীর ভিতর ঘুরে বেড়ানর চেয়ে পল্লীগ্রামের খোলা হাওয়া পেলে শরীরে অনেকটা স্ফূর্ত্তি পাওয়া যাবে, আর অনেকদিন হতে তোমাদের দেশটা দেখিবার ইচ্ছা আছে।"

আমার মনেও ঐ ইচ্ছা উঠ্‌ছিল, আমি দ্বিরুক্তি না করে দুইটার ট্রেনে যাবার কথা স্থির করে ফেল্‌লুম।

বেলা ৪টার সময় দেশে পৌঁছিলাম। সেখানকার বাটীতে আমাদের কেহই থাকিতেন না। ইদানীং আপিষের চাকরী আর ইংরাজী পড়ার অনুরোধে, আমাদের সপরিবারে কলিকাতাতেই থাকিতে হইত। তবে কুলবিগ্রহ রঘুনাথ জিউর দৈনন্দিন সেবা নির্ব্বাহের জন্য একজন সৎবংশীয়া বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোককে রাখা হইয়াছিল আর আমাদের মামুলি সর্দ্দার বংশের বংশধর রসিক সর্দ্দার বাটী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাত্রে তথায় শয়ন করিত।

কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইতেছি, এমন সময় পুরোহিত বাটী হইতে আমাদের জলযোগ এবং রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। দুই বন্ধুতে ফিটফাট হইয়া জলযোগ করিতে চলিলাম। রাস্তায় স্ত্রী পুরুষ যাহার সহিত দেখা হইল সকলকেই ইস্তক কর্ত্তা নাগাৎ দাদার আতুরের ছেলেটীর পর্য্যন্ত health report দাখিল করিতে হইল। বামুন আয়ি সামনে বসিয়া পাকা আম, কাটাল, কচি শশা আকণ্ঠ খাওয়াইয়া ছাড়িলেন। আমরা দেশবাস একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া কত দুঃখ করিলেন। ঠাকুদ্দার আমলে আমাদের বাটী কি রকম সরগরম ছিল বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন,পাল পার্ব্বনের ত কথাই নাই,মায় বাবার বিবাহের সময় ব্রাহ্মণদিগকে কত দক্ষিণা এবং কত ভরি রূপার সন্তাষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও বলিয়া দিলেন। আসিবার সময় দুঃখ করিয়া বলিলেন "বাবা রাত্রে তোমাদের খাবার কষ্ট হবে, আজ মা মনসার পালনি, মাছ খেতে নাই।"

রাস্তায় আসিয়া নরেন্দ্রকে বলিলাম "ভাই বেশ সময়েই এসে পড়া গেছে,চল

মা মনসার মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক। আজ মনসা পূজা। গ্রামের হাড়ী, বাগ্দী, ছুলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর চাষী লোকের মস্ত পার্ব্বনের দিন। প্রত্যেক বৎসরেই বর্ষার প্রথমে মহা সমারোহে এই পূজা হইয়া থাকে। মাঠে জলে কাদায়, তাদের রাত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয় আর পল্লীগ্রামে সাপের উৎপাত ত কম নয়। সেই ভয় নিবারণের নিমিত্তই মনসা দেবীর পূজা করিয়া তাহারা আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

নরেন্দ্রকে ঘোষেদের বাটী, বোসেদের বাটী, সেনেদের পুকুর, গ্রামের পোষ্টাপিষ, স্কুল প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে মনসাদেবীর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। পূজা প্রাঙ্গন তখন সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। রামা দোকানীরা তিন ভায়েই মহাব্যস্ত। তাদের আজ ভারী মরসুম। গুড় পিটে, ফুলরি, বেগুনি ভাজিয়া কুলাইতে পারিতেছে না। এক পাল ছেলে পয়সা হাতে করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে গরম তেলের কড়ায়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং সকলেই অগ্রে পাইবার জন্য উমেদারি লাগাইয়াছে। হরিখুড়ো মহা তুখোড় লোক। গ্রামে কোন একটা মেলা পার্ব্বন হলে কিছু রোজগার না করে যে ছাড়বেন তিনি এমন পাত্র নন। একখানা চিনেমাটির শানকির উপর পাশার মতন ছোট দাগকাটা ঘুটি ঘুরিয়ে দিয়ে একটা বাটী চাপা দিচ্চেন। সামনে একখানা ছক পাতা আছে তাতে কতকগুলা নম্বর ওয়ারি ঘর কাটা আছে দেশের যত খেলুড়ে ছোকরা গম্ভীর ভাবে যার যে ঘরে ইচ্ছা পয়সা রাখছে। যদি বাটীর ভিতর ঘুটিটি সেই নম্বরে পড়ে, তবে সে খেলার নিয়ম মত এক পয়সা স্থলে ৪।৫ পয়সা লাভ করিয়া থাকে নতুবা পয়সাটী হরিখুড়োর প্রাপ্য হয়। খেলায় লাভের এতটা আশা থাকিলেও শেষে কিন্তু তাহাদের কিছু লোকসান এবং হরিখুড়োর কিছু লভ্য হইয়াই থাকে।

কৃষক বধূ ও কন্যারা নানা রঙ্গের চিত্র বিচিত্র কোরা সাড়ী পরিয়া, মাথায় এক মাথা তেল মাখিয়া পূজা দেখিতে আসিয়াছে। তাহারাত বটি, খোন্তা, টিনের বাক্স, পুঁতি পুতুলের দোকানে আর কাহারও প্রবেশ করিবার তিলার্দ্ধ স্থান রাখে নাই। জিনিষ পছন্দ এবং দাম দস্তুর খুব চলিয়াছে। নরেন্দ্র ভায়া দেখি তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কিহে ভায়া একেবারে তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছ?"

নরেন্দ্র বলিল "ভাই কৃষক রমণীদের সুস্থ সবল দেহের গঠন এবং সন্তোষ পূর্ণ সরল মুখচ্ছবি, বাস্তবিক বড়ই আনন্দপ্রদ। সহরের নিষ্প্রভ, মূর্চ্ছা আক্রান্তা, পাউডার-রঞ্জিতা বিদূষী যুবতীদের অপেক্ষা ইহারা কত উজ্জ্বল। উহাদের হৃষ্ট পুষ্ট গঠনে স্বাস্থ্য ও সন্তোষের চিহ্ন কেমন ফুটিয়া রহিয়াছে।"

এমন সময় ঢাকের বাজনায় নানা রূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতে নাচিতে একদল ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা মনসা দেবীর ভোগ দেখিতে গিয়াছিল। কালি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কপালে সিন্দুরের ফোটা কাটিয়া দিব্য সুগোল দেহ খানি ফুলের মালায় সুশোভিত করিয়া দেবীর ভোগের প্রসাদ হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া ছেলের দল মধুপানেচ্ছু মক্ষিকাকুলবৎ প্রসাদের আশায় চতুঃপার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি সকলকে এক একটী সন্দেশ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। শুনাযায়, দেবীর ভোগের সময় নানারূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য বাটীর একটী রুদ্ধকক্ষে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভোগ নিবেদন করা হইলে পর নাকি এক ভয়ানক সর্প আসিয়া তাহা দর্শন করিয়া যায়। কৃষকদের বিশ্বাস মনসাদেবী স্বয়ং এইরূপে অবতীর্ণা হইয়া ভক্তমণ্ডলীর পূজার আয়োজন দেখিয়া যান। দলের মধ্যে সপুত্র রসিক সর্দ্দার বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেদের পূজা দেখিবার জন্য কিছু কিছু পয়সা দিলাম। তাহারা আনন্দে ফুলরির দোকানে ছুটিয়া গেল।

নরেন্দ্র বলিল "ভাই রমেশ চল আমরা একটু ঘুরিয়া আসি। কামিজ আঁটা সিগারেটসেবী সহুরে জীব দুটীকে দেখিয়া তোমাদের সরল সন্তুষ্ট চাষী-দের কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। তাহারা তেমন প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারিতেছে না। বৎসরের আনন্দের দিন, এরূপ ভাবে বিঘ্ন করা আমাদের উচিত নহে।

দুই জনে মাঠের দিকে বেড়াইতে যাইলাম। নরেন্দ্রনাথকে বলিলাম "পূর্ব্বে এই পূজায় অনেক ধূমধাম হইত। নানাদেশ হইতে বেদেরা আসিয়া নানা প্রকার সর্পের কৌতুক দেখাইত, যাত্রা হইত। সং হইত। ক্রমশঃ সে সব লোপ পাইতেছে। দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, কৃষক মণ্ডলীকে একেবারে অধম করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের আর তেমন স্ফূর্ত্তি নাই। আর কয়

বৎসরও প্রকৃতিদেবী বিশেষরূপ বিমুখ। ধান্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না। ইংরাজরাজের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারের ফলে বিলাসিতাও ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছে। বিলাতি আলোয়ান, গেঞ্জি ও সিগরেটে উহাদের বহুশ্রমলব্ধ অর্থের বিলক্ষণ লাঘব ঘটাইতেছে। বেশীদিনের কথা নয়, উহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি এখন তাহার কিছুই নাই। রসিক সর্দ্দারের খুড়া ফ্যালারাম একটা প্রকাণ্ড ঢেঁকির আঁকৃসি গলায় দিয়া অনায়াসে অনেকক্ষণ ঘুরাইতে পারিত এবং ক্রীড়া কর্ম্মের বাটীতে চোব্য চোষ্য আহারের পর /৫ /৬ সের পায়সান্ন অক্লেশে উদরসাৎ করিত।

কথা কহিতে কহিতে গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের ধারে আসিয়া পড়িলাম। তখন সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব ছিল। হরিদ্বর্ণের কচি কচি ধান্যের শীষ গুলি বাতাসে নাচিয়া নাচিয়া স্বভাবের অতুল শোভা দেখাইতেছিল। বাতাস সন্ সন্ করিয়া যেন বলিতেছিল "কিহে সহরের বাবুরা এমন প্রাণমাতান শোভা কি তথায় কোথাও দেখিয়াছ? দক্ষ শিল্পী, উর্ব্বর মস্তিষ্ক নৈপুণ্য বিশারদেরা কি এরূপ দৃশ্য দেখাইতে পারে? নরেন্দ্রনাথ কিয়দ্দূরে এক প্রকাণ্ড ভগ্ন মঠ দেখাইয়া বলিল "ভাই রমেশ! ওখানে কি ছিল? ধ্বংসাবশেষগুলি পূর্ব্ব সম্পদের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি বলিলাম "ঐ স্থানের বিষয়ে এক সুন্দর শিক্ষাপ্রদ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখনই তোমাকে বলিব মনে করিতেছিলাম, তাহা তুমি আমায় অগ্রেই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। বাস্তবিক এরূপ দরিদ্র ইষ্টকালয় বিরল গ্রামে, ঐ প্রকারের একটি প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ, যে সাধারণের নেত্রাকর্ষণ করিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে দৌলতরায় নামে একজন ধনবান এবং প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। এ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ গ্রামই তাঁহার তালুক ভুক্ত ছিল। শুনা যায় তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। প্রত্যহ প্রাতে মাতার পদধূলি না লইয়া তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। জননীর মৃত্যু হইলে মহা সমারোহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তাঁহার স্মরণার্থে ঐ স্থানে সপ্তমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবস্থাপনা করেন। উৎসবের দিন অগণিত ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত দিন ধনদান করিয়া, নানা দিগ্দেশাগত ভিক্ষুকগণকে

পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, অপরাহ্নে তাঁহার মনে বিলক্ষণ আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হইল। সমাগত বন্ধুবান্ধবকে বলিলেন "বোধ হয় আজ আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর ঋণ শোধ করিতে পারিলাম।" কথা শেষ হইবামাত্র সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাঁহার তত আয়াসের সুন্দর মন্দির হঠাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইতেছে, দৌলতরায় তখন গলবস্ত্র হইয়া দারুণ মর্ম্মাঘাতে ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মা! মা! অবোধ সন্তানকে ক্ষমা কর। মূর্খ দাম্ভিক আমি, তাই তোমার দয়ার, তোমার করুণার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই, তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার আশা করি। পৃথিবীতে কত অপরাধ হাস্যমুখে উপেক্ষা করিয়াছ আজ স্বর্গে বসিয়া অধমকে ভুলিও না"। তাহার পর মন্দিরগুলি ঐ অবস্থায় থাকিয়া যায়। অনেকে তাঁহাকে উহার সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহাদের কথায় তিনি কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিলেন "না না উহা ঐ অবস্থাতেই থাকুক্। শতধা বিদীর্ণ অভিশপ্ত দেহ লইয়া আজীবন ঐখানে সাক্ষ্য দিবে, একজন নরাধম প্রগল্‌ভ মাতার ঋণ তুলনা করিতে গিয়াছিল আর তাহার ফল জগৎ, ঘৃণার হাসি হাসিয়া, বহুদিন ধরিয়া দেখিবে।"

নরেন্দ্র মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতেছিল। সে বলিল "সত্যই হউক আর উপকথাই হউক, ঐ মঠের ধ্বংসস্তূপের সহিত একটী সুন্দর, মহৎ এবং শিক্ষাপ্রদ কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।"

সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া আমরা বাটী ফিরিলাম। একে পল্লীগ্রাম তায় আবার বর্ষা। সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিতে সাহস হইল না। ফিরিবার সময় দেখি মনসা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে চাষীদের এমেচার যাত্রার দলের আসর পড়িয়াছে। আজ মনসার ভাসান গাওনা হইবে। দুইজনেরই একটু শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিছুক্ষণ থাকিয়া যাইবার মনস্থ করিলাম। নবশাকের ব্রাহ্মণ শশী বাড়ুয্যে তাহাদের অধিকারী। তাঁহাকে ডাকিয়া পালার ব্যাপার শুনিয়া লইলাম। মনসা দেবী কি প্রকারে ধরাধামে আপনার পূজা প্রবর্ত্তিত করেন, চাঁদসওদাগর তাঁহাকে পূজা প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল, মনসার কোপানলে তদীয় পুত্র নখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু। সতী সাধ্বী পত্নী বেহুলার স্তবস্তুতিতে মনসার বরে নখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ,

চাঁদের মত পরিবর্ত্তন ও মনসা দেবীর পূজা ধরাধামে প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় গাওনা হইবে। প্রথমে গণেশ বন্দনা, শিব বন্দনা, দুর্গা বন্দনা প্রভৃতি নানা তালে, নানা সুরে গীত হইলে পর, চাঁদ, বেহুলা, মনসা প্রভৃতির বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অধিকারী মহাশয় খাতা খুলিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন এবং অভিনয়ের যে স্থলে একটু বিশেষ করুণ কিংবা বীররসের অবতারণা আছে সেখানে তিনি অভিনেতাকে হাত নাড়িয়া থামিতে বলিয়া নিজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ফলতঃ, দেখা গেল এক একটা সাক্ষী খাড়া রাখিয়া তিনিই মহা উৎসাহে নখিন্দর, চাঁদ মনসা প্রভৃতির সকলেরই অংশ অভিনয় করিতেছেন। তাহাদের সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া টানাসুরে বক্তৃতা করিতেছে শুনিয়া আমরা অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলাম। গাওনা আরও চমৎকার। অধিকারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক একজন গায়েনের গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন এবং কাণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে গানের মহড়া ধরাইয়া দিতেছেন। অনেক সমজদার ব্যক্তি গান শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতেছেন, বাহবা দিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের একটা কথাও বুঝিয়া উঠিবার সাধ্য হইল না। একদল কাঠুরিয়া অভিনেতার কাঠ কাটিবার ভঙ্গিতে নৃত্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। দেখিলাম, যে ছোকরাটী বেহুলা সাজিয়াছিল সে তাহার নবীন গোঁফ জোড়াটীর মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই।

রাত্র অধিক হওয়ায় আর থাকিতে পারিলাম না। দুইজনে বাটীরদিকে ফিরিলাম। তখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে পল্লীখানি হাসিয়া উঠিয়াছিল, নির্জ্জন গ্রাম্যপথ দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পশ্চাতে দলবদ্ধ গ্রামবাসীদের উন্মুক্ত হাস্যধ্বনি, আনন্দ কোলাহল এবং সঙ্গীতের রব নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পবনে পবনে ধ্বনিত হইতেছিল।

শক্তি কোথায় ?

মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। মানসিক উন্নতি বলিলে শুধু দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি বুঝায় না, সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরবও ইহার অন্তর্গত। জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে হইলে সাহস ও বীরত্ব ব্যতীত এ মহান্ গৌরব রক্ষা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। কারণ সাহস ও বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা অথবা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাহার বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ।

স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক, বনবিহঙ্গ প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এজগতে এমত কোনও বস্তু নাই, যাহার উন্নতি জনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। যাহারা নিজের সাম্রাজ্যের ভিতর নিশ্চিন্ত মনে, নির্ব্বিরোধে ও স্বাধীনতায় থাকিতে চায়,—লোভপরতন্ত্র হইয়া অন্যের সর্ব্বস্ব গ্রাসের আয়োজন করে না অথবা সেই লোভের মমতা ও তাহাদের স্বীয় স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে পারে না। স্বচ্ছন্দচারী তিব্বতীয়েরাই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত করিয়া তুহিন মণ্ডিত শুভ্র হিমগিরি শিখর এখনও ইহারা রঞ্জিত করিতেছে। অপর, যাহারা চিত্তের অত্যুৎকর্ষতা লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগ প্রবাহের জন্য প্রতিপদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় তাহারা মহাপরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়, মানসিকবলের ভীষণ প্রবাহে তাহাদিগকে ভাসাইবার চেষ্টা করে। ইহার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ বর্ত্তমান জাপানের দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও অদ্ভুত জয়লাভ। কিন্তু যে দেশে যখনই অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক উন্নতির হ্রাস হইয়াছে তখনই তাহার ধ্বংস হইয়াছে। এই মানসিক উন্নতির অভাবেই ভারতের এমন অধঃপতন।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্টসিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ বলেন ইহার একমাত্র মূল দৈহিক বল। একথা অগ্রাহ্য, দৈহিক বল আংশিক বটে, অভীষ্ট

সিদ্ধির একমাত্র মূল কখনই হইতে পারে না। কারণ সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। বাসনা শারীরিক বলে নহে, ইহা মানসিক তেজ। তেজের দ্বারা বাসনার কতকটা পরিমাণ হয়। স্বাধীনতায় এবং চিত্তের উৎকর্ষতায় তেজের অস্তিত্ব। শারীরিক বল অর্থাৎ গায়ের জোরের সঙ্গে তেজের সম্পর্ক কিছু কম। কারণ সাঁওতালের মধ্যে যে তেজ দেখিতে পাওয়া যায় হতভাগ্য বঙ্গ সন্তানের মধ্যে তাহা লক্ষিত হয় না। আবার বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে যে তেজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে সবলকায় হিন্দুস্থানীতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ বাসনার মূল অনুন্নত সমাজে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষতার অভাব বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্ব্ব সময়েই মানসিক উৎকর্ষতা। এই উন্নতি যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশল ও তদনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করে। যেস্থলে বাসনা, কৌশল এবং শারীরিক বল একত্র সমাবেশ সেস্থলের উন্নতি সর্ব্বতোমুখীন্ হইয়া থাকে। তদ্ভাবে যেখানে কৌশল ও বাসনা সেখানেও বিজয় লক্ষ্মী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধম কৌশল একত্রে সমাবেশ হইলেও উন্নত কৌশল ও প্রবল বাসনার ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে।

যখন কোর্টেস্ কেবল চারি শত পদাতি ও পনেরটি অশ্ব লইয়া লাসকালয়ে (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলের সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও প্রচণ্ড সাহস ও বীরত্ব সহ বারম্বার স্বদেশ রক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধিনায়ক জিকো-টিঙ্কাটল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, যুদ্ধামোদিতা ও স্বদেশ-প্রিয়তা দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অর্দ্ধ লক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। কোর্টেসের এমন অভাবনীয় জয়লাভের মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষতা জনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল।

বর্ত্তমান রুশ-জাপ সমরে জাপানের জয়লাভের মূলও এই প্রবলা তেজপূর্ণ বাসনা এবং রণকৌশল। এই জন্য বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট রুশিয়া সৈনিকমণ্ডলী অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র অতি অল্প সংখ্যক জাপ-সেনার নিকট পদে পদে পরাজিত, বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

রাঠোর-বালক।

চতুর্থ সর্গ।

নিশায় রাঠোর দুর্গে একটী সৈনিক—
নাহি শয্যার উপর—কেহবা কৃপাণ
শাণাইছে মহোল্লাসে—কেহ চর্ম্ম বর্ম্ম
নির্ব্বাচিছে মনোমত; গম্ভীরে দামামা
বাজাইছে কোন বীর, কেহ শৃঙ্গনাদে
উৎসাহিছে বন্ধুবর্গে। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে
শুনাইছে বীর গাথা প্রবীণ চারণ—
বহিছে উন্মত্ত রক্ত সৈনিক শিরায়—
কতক্ষণে ম্লেচ্ছগণ করে আক্রমণ
দুর্গমূলে বহাইবে পাপরক্ত নদী।

হেথায় চন্দন লয়ে, বৃদ্ধ যোদ্ধা যত
প্রাকারে প্রাকারে নির্ম্মিতেছে দৃঢ় ব্যূহ—
পুরোভাগে স্থাপিতেছে দক্ষ সেনাগণ
সমরেতে সুনিপুণ সাহসী ভীষণ
ধনুধারী কৃতকর্ম্মা মাউলি সৈনিক—
রহিয়াছে দলে দলে হেথায় সেথায়
দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া স্থির অবিচল
নিজ নিজ ইষ্টদেবে হৃদয়েতে স্মরি—
ভীষণ কর্ত্তব্যপথে রাজপুত দল
হৃদে ধর্ম্ম, হস্তে বল, নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

সৈন্য সজ্জা সমাপিয়া চলিলা চন্দন
আপন প্রকোষ্ঠ মধ্যে। পিতৃদত্ত অসি
ভক্তিভরে কটিমূলে করিয়া বন্ধন

সযত্নে পরিলা শিরে রতন উষ্ণীষ;
প্রণমিয়া বীরগণে ষাষ্টাঙ্গ ভূতলে
উঠিলেন দৃষ্টিমঞ্চে দুর্গের উপর—
অগাধ সাগর সম শত্রুসেনাচয়
আসিতেছে কলরবে। আলোকে আলোকে
চারিধার আলোকিত। তুরী ভেরী রব
উছলিছে মহাসিন্ধু সজীব চঞ্চল।

দেখিলেন অপার এ সৈনিক বারিধি
অনন্তে মিলিয়া আছে সুদূর উত্তরে
সেনার উপর সেনা তারপর সেনা—
অগাধ অপরিমেয় অনাদি অনন্ত—
উপত্যকা, শৃঙ্গ, নদী করেছে আবৃত
যেন এক নভঃব্যাপী বৈশাখের মেঘ
ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিয়া দামিনী ঝলক
গুরু গুরু গরজনে সর্ব্বদেশ এসি—
আসিতেছে মদমত্ত আপনার বলে
প্রসারিয়া কৃষ্ণকায়া ব্যাদানি বদন।

চন্দ্রালোকে সে নিশীথে যবনীয় চমূ
সুসজ্জিত পরিচ্ছদে শ্বেত, রক্ত, পীত—
নীরব বাসন্তী নিশি করিয়া প্লাবিত—
হস্তী অশ্ব পদ শব্দে সম পদক্ষেপে
কি এক মদিরা মোহ ব্যাপিয়া চৌদিক—
ধীরে ধীরে আসিতেছে দুর্গ অভিমুখে;
মাঝে মাঝে যোদ্ধা শিরে সুবর্ণ কিরীটি
ঝক্‌মকি উঠিতেছে চন্দ্রের আলোকে
দিল্লীর সে ধনগর্ব্ব ঘোষিছে জগতে
অচিন্ত্য অশ্রুত পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের রাশি।

"বীরগণ" উচ্চকণ্ঠে কহিলা চন্দন
"দেখ চাহি অগ্রে তব দিল্লি সেনাদল—
আসিছে ঐশ্বর্য্যরাশি করি বিকীরণ—
কোথাকার এ বিভব ভেবে দেখ মনে—
রত্নগর্ভা ভারতের গোলকুণ্ডা খনি
হিমাদ্রি শিখরাবৃত রতন সম্ভার—
লুণ্ঠিয়া, হরিয়া, হায়! এবে ধনবান
যাদের সম্পত্তি, তারা বর্ব্বর কাফের—
দাসত্ব তাদের ভাগ্য—দাসত্ব জীবন—
ললাটে চিহ্নিত রেখা—অনুজ্ঞাপালন।

ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে বিদেশীয় জেতা—
চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ বিলাস ভাণ্ডার
অবিরাম উঠে গীত সুকণ্ঠে সুতানে—
ভারতের যাহা হায় সুন্দর শোভন,
মোগলের পূজাতরে এবে নিয়োজিত।
দক্ষ শিল্পি নির্ম্মিয়াছে সুন্দর ভবন
শ্যামল উদ্যান রাজি পয়ঃ উপবন
মরকত হর্ম্ম্যোপরি প্রাসাদ ভিতর
সুখাবেশে অৰ্দ্ধ নেত্রে লভিছে বিশ্রাম
কোথাকার সেই দস্যু পরস্ব হরিয়া?

ভারত সন্তানগণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে
সমতলে, মরুভূমে, কানন ভিতর—
কুৎসিৎ জঘন্য খাদ্য, জীর্ণ শীর্ণ দেহ—
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ, বরষার ধারা
দগ্ধিতেছে বরষিছে হায় অনিবার
আবাস বান্ধবহীন পশুর অধম

বিতাড়িত, বিদূরিত যাপিছে জীবন
নিদ্রা নাই, শান্তি নাই, নাহিক বিরাম—
নগ্ন দেহে নগ্ন পদে শতছিন্ন বাসে
কোনমতে লজ্জা তারা করে নিবারণ।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীউমাচরণ ধর।

নব্যযুগে ভারতে গ্রন্থাগার।

ভারতবাসী চিরদিনই পুস্তকের আদর করিতেন। পুস্তক তাঁহাদিগের উপাস্তদেবতা। ভারতের নানা স্থানে এখনও কোন কোন পুথির নিত্য-পূজা হইয়া থাকে। মাঘমাসের সরস্বতী পূজার দিন গৃহস্থ মাত্রই তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলি দেবী সরস্বতীরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় মঠ বা ধর্ম্ম-মন্দিরে নানাগ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। নালান্দার গ্রন্থকুটীর কথা সকলেই জানেন। এই নালান্দার নিকট-বর্ত্তী ওদন্তপুরী নামক স্থানে (বর্ত্তমান বিহারে) পালরাজগণের সময়ে বহু সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। মিন্‌হাজের তব্‌কাত্‌-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায় যে মহম্মদ্‌-ই-বখ্‌তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ করেন, তখনও এখানে বৌদ্ধদিগের বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক শ্রমণের বাস ছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সহস্র গ্রন্থ দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এবং গ্রন্থমর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কোন কোন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মুসলমানের করাল কৃপাণে সমস্ত মুণ্ডিত শির শ্রমণগণ বিখণ্ড-শির হইয়াছিলেন।

মুসলমানের আক্রমণে বিহারের সেই অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থালয় বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের করালগ্রাস হইতে যাঁহারা পলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণতুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন, এখনও নেপাল হইতে সেই সকল প্রাচীন পুথি বাহির হইতেছে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আক্রমণ বলিয়া নয়, কতবার মুসলমানের আক্রমণে কতশত অমূল্য গ্রন্থালয় বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তারিখ্-ই-ফিরিস্তা পাঠে জানা যায়, ফিরোজ তোগলক যখন নগরকোট আক্রমণ করেন, সে সময়ে জ্বালামুখীর মন্দিরে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকুটী ছিল। তন্মধ্যে ফিরোজ ১৩০০ হিন্দু পুথি পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দর্শন, জ্যোতিষ ও জাতক সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তুজুক্-ই-বাবরি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—সম্রাট্ বাবর গাজী খাঁর গ্রন্থকুটীতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন।

আইন্-ই-আক্‌বরীতে বর্ণিত হইয়াছে, আকবর পাদশাহেরও বৃহৎ পুস্তকালয় ছিল। তাঁহার পুস্তকালয় সাতখণ্ডে বিভক্ত ছিল। তাহা আবার গদ্য, পদ্য, হিন্দী, পারসী, গ্রীক্, কাশ্মীরী, আর্‌বী ইত্যাদি পৃথক্ খণ্ডে সজ্জিত থাকিত।

আকবর যেমন নানা ভাষার গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়া গ্রন্থালয়ের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, টিপু সুলতান সেইরূপ নানাদেশ হইতে অমূল্য পারসী গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয়ে রক্ষা করিয়া যান। তাঁহার অধঃপতনের পর সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থ এক্ষণে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে দেখা যায়।

আধুনিক কালে হিন্দু রাজন্য বর্গের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঞ্জোররাজ শরভোজী ও নেপাল রাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনা যায় খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে তাঞ্জোররাজ পুথি সংগ্রহে যত্ন করেন, শরভোজীর সময়ে তাঁহার পুস্তকালয়ে ২৫ সহস্রের অধিক হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনও তাঞ্জোররাজ পুস্তকালয়ে অষ্টাদশ সহস্রের অধিক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথি বিদ্যমান। এই সকল পুথি দেবনাগরী, নন্দিনাগরী কণাড়ী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা অক্ষরে লিখিত। এরূপ বহুসংখ্যক পুথি ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই।

নেপাল—নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে প্রায় ৮ হাজার হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও সংগ্রহ কার্য্য চলিতেছে। এই পুস্তকালয়ে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হস্তলিপি বিদ্যমান; এরূপ সুপ্রাচীন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ পুথি আর কোথাও নাই। সম্প্রতি নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে লিখিত সংস্কৃত তান্ত্রিকগ্রন্থ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাশ্মীর—কাশ্মীরের রাজ পুস্তকালয়েও নানা ভাষায় লিখিত প্রায় দশ সহস্রাধিক পুস্তক ও তন্মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি আছে, এইরূপ মূল্যবান হিন্দু গ্রন্থ আর কোথাও নাই। *

রাজপুতনা—রাজপুতনার সামন্ত রাজগণের গৃহেও বহুতর পুথি-সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, মেবার, আলবার, বিকানীর, জসলমীর, কোটা, বুন্দী ও ইন্দোরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে কাশীধামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত পুথি-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। কাশীধামের গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশীরাজের পুস্তকালয় এবং কবি হরিশ্চন্দ্রের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের আদেশে পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ যে সংস্কৃত পুথি সমূহের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এ অঞ্চলের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

বোম্বাই প্রদেশ—বোম্বাই প্রদেশে আহ্মদাবাদ, পাটনা, কাম্বে, সুরত, পুনা, নাসিক, কোল্হাপুর, ভরোচ প্রভৃতি নানাস্থানে হস্তলিখিত পুথির গ্রন্থকুটী আছে। ঐ সকল গ্রন্থালয়ের মধ্যে আহ্মদাবাদ, পাটন ও কাম্বে সহরে অনেকগুলি জৈন-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। জৈন যতিগণ তীর্থভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে যে স্থানে আসিয়া বিশ্রামার্থ বাস করেন, জৈনেরা তাহাদিগকে উপাশ্রয় বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাশ্রয়ে জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত থাকে। গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী পাটন-সহরে এইরূপ ১১টী

* Dr. Buhler's Reports, 1877; Dr. Stein's catalogue of Sanskrit Mss দ্রষ্টব্য।

উপাশ্রয় ও আহ্মদাবাদে ৬টী উপাশ্রয় আছে। পাটনের পোফলিয়ানোপাড়োর উপাশ্রয়ে তিন হাজারের অধিক এবং হেমচন্দ্র ভাণ্ডারে প্রায় চারি হাজার সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে। এই দুই উপাশ্রয় হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে লিখিত তালপত্রের পুথি বাহির হইয়াছে। হেমচন্দ্র ভাণ্ডারে সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পুথি দৃষ্ট হয়।* পুনার বিশ্রাম-আবাস সংস্কৃত-পাঠশালায় পেশবাদিগের সংগৃহীত অনেক পুথি দৃষ্ট হয়।

মলবার—কালিকটে এখানকার সামরী-রাজপুস্তকালয় এবং তিরুপ্পূনিত্তুর নামক স্থানে কোচিন-রাজ্যের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এখানে সংস্কৃত ও দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় লিখিত বহুতর হস্তলিপি দৃষ্ট হয়।

মহীশূর—মহীশূরের রাজপ্রতিষ্ঠিত সরস্বতীভাণ্ডারে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। মহীশূরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্য্য-স্বামিমঠেও বহু সহস্র সংস্কৃত পুথি আছে।

তাঞ্জোর—তাঞ্জোর রাজ পুস্তকালয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তাঞ্জোর জেলায় গঙ্গাধরপুর, গোবিন্দপুর, কুম্ভঘোণম্, মন্নার পুর, বেদারণ্য, নাগপট্টন প্রভৃতি নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকুটী দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়ের মধ্যে পুদুকোটের রাজপুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবাঙ্কোড়—ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজের পুস্তকালয়েও বহুসহস্র হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত স্থান সমূহ ব্যতীত কাঞ্চনীর মন্দির, মদুরা জেলায় শিবগঙ্গা ও রামনাথ মঠ, বিশাখপত্তন জেলায় বিজয় নগরাধিপের পুস্তকালয় ও বোব্বিলির রাজপুস্তকালয়, দক্ষিণ আর্কটে চিদম্বর, কোয়ম্বাতোর কুমার লিঙ্গ ও রাজপুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। †

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি—বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কলিকাতার এসি-

* দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ছোট বড় সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। Dr. Oppert's catalogue of the Sanskrit Mss in Southern India. Dr. Huttzeu's Reports of the Sanskrit Mss দ্রষ্টব্য।

† Dr. Buhler, Dr. Peterson, Dr. Bhandarkar প্রভৃতি প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তক বিবরণী দ্রষ্টব্য।

য়াটিক্ সোসাইটী ও তথায় রক্ষিত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পুস্তকালয়, কলিকাতার সংস্কৃত-কলেজ, ৺রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকালয়, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এসিয়াটিক সোসাইটি ও তৎসংলিপ্ত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত সংস্কৃত হস্তলিপি প্রায় ৮ হাজারের অধিক এবং পারসী গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় ৮ হাজার হইবে। সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৪ হাজার হস্তলিপি আছে।

এতদ্ভিন্ন আর আর যে সকল স্থানে ও যে যে ব্যক্তির নিকট বহুসংখ্যক সংস্কৃত হস্তলিপি রক্ষিত আছে, তাহাদের নাম লিখিত হইল :—

আজিমগঞ্জে রায় ধনপৎসিংহের জিনমন্দির।
কাকিন (রঙ্গপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।
জাফরগঞ্জ বড় আখড়া গোপাল দাস মহন্ত।
জিয়াগঞ্জ বালুচর খরতর গচ্ছীয় পঞ্চায়ত পোশালা (উপাশ্রয়)
দরভাঙ্গা রাজ পুস্তকালয়।
নবদ্বীপ রাজবাটী (মহারাজ ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়)
নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বাটি।
নশীপুর, মুর্শীদাবাদ, রাজা রণজিৎসিং।
নাটোর রাজবাটী।
পুটিয়া রাজবাটী।
পুরীর শঙ্কর মঠ।
ব্রাহ্মণী গ্রাম (মুর্শিদাবাদ) রামানুজ মঠ।
ভট্টেশ্বর গ্রাম (বিক্রমপুর) গঙ্গাচরণ তর্করত্নের বাটী।
ভগ্রাণী—(দরভাঙ্গা) ছোটিলাল ঝাঁ।
ভাওয়াল—রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর।
মধুবনী (দরভাঙ্গা) কানাই লাল ঝাঁ।
মানকর (বর্দ্ধমান) হিতলাল মিশ্রের বাটী।
রাজনগর (বিক্রমপুর) কালীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী।
রোয়াইলের জমিদারবাটী।
বহরমপুর ৺ রামদাস সেন ও তাঁহার আত্মীয়
রাধিকাপ্রসাদ সেনের ঠাকুরবাটী।

বোতিয়া মহারাজ রাজেন্দ্র কিশোর সিংহ বাহাদুর।

শান্তিপুর—৺ কালিদাস বিদ্যাবাগীশের বাটী।

শ্রীরামপুর কলেজ।

সেরপুর—(ময়মন সিংহ) হরচন্দ্র চৌধুরীর পুস্তকালয়।

ত্রিপুরা—মহারাজের পুস্তকালয়।

বর্দ্ধমান—সংস্কৃত পুস্তকালয়।

হাতোয়ারাজের পুস্তকালয়। *

ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুথি রক্ষিত হইলেও প্রধান প্রধান দুই একটী রাজ পুস্তকালয় ব্যতীত কোন পুস্তকালয়ের রীতিমত তালিকা পাওয়া যায় নাই, এই জন্য আনুমানিক গ্রন্থ সংখ্যা লিখিত হইল না।

বর্ত্তমান মুদ্রিত গ্রন্থের পুস্তকালয় মধ্যে বরোদার গাইকবাড়ের পুস্তকালয় ও কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই স্থানে সকল বিষয়ক গ্রন্থ একত্র করিলে প্রায় ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার পুস্তক হইতে পারে।

কলিকাতার মেট্‌কাফ হল, বোম্বাইএর রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটী, মান্দ্রাজের কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটী, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, উত্তরপাড়ার ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী, ঢাকার নর্থব্রুকহল, কোচবিহার রাজ পুস্তকালয়, ত্রিপুরার মহারাজ স্থাপিত লাইব্রেরী, কাকিনার রাজা মহিমা রঞ্জনের লাইব্রেরী, জয়দেবপুরের রাজ পুস্তকালয়, কলিকাতার ৺ রসিকচন্দ্র নিয়োগীর লাইব্রেরী, আলবার ও জয়পুরের রাজপুস্তকালয়, কাশীর কলেজ লাইব্রেরী এবং পুনার ডেক্কান কলেজ লাইব্রেরীই উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পুস্তকালয়ে বহু সহস্র মুদ্রিত গ্রন্থ আছে। বারান্তরে বিদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মহিন্তা।

---

* বাঙ্গালার যে যে স্থানে পুথি রক্ষিত আছে তাহাদের নাম—**Raja Rajendralal Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. I—IX** এবং **Mahamahopadhyaya Hara Prasad Shastri's Notices of Sanskrit Mss, published under the orders of the Government of Bengal** দ্রষ্টব্য।

সুনীতি।

কৈশোরেই আমার কবিত্বের খ্যাতি সদ্যমুকুলিত-কুসুম সৌরভ সদৃশ সমগ্র বিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যখন কোনও অত্যাচারী পণ্ডিত বা শিক্ষক বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেন তখনই স্কুলের হুজুক প্রিয় দলের নেতারা আসিয়া আমায় সময়োচিত একটি শোক গাঁথা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিত। আমিও বীণাপানির আশীর্ব্বাদে উৎকট শোক সঙ্গীত লিখিয়া দিয়া গুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তৎপর হইতাম। শিশুহৃদয়োন্মেষকারী অজ্ঞান-তিমিরনাশী অনেক সংশয়চ্ছেদী বিদ্যাদানে পিতৃতুল্য গুরুদেব আমাদিগের পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন এবং তাঁহার দেবোপম চরিত্রের আদর্শই যে আমাদের একমাত্র মঙ্গল বিধায়ক এবং তাঁহার বিদায় সম্বাদে আমরা যে জ্যোৎস্নায় লাবণ্য হারাইতেছিলাম প্রকৃতি মুখে অনিন্দ্যনীয় শোভা হারাইয়া কেবল বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম ইত্যাদি বাক্যাড়ম্বরে বন্ধুদিগের মধ্যে এবং নিজ অন্তঃকরণে শিক্ষকের উদ্দেশে যে সকল সাধুভাষা প্রয়োগ করিতাম তাহা গোপন করিতাম। যখন এণ্ট্রান্স ক্লাশে উঠিলাম আমাদিগের বন্ধু শৈলেশের বিবাহ হইল।

গুরুচরণ আসিয়া বলিল—জ্যোতি ভাই, একটা poetry লিখিয়া দে আমরা ছাপাইয়া শৈলেশকে উপহার দিই। আমারও লেখনী প্রস্তুত ছিল। বিহঙ্গমকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার স্বরে আজ এক অভিনব মাধুরী অকস্মাৎ কি কারণে অনুভূত হইল? চন্দ্রমা কি শুভ প্রত্যাশায় আজ তাহার নিত্য প্রীতিপ্রদ কিরণগুলি নূতন করিয়া কনক রসে শিক্ত করিল; কি নূতন আবেশে আজ ভৃঙ্গবর চিরপরিচিত কুসুম বঁধুকে সস্নেহে চুম্বন করিতেছে; হঠাৎ চক্ষু উন্মিলীত হইল, বুঝিলাম আজ সুহৃৎ-প্রবর শৈলেশের বিবাহ—তাই। শৈলেশ ত কবিতা পাঠে মহাখুসি, বলিল, "বাস্তবিক ভাই, প্রাণের মত বন্ধু না থাকিলে কি জীবন সুখকর হয়?"

এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দুই একখানি ছোট খাট উপন্যাস প্রণয়ণ করিলাম। বাল্যাবধি আমার একটু মৌলিকতা ছিল। যাহা চতুর্দ্দিকে দেখি-

তাম তাহা নূতন ভাবে নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়া বেশ দশজনের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে পারিতাম। যাহারা আমার সাধুবাদ করিতে করিতে আত্ম-বিস্মৃত হইত, আমি ভাবিতাম হায়! ইহারা কি মূর্খ, আমি যাহা লিখি ইহারা প্রত্যহই তাহা নিরীক্ষণ করে, তবে আমার ন্যায় উহাদিগের বাক্য বিন্যাস নাই ইহাই তাহাদের প্রধান অভাব।

(১)

প্রভাতের বায়ু পরিবর্ত্তনশীল. নীহারসিক্ত বনানি সংসর্গে বিকসিত, সুবাস গর্ভ পুষ্প সৌরভে বাস্তবিকই মলয় বড়ই প্রীতিপ্রদ হয়, তাহার পর ভিখারী যেমন অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্যলাভে আত্মকথা ভুলিয়া ক্রমে মেজাজটিকে অগ্নিসদৃশ করিয়া তুলে, সেই পকার মলয় ও ভানুকর পূর্ব্ব স্বভাব বিস্মৃত হইয়া রুক্ষ ভাবাপন্ন হয়; তখন আর তাহার প্রভাতের হৃদয়গ্রাহী চাঞ্চল্যও থাকে না, আর সে সৌগন্ধও লোপ পায়। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও পরিবর্ত্তনশীল—কাল। অদ্য যে বৃক্ষটি ফলে ফুলে সুশোভিত, কালের অগ্রসরে তাহা সামান্য আবর্জ্জনা স্তূপের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র।

যখন নভেল লিখিতাম তখন কত হতভাগ্যকে পিতৃহীন করিতাম, কত যত্নে বর্দ্ধিত যুবককে পথের কাঙাল করিতাম। তখন স্বপ্নেও ভাবিতাম না আমার একপ অবস্থা হইবে। আমি স্বয়ং পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া আমার ও অভাগিনী জননীর উদরান্নের জন্য অপরের নিকট চাকুরির উমেদারি করিব।

পিতা সঞ্চয়ী ছিলেন না, যাহা কিছু রাখিয়া যাইলেন তাহাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছয়মাস অনাহার চলিতে পারে। রোরুদ্যমানা জননীকে একেলা দেশে রাখিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় কবি আমি কলিকাতায় কাজ কর্ম্মের অন্বেষণে আসিলাম। পিতার যাঁহারা অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন তাঁহাদিগের নিকট চাকুরী প্রত্যাশায় হাঁটাহাটি করিলাম। সকলেই পিতার প্রশংসা করিলেন, আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিলেন, অনেক প্রতিজ্ঞা করিলেন কেহ কেহও বা আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ কাজ করাইয়া লইলেন, পরে একে একে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে দেশ কাল, এল্.এ. বি-এ, পাশ করার এপ্রেণ্টিসই জোটা ভার তাহাতে আবার তুমি মোটে এণ্ট্রান্স্ পাশ, সদ্য বিদ্যালয়ত্যাগী ছোকরা।

ছোকরা হইলেও আমি "ক্লেভার ছোকরা" ছিলাম। বুঝিয়া লইলাম আমার "বিদায় কবিতা" লেখার ন্যায় বিষয়ী লোকের প্রতিজ্ঞা কেবল বাক্য-বিন্যাস ও ভদ্রতা প্রদর্শন। শীঘ্র বুঝিতে বাকি রহিল না পৃথিবীতে মিথ্যা-কথা মিথ্যা আচরণ প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার অঙ্গীভূত।

যাহা হ'ক, শীঘ্রই একটি উপায় হইল। একটি ভদ্রলোক সহানুভূতি করিয়া Railwayর telegraph signallerএর কার্য্য শিখিতে পরামর্শ দিলেন।

বলা বাহুল্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই বিদ্যাটি অভ্যাস করিয়া E. I. Ry তে একটি signaller বা তার-মাষ্টারের পদ পাইলাম। তাহার পর ছয় মাসের মধ্যেই আমাদিগের E. B. S. Ry তে একটি চাকুরী জুটাইয়া লইলাম। মাতার শুষ্ক ওষ্ঠে মুহূর্ত্তের জন্য একটু হাসি দেখা দিল। বিজলির পর বর্ষণ স্বভাবের নিয়ম সুতরাং মাতার চক্ষুদুটি অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। আমি মার কোলের দিকে সরিয়া গেলাম, বলিলাম ও কি মা! কাঁদ কেন? আমার মুখটি ফিরাইয়া লইলাম। মাতা কিন্তু আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইলেন, আবার তাঁহার ক্রন্দনের নূতন স্রোত বহিল। মাতা পুত্রে রানাঘাটের সেই নীরব কুটীর অনেকক্ষন সিক্ত করিলাম। কিন্তু কই নির্দ্দয় পিতার ত কোনও সাড়া শব্দ পাইলাম না।

(৩)

"বল না জ্যোতি দাদা তার পর কি হইল?" মিরপুরের ষ্টেশন মাষ্টারের কন্যা সুনীতি বলিল—"তার পর কি হইল?"

আমি তখন মিরপুরে ছিলাম। মাহিনার প্রায় সমস্তই গৃহে পাঠাই। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতেই থাকি ও আহার করি। ইনিও প্রায় আমাদিগের স্বদেশবাসী, শান্তিপুরে ইঁহার বাসস্থান।

সুনীতির বয়ঃক্রম আন্দাজ একাদশ বৎসর হইবে। মুখুজ্যে মহাশয় বিদেশে থাকেন, পাত্রের বিষয় কিছু সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই বালিকা ভিন্ন আর তাঁহার আরও তিনটি পুত্র ছিল তাহারা সকলেই ছোট। ক্রমে প্রকাশ পাইল মুখুজ্যে মহাশয়ের সহিত আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু তাহা অতি দূর; কাজেই তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলাম।

সেই সময় মুখুজ্যে মহাশয় আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন "তোমার মাথা হইল। এখন জ্যোতিকে ছাড়িয়া দাও, বেচারা একটু নিদ্রা যাউক। কাল রাত্রে duty ছিল জাগিতে হইয়াছে।"

আমি দুই দিকই রাখিবার ইচ্ছা করিলাম। বাস্তবিকই নিদ্রার বড়ই আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু তাহা বলিয়া সুনীতির ইন্দু মুখে অভিমান দেখিতে বাসনা ছিল না। মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে গল্পটী সারিয়া লইয়া মাষ্টার দুহিতাকে একটু কাহিনী পড়িতে বলিব এবং আমি সেই অবসরে শান্তি প্রদায়িণী বিরামের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। পিতার বাক্যে বালিকা কুপিত হইল, বলিল তাহ'ক রাজ কন্যার শেষে কি হইল শুনিয়াই দাদাকে ছাড়িয়া দিব। পিতাও হারি মানিলেন হাসিয়া বলিলেন "যত ছেলে ছোকরা লইয়া কাজ সতের বছরের সিগনালার কি আর শরীরের যত্ন বুঝিবে।"

প্রকৃত কথা বলিতে কি, নব গোপাল মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়টী অতি-করুণ ও দয়ার্দ্র। আজ এক বৎসর তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী আমায় অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগুলির প্রতি আমার নিরতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল, এবং বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার সরলতায় এবং আবদারে আমার কবিত্ব হৃদয়ে বড়ই সুখের হিল্লোল বহিত। এই স্থানে বলিয়া রাখি বিদ্যালয় ত্যাগের সহিত আমিও কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে যাহাহউক আমিত সংক্ষেপে গল্পটী সারিয়া লইলাম। রাজ কুমারীর সহিত রাজপুত্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়া খাটিয়ার আশ্রয় লইলাম। সুনীতি আমার মাথার সিহরে বসিয়া 'হিতবাদী' পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বেশিক্ষণ পড়িতে হয় নাই, কারণ আমার হুঁ না পাইয়া সে এক বার আমায় ঠেলিয়া দেখিল, বুঝিল দাদা নিদ্রিত, তখন সে ছুটিয়া ফুল গাছে জল দিতে গেল। এইরূপে ক্ষুদ্র জীবনে মহান্ স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

কবিতা-কুঞ্জ।

ব্যর্থ-উপকূলে।

তরণী লাগিল মোর ব্যর্থ উপকূলে—
তরণী ভাসিল মোর কোন্ পথে ভুলে
নাহি রৌদ্র নাহি ছায়া
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া—
এ যে শুধু মরুদেশ ঘন আঁধিয়ার—
ঘুমঘোরে দুঃস্বপন তরাস হিয়ার।
এখানে আসিব ব'লে বাহি নাই তরী—
বাহি নাই এত বেগে এত বর্ষ ধরি—
কোন্ পথে হল ভুল
হইল গো নিরমূল—
সোণার বাসনা ছিল মনপ্রাণ ভরি—
হেথায় আসিব ব'লে বাহি নাই তরী।
হেথা দেখি অনাচার নিমম নিঠুর
হেথা কভু বাজে না'ক মিলনের সুর—
কেবলি সে হাহাস্বর—
হাহাকারে নিরন্তর—
প্রলয় বাজনা বাজে—আশা শান্তিদূর—
হেথা দেখি অনাচার নিমম নিঠুর।
সাগরেতে দিশেহারা আর কতজন
মোর আগে এইখানে করি আগমন
অন্ধকারে গেছে মিশি—
তারাহীন চিরনিশি—
উঠিছে একই রব ভরিয়া গগন
স্বার্থ স্বার্থ লক্ষ কণ্ঠে স্বার্থের সাধন।
কখন করুণ স্বর কখন রোদন
কভু বা বিকট হাস্য বধির শ্রবণ—
এ কি এ ভীষণ মেলা
কোটী প্রেত লীলা খেলা—
মোরেও কি হ'তে হবে এরি একজন
কোন দোষে হ'ল বিভো হেথা আগমন?
দেখিব না আর কভু সরল আনন
দেখিতে পাব না আর পুণ্যপূত মন,—
পূরণিমা নিশি আলা
শতগন্ধ ফুলমালা
প্রভাতে তরুণ রবি লোহিত বরণ
উদ্দাম উৎসাহময় কৈশোরের মন।
তরণী লেগেছে মোর ব্যর্থ উপকূলে
দয়া মায়া আশা প্রেম সব যাব ভুলে—
নাচিব পিশাচ নাচ—
সাজিব পিশাচ সাজ—
এই দেশে এই রীতি—যেতে হবে ভুলে—
তরণী লেগেছে মোর ব্যর্থ উপকূলে।

প্রতীক্ষা।

সবে যেতে হবে কেহ নাহি রবে
সকলের মুখে শুনি।
তাই শুনে আমি একটি করিয়ে
দিবস বরষ গণি॥
কবে সেই দিন আসিবে আমার
যে দিন যাইব চলে।
জগত ডাকিয়া পথ দেখাইবে
পথ ছেড়ে দিছি বলে॥
সেই পথ দিয়া যাইব চলিয়া
হেথায় না রহিব আর।
আহা সেই দিন এ পোড়া পরাণে
লঘু হবে গুরু ভার॥
ঘুমাইব নাকি চির নিদ্রাঘোরে
আর না মেলিব আঁখি।
আর না থাকিবে অতীতের স্মৃতি
সকলি ভুলিব নাকি॥
কি আরামে আমি ঘুমাব তখন
ডাকিবে না মোরে কেহ।
ভুলে যাব এই আপনার জন
ভুলে যাব এই গেহ॥
ভুলে যাব এই মোহের স্বপন
ভুলে যাব এই দুখ।
হেথাকার এই ভুলে যাব সব
সে কেমন পাব সুখ॥
যেতে হবে বলে আছি গো দাঁড়ায়ে
পথ দাও যাই চলে।
আর যে এখানে রহিতে না পারি
দাও এ বাঁধন খুলে॥
পথপানে চেয়ে আছে সে দাঁড়ায়ে
ডাকিতেছে বার বার।
কেন রাখ ধ'রে ছেড়ে দেহ মোরে
ডাকিতেছে সে আমার॥

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ।)

১ম বর্ষ।] আশ্বিন ১৩১১। [৮ম সংখ্যা।

আগমনী।

নির্ম্মল শরদাকাশে শুভ্র মেঘমালা
ফিরিয়াছে বর্ষপরে। প্রকৃতি শ্যামলা
বিধৌত বিমলা এবে বর্ষা অবসানে
পূর্ণিয়াছে চরাচর পুষ্প, গন্ধ গানে ;
কোটী তারালোকে দূরে সুন্দর উজ্জ্বল
ছায়াপথ মিলায়েছে স্বর্গ ধরাতল
ঐ পথে ধীরে নামি আসিবেন মাতা
সুধাইতে সন্তানের কুশল বারতা।
নিরাশা বেদনা যত জ্বালা অপমান
হৃদয়ের গুরুভার পদমূলে সব
একে একে নিবেদিবে ব্যথিত সন্তান—
তার পর লভিয়া মা, আশীর্ব্বাদ তব
—মৃতপ্রায় ক্ষীণদেহে সুধাসঞ্জীবনী—
ভাসাইব নবোদ্যমে জীবন তরণী।

এদেশী উপন্যাস।

বেশ স্থিরদৃষ্টিতে পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের অভ্যুত্থানের আশীর্ব্বাদে অপর শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা অস্মদ্দেশে উপন্যাস গ্রন্থেরই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কেমন একটা সংস্কার আছে বাঙ্গালা লিখিতে পারা অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় গল্প লেখা। সুতরাং মাসিক পত্রিকায়, খবরের কাগজে, বটতলার সুলভ গ্রন্থেও দিব্য সুচিক্কণ সুমুদ্রিত পরিপাটি দৃষ্টিসুখকর পুস্তকে আমরা জীর্ণ পুরাতন একই ভাবের একই প্রকারের উপকথা লিখিয়া আমাদিগের মাতৃভাষার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রয়াস করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করি।

আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসবলীর আদর্শ ইংরাজী উপন্যাস। ইংরাজী ভাষায় সকল প্রকার রচনার ন্যায় নভেল রচনা প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে এবং আমরাও ইংরাজি বিদ্যাচর্চ্চার এক দিক লইয়া তাহারই সেবায় আপনাদের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস করি।

বাঙ্গালা উপন্যাস রচনার সহিত এই শ্রেণীর ইংরাজী রচনার তুলনার কথা পরে বলিব। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন বাঙ্গালায় পদ্যে গল্প রচনার প্রারম্ভ "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাসেবী মনীষীগণের প্রতিভা, ধর্ম্ম ও প্রেম বিষয়ক পদ্যেই বিকশিত হইয়াছিল। সংস্কৃতের অন্যতম প্রাকৃতিক মাগধী ভাষার অবনতির সময় হইতেই অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের প্রারম্ভ কাল হইতেই বাঙ্গালী কবিগণ প্রেমের কবিতা রচনার জন্য চির প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য সংস্কৃতে কবিতার আধিক্য হইতেই নবসৃষ্ট বাঙ্গালার বহুল পরিমাণে কবিতা রচনা হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত পদ্য লিখিত উপকথার আর তৎকালীন বঙ্গভাষায় অনুকরণ হইল না সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালী কবি কেবল সুন্দর ভাষায় ললিতকণ্ঠে প্রেম সঙ্গীত গাহিয়াই তাহার মহান্ প্রীতিপূর্ণ করুণ দয়ার্দ্র হৃদয়ের সামান্য পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অনেকের ধারণা যেমন আধুনিক বঙ্গোপন্যাসের আদর্শ ইংরাজী উপন্যাস সেই প্রকার উপন্যাস লেখা ব্যাপারটাও বুঝি পাশ্চাত্য দেশের। অশ্রুত-পূর্ব্ব সুন্দর মনোহর কতকগুলা কাল্পনিক নরনারীর সৃজন, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কত মনোরম বন উপবন নগর গ্রামের সৃষ্টি, নিত্যদৃষ্ট সাধারণজ্ঞেয় কতকগুলা ভাবের কতকগুলা বৃত্তির নূতন সমাবেশ, তাহার পর মানবচরিত্রের বিশেষ দিকগুলি অবলোকন করিয়া কল্পিত মানবের ঠিক সেই ভাবে চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও পরিস্ফুটন—এ সকল ইংরাজদিগের সহিতই সাগর পার হইতে এদেশে আসিয়াছে। এ ধারণা যে কিরূপ অজ্ঞতাব্যঞ্জক ও ভ্রমমূলাত্মক তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন।

প্রকৃত পক্ষে এই উপকথা বলিবার, এই কল্পিত নরনারীর সৃষ্টি করিবার জগতের গুরু প্রাচীন হিন্দুজাতি। ইংরাজী নভেল "আর্থুরিয়ান লিজেণ্ড" হইতে প্রসূত হইয়াছে। মিডেল্ এজেসে (Middle ages) সমগ্র ইউরোপের বীরত্বের বন্যা বিদেশী নর্ম্মান বিজয়ের সহিত জলধি-বেষ্টিত ব্রিটন দ্বীপও প্লাবিত করিয়াছিল। তখন সকলেই বীরত্বের কথা কহিতে ভাল বাসিত। পরা-ক্রমশালী নির্ভীক অজেয় বীরদিগের প্রশংসা সঙ্গীতে সকলেই স্ব স্ব হৃদয় আপ্লুত করিতে প্রয়াস পাইত। সুতরাং তৎকালে পুরাতন বীর ব্রীটন ভূপাল আর্থারের কীর্ত্তিগাথা গাইয়া ম্যালারি প্রভৃতি আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অতি ধীর ভাবে অতি সূক্ষ্ম ভাবে ইংরাজী লেখক আজগুবী অজানা অদৃষ্ট স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া প্রকৃত জগতের অধিবাসীর অনুরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিল, লোমহর্ষক ভীতিপ্রসু ঘটনাবলী পরিত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার সকল অঙ্কিত করিতে শিখিল।

এই উপন্যাস লেখা বিদ্যাটার আদর্শ অপরাপর সকল বিদ্যার মত ইংরাজেরা গ্রীক ও লাটিন রচনা হইতে পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। গ্রীকদিগের ঈশপের গল্প ভুবন বিখ্যাত এবং পাশ্চাত্যে আধুনিক সংস্কৃত চর্চ্চার পূর্ব্বে সাধারণ ধারণা ছিল গল্প লেখার মৌলিকতাটা গ্রীকদেশীয়। কিন্তু এখন স্থির হইয়া গিয়াছে গ্রীকদিগেরও বহু পূর্ব্বে এ বিদ্যা ভারতবর্ষে বেশ সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রাচীন গল্প গ্রন্থ "জাতক কথা"। ইহা হইতেই প্রথম উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। সংস্কৃত উপকথার প্রধান ও সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় বৃহৎ কথা ও পঞ্চতন্ত্রের সুখ্যাতি ভুবন বিখ্যাত। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে পারস্য আরব্য, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদিত হয় এবং তাহার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহার জার্ম্মান ভাষায় যে অনুবাদ হয় তাহা হইতে এক্ষণে পঞ্চতন্ত্র ইউরোপীয় সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।*

কালিদাস প্রভৃতির অভ্যুত্থানের পর সংস্কৃত ভাষায় পদ্য রচনার সমাদর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তখন দেবভাষায় সুবৃহৎ ও সুন্দর উপন্যাসের বা উপকথার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎ কথা প্রভৃতির গল্প হৃদয়গ্রাহী ও সুমধুর হইলেও তাহাদিগের মধ্যে মানব অন্তঃকরণের সুমহান বৃত্তিরাশির পরিস্ফুটন ছিল না সুতরাং তাহাতে বিজ্ঞ লোকের সবিশেষ পরিতৃপ্তি হইতে পারিত না। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দণ্ডী ইহার কিয়ৎপরিমাণে প্রতিকার করেন, কারণ তাঁহার দশকুমারচরিতে রাজপুত্রদিগের সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পর রত্নাবলী রচয়িতা বানভট্টের কাদম্বরী এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বেশ উচ্চস্থান অধিকার করে। উপন্যাসের বিশেষত্ব হইতেছে কল্পিত চরিত্রের সৃষ্টি ও তাহাদের ক্রম বিকাশ। কাদম্বরীর দৃশ্যগুলি প্রীতিপ্রদ ও বহু হইলেও ইহার গল্পের চিত্তাকর্ষণী ক্ষমতা আছে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা এই শ্রেণীর রচনা। সুন্দরী যুবতী বাসবদত্তা স্বপ্নে কন্দর্পকেতুর সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়েন। তাহার পর জাগ্রত অবস্থায় রাজপুত্রের সহিত কুসুমপুরে প্রেমিক প্রেমিকার চাক্ষুস সন্দর্শন হইল। স্বপ্ন সত্য হইল, হৃদয়ের অগ্নি প্রশমিত হইল. যুবরাজ কন্দর্পকেতু নিষ্ঠুর কন্দর্পের তীক্ষ্ণ ফুলশরের আঘাতের হস্ত হইতে প্রেম বিহ্বলা ললনা বাসবদত্তাকে রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে বিমান অশ্বে উড়াইয়া লইয়া বিন্ধ্য গিরিতে লইয়া গেলেন।

---

* পঞ্চতন্ত্র (৬৫৩১—৫৭২ই অব্দে) নোসারবন্ কর্ত্তৃক পারস্যে তাহা হইতে আরব্যে আরব্য হইতে সাইমিয়ন সেথ কর্ত্তৃক ১০৮০ অব্দে গ্রীকভাষায় তাহা হইতে পসিনস কর্ত্তৃক লাটিনে এবং ১২৫০ অব্দে রাবি জোয়েল কর্ত্তৃক হিব্রুতে অনুবাদিত হয়। ইউরোপে সাধারণতঃ ইহাকে পিল্পে বা বিদ্পাইয়ের গল্প বলা হয়।

এই সকল উপকথার বহু দৃষ্টান্ত সংস্কৃত রত্নভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ঠিক আজ কালিকার নভেলের ছাঁদে রচিত না হইলেও ইহারাই এদেশী উপন্যাসের প্রথম সূত্রপাত। তাহার পর ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হইলে অস্মদ্দেশীয়েরা ইংরাজীর অনুকরণে নভেল লিখিতে আরম্ভ করিল বটে কিন্তু তাহাতে হিন্দু হৃদয়ের সুকুমার ভাব রাজি প্রকাশিত হইতে লাগিল। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে সংস্কৃত উপকথা লেখকের বর্ণিত দৃশ্য প্রভৃতি ইংরাজি ছাঁদে গড়া নভেলের মধ্যেও প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ ভূরি ভূরি রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতক কতক অসম্ভব ঘটনাবলী ও বাঙ্গালী জীবনে অসম্ভব চরিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে বটে কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গালী জীবনে যে রূপ সম্ভব সেইপ্রকার চরিত্র পরিস্ফুটন করিতে এই সকল উপন্যাসলেখকগণ চেষ্টা করিয়াছেন।

কল্পনাকে আহ্বান করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন—

"কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি।

বাস্তবিকই কল্পিত জগতের সীমা নাই, শেষ নাই। আমরা কল্পনার সাহায্যে কত প্রকার দৃশ্য, কত রকম জীব জন্তুর সৃষ্টি করিতে পারি তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। আমাদের মনোরাজ্যে অযথা প্রতিরোধ নাই, তথাকার ভাবপ্রজাগুলি যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে যাহা খুসি তাহাই করিতে পারে, যে সকল ব্যাপার মাথা খুঁড়িলে সমগ্র বাস্তব জগতে চিরজীবন ঘুরিয়া মরিলেও দেখিতে পাওয়া একান্ত অসম্ভব তাহা নিমেষ মধ্যে আমরা কাল্পনিক জগতে অবলোকন করিতে পারি। আকাশ মার্গ দিয়া ক্ষিপ্র প্রবাহিনী বরষাস্ফীত কল্লোলিনী চাক্ষুস দৃষ্টিতে এজগতে কেহই কখন দেখিয়াছেন শুনিলে স্বভাবতঃ হাসির উদ্রেক হয়। কিন্তু এরূপ দৃশ্য মনোজগতে দর্শন করা কেবল মাত্র বাসনা সাপেক্ষ। আপনি তন্ময় হউন এ দৃশ্য কল্পনা করিবেন দেখিবেন বিমান পথে, আমাদিগের শিরোপরি কেমন কুলুকুলুরবে কিনারা উছাইয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, ইচ্ছা করিলে তাহাতে সুবৃহৎ অর্ণবযান বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি ভাসিতে দেখিবেন এবং ইচ্ছা করিলে এই কল্পিত

নদীবক্ষে কল্পিত পোত সাহায্যে ত্রিভুবন ঘুরিয়া আসিতে পারিবেন, কোনও ক্লেশ হইবে না বা কোনও মাসুল লাগিবেনা।

কিন্তু তাহা বলিয়া ঠিক কবির কথা বিস্মৃত হইয়া স্থির ভাবে আলোচনা করিলে এই কল্পিত রাজ্যের কি একটা সীমা পাওয়া যাইবে না? অবশ্য যাইবে। যে জ্ঞান আমরা চাক্ষুস পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই তাহার উপর আমাদের কল্পিত জগত স্থাপিত। কল্পনা সাহায্যে আমরা একেবারে একটা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করি একথা অলীক। একটি ঘটনা বহু বিভিন্ন জ্ঞানের এবং বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণের সমষ্টি মাত্র। যাহা প্রকৃত দেখিয়াছি তাহার সাহায্যে যাহা দেখিব তাহা কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। কেবল পৃথিবীতে যে সংসর্গে যে স্থলে এবং যে সময়ে আমরা কোনও ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা ঠিক্ সেই সংসর্গে সেই স্থলে এবং সেই সময়ে না দেখিয়া যদ্যপি আজিকের দৃষ্ট ঘটনার সহিত তিনদিন পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানের এবং অপর দিবস লক্ষিত মানবের সংযোগ করিয়া একটি ঘটনা কল্পনা করি তাহা হইলে ঠিক্ কল্পিত ঘটনার সাদৃশ্য ঘটনার এ জগতে অস্তিত্ব নাই সে বিষয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু কল্পিত ঘটনাটিকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা যে যে উপকরণে গঠিত করিয়াছিলাম তাহা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিব তাহার প্রত্যেকটাই বাস্তব হইতে সংগৃহীত, তাহার প্রত্যেকটার একটা প্রকৃত জগতে সত্ত্বা আছে। ব্যোম প্রবাহিনী কল্পিত নদীটিকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে তাহার উপকরণ দুইটি, ব্যোম এবং জল, আমাদের নিত্যপরিচিত। এ দুইটির সংযোগে একটি কিম্ভুদকিমাকার দৃশ্য সৃজিত হইয়াছিল। যে কখনও ব্যোম বা জল নিরীক্ষণ করে নাই সে তাহার কাল্পনিক জগতে ব্যোম প্রবাহিনী নদী সৃষ্টি করিতে পারিবে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বিবেচনায় সে তাহা পারিবে না।

উপন্যাস লেখকের কল্পনাও ঠিক উপরোক্ত কারণে তাহার দেশ কাল পাত্রের জ্ঞানের উপর সম্যক নির্ভর করিবে। জ্ঞান বশতঃ হউক বা অজ্ঞান বশতঃ হউক তাহাকে তাহার চতুর্দ্দিকের পরিচিত পাত্র পাত্রী স্থান ও বস্তু লইয়া তাহার উপকথা বলিতে হইবে এবং যাহাদের নিকট তাহার উপকথা বলিতে হইবে এইরূপ ভাবে না বলিলেই বা সে তাহা বুঝিবে কেন? সুতরাং

কতকগুলি উপন্যাস আজগুবি ও অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাবলী ও জীবজন্তু পরিপূর্ণ থাকিলেও কোন দেশের অধিকাংশ গল্পই সেই দেশ বিষয়ক হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আজগুবি অসম্ভব ঘটনাবলী বর্ণিত উপন্যাস হইতেও লেখকের জাতীয়তা প্রভৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

এই কারণেই উপন্যাসকে সমাজের মুকুর বলা যায়। কোন সমাজের অবস্থা জানিতে হইলে, সেই সমাজের কতকগুলি উপন্যাস পাঠ করিলে, সেই সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি তত্রত্য চিন্তার স্রোত প্রভৃতি সকল বিষয়ের বেশ একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায় কারণ সাধারণতঃ লেখকবৃন্দ তাঁহাদের চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলেন।

যাঁহারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় প্রকারের উপন্যাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা নিশ্চয়ই এতদুভয় উপন্যাসের আকারের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। অনুবাদিত উপন্যাস ছাড়িয়া দিলে, আমাদের মৌলিক উপন্যাসগুলি আকারে তেমন বৃহৎ কোনও খানিই নহে। কিন্তু ইংরাজী নভেলগুলি প্রত্যেকেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও স্থূল কলেবর। তাহার পর বাঙ্গালা উপন্যাসগুলি প্রায় সকলেই একসুরে বাঁধা। সেই বিমাতার অত্যাচার, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, আর কোথাও বা এক রমণীর দুই প্রেমিকের পরস্পর বিরোধ। আমাদের উপন্যাস বর্ণিত দৃশ্যগুলিও সেই—একঘেয়ে গ্রাম্য পথ নাম জাদা অর্দ্ধ শুষ্ক অথচ কবিত্বভাবে প্রবাহমানা স্রোতস্বতী এবং কলিকাতার ভিড়। ইংরাজী নভেলে কিন্তু সচরাচর বর্ণিত ঘটনা বা দৃশ্যাবলী ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সমস্ত পৃথিবীর সকল স্থানেই বোধ হয় ইংরাজী নভেলের দৃশ্য হইতে পারে এবং তাহার বর্ণনা ইংরাজী নভেলে পড়িলে কেহ আজগুবি বা অপ্রাসঙ্গিক বলিতে পারিবে না। আমাদের উপন্যাস কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরের কোনও স্থানের উল্লেখ করিলে পাঠক লেখককে অহিফেন সেবী বলিয়া সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন তাহার পর ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া গেলে লেখক অহিফেন ও পেয়ারা পত্র প্রস্তুত গুলি নামক পদার্থ বিশেষের ঘুমসেবনকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়েন। ইহার জন্য বাঙ্গালী পাঠকও দায়ী নহেন বা এরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেও বুদ্ধিমান লেখক প্রস্তুত হয়েন না।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত একথা মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গালা উপন্যাসের এই স্বল্পতাদোষের একটা কৈফিয়ত দেওয়া যায়। উপন্যাস সমাজের প্রতিচিত্র। যে সমাজের জীবনে বহুদিকস্পর্শিতা নাই, যে দেশের সকল লোক তিন কিম্বা চারিটির অধিক পেশায় নিযুক্ত নহে সে দেশের অবিবাহিতা নায়িকার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবার উপায় নাই, যে দেশের নায়িকাকে দেখিতে হইলে নায়ক পুঙ্গবকে লুকায়িত ভাবে পুকুরধারে আম্রশাখার ভিতর দিয়া বা সহরে প্রাসাদ শিখর হইতে দেখিতে হয়, সে দেশের সমাজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নভেল, ইংরাজী নভেলের মত হইবে কি প্রকারে? বাঙ্গালী জীবনে বিবিধ বৈচিত্র্য নাই। বাঙ্গালীর নভেলে তাহা প্রত্যাশা করা দুরূহ। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে ছোট ছোট রাশি রাশি নভেলের টুকরা প্রস্তুত হইতেছে মাত্র।

অবশ্য এদেশী উপন্যাস গুলির ক্ষীণ কলেবর হইবার অপর একটী কারণ আছে। অবসরও যোগ্যতা থাকিলেও অনেক লেখক ভাবেন যদ্যপি পুথির কলেবর বৃদ্ধি করি মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় অধিক হইবে কাজেই পুস্তকের মূল্যও অল্প হইবে না। যে দেশের পাঠক পাঁচসিকা দামের মাসিক পত্র এক বৎসর রীতিমত লইয়া মূল্য দিবার সময় অপর প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন তিনি যে অধিক মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিবেন একথা বিশ্বাস হয় না। ইচ্ছা থাকিলেও লেখককে কলমের গতিরোধ করিয়া দিতে হয়।

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি এল।

দেবতার দাড়ী।

বিগত বৈশাখ মাসের অর্চ্চনায় প্রকাশিত "দেবতার দাড়ী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলাম। কারণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে সিদ্ধান্ত-সুধা উত্তোলন করিয়াছেন, তাহাতে মাদৃশ প্রাকৃত জনের রুচি হইল না। বোধ হয় আমার রুচিবিকার হইয়া থাকিবে! অথবা

অরসিকের ভাগ্যে রসের অবতারণা বিড়ম্বনার কারণই হইয়া থাকে। আমি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই—তবে যেখানে তিনি পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, সেইখানে তাঁহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

প্রথমতঃ—কাব্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াও মধ্যে মধ্যে কেন ইংরাজী কথার অবতারণা করিলেন? ইহাতে ইংরাজিভাষানভিজ্ঞের প্রবন্ধ পাঠে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। 'Original Research', 'Heading', 'Philosophy', 'D.Sc'. 'Positive' 'Negative' 'Yak' প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য নহে। কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ প্রারম্ভে অর্ব্বাচীনতা পরিহার এবং প্রাচীনতা প্রতিপাদন মানসে বলিয়াছেন—"প্রবন্ধের Heading (শিরোনামা?) দেখিয়া কেহ যেন আমার বিদ্যাবুদ্ধির সমালোচনা করিয়া আমায় একটা অর্দ্ধপক্ক ছোকরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না।" যাহা হউক, কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্মশ্রুতত্ত্বের যে অভিনব রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন, অতঃপর কেহই তাঁহাকে অর্ব্বাচীন মনে করিবেনা! তবে দুর্জ্জনে বাক্যের সাধুত্বে সন্দিহান হয় (যথা "স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ"), সকলের মনোরম বাক্যও সুদুর্লভ ("সুদু-র্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ"), এবং প্রতিপুরুষের রুচিও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁহার উদ্বেগের কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়বিধ নৈয়ায়িক প্রমাণ দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন; কারণ নাপিতের অভাবে যদি দাড়ীর অভাব হয় তবে দেবতাদের অনেক দ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে। "মনুষ্য ধর্ম্মা শ্মশ্রুলত্বাৎ" শব্দে দেবতার দাড়ী নাই এই অর্থ কখনই বুঝায়না। কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিতেছেন "আমাদের কর্ত্তারা খুটিনাটী করিয়া প্রত্যেক দেবতার প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন।"—যদি তিনি সেইগুলি পাঠ করিতেন তবে আমাদেরও অনর্থক মাথা ব্যথা করিবার প্রয়োজন হইত না। তাঁহার গবেষণাও ফলবতী হইত। যাহা হউক আমরা তাঁহার "এত প্রমাণ প্রয়োগেই সন্তুষ্ট" হইতে পারিলাম না—অথচ সংস্কৃত শাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিবার

আমাদের অবকাশও নাই। কারণ শাস্ত্রের অনন্তত্ব এবং বেদিতব্য বিষয়ের বহুত্বের সহিত আমাদের স্বল্পকাল এবং বহুবিঘ্নের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সারভূত পদার্থের সন্ধান জানিনা যে উপাসনা করিব।

উপসংহারে কোথায় দেবতার দাড়ী আছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাউক।

বিবাহিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই বোধ হয় অগ্নিদেবের দাড়ীর সন্ধান জানেন। অগ্নি বৈদিক দেবতা। চারি বেদেই তাঁহার স্তুতিগীত দেখিতে পাই। আবার অগ্নি পৌরাণিক দেবতা। পুরাণে তাঁহার দাড়ীর বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। কাব্যতীর্থ মহাশয় যদ্যপি ব্রাহ্মণ হন তবে আজিও তাঁহার অব্যূঢ়াম হয় নাই। বিবাহ হইলে তাঁহার মত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই অগ্নির দাড়ী দেখিতে পাইতেন।

সকলেই জানেন বিবাহসংস্কারে কুশণ্ডিকা করিতে হয়। সেই সময়ে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া বলিতে হয়—"ওঁ ক্রব্যাদং অগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ * * * * ওঁ ইহৈবায়ং ইতরং জাতবেদাঃ দেবেভ্যঃ হব্যং বহতু প্রজানন্।" তাহার পরেই নিম্নলিখিত অগ্নিস্তব পাঠ করিতে হয়—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ওঁ পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

অর্থাৎ "হে অগ্নে! তোমার করাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলি সর্ব্বদিকেই বিস্তৃত রহিয়াছে। তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। তুমি সর্ব্ব বস্তুতেই অধিষ্ঠান কর—তুমি মহান্। তুমি সংস্কৃতাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়া সকল কার্য্য (যাগ যজ্ঞাদি) সম্পাদিত কর। তোমার ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ ও চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ। তোমার অঙ্গ ও জঠর স্থূল. তুমি রক্তবর্ণ তুমি ছাগবাহন, তোমার করে অক্ষমালা। তুমি সপ্তার্চ্চি বা সপ্তশিখাসম্পন্ন—তুমি মহাশক্তি সম্পন্ন।"

তৎপরে পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদীগমন এবং ব্যস্ত সমস্ত হোমের পরে শাট্যায়ন হোম করিতে হয়। সেই সময়ে "অগ্নে ত্বং বিধু নামাসি" বলিয়া

অগ্নির স্তব করিতে হয়—তাহাতে অগ্নির শ্মশ্রুত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

হায়! কালের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। নতুবা বিজাতীয় ভাব শনৈঃ শনৈঃ আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিত না। কাব্যতীর্থ মহাশয় ইংরাজীদর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পাস্ করা এবং বিজ্ঞানপরীক্ষায় ডাক্তার উপাধিলাভ করার প্রতি লুব্ধ ও ক্ষুব্ধ কটাক্ষপাত না করিয়া যদি মৌলিক গবেষণাবলে (Original research) স্বদেশীয় শাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিতেন—তবে কত তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিতেন এবং কতস্থলে দেবতার দাড়ী দেখিয়া দেবসভ্যতার মূলতত্ত্ব জানিতে পারিতেন।

কিন্তু শাস্ত্রানুসন্ধান ত দূরের কথা, নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহ সংস্কারে সর্ব্বদা উচ্চারিত অগ্নির স্তবেও যখন তিনি দেবতার দাড়ী দেখিলেন না তখন আর কি বলিব। আমরা বিদেশের ইতিহাস আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারি—কিন্তু দুই একটী প্রধান দেবতার স্তব অভ্যাস করি না।

কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশী দেবদেবীর চিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যমের দাড়ী সে এক ভয়ানক ব্যাপার"—তিনি কি মনে করেন যে চিত্রকরগণ গণ্ডমূর্খ যথেচ্ছাচারিতানুসারে চিত্র অঙ্কন করে? তাহা কখনই নহে। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুককর প্রসঙ্গ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে ঘূর্ণীর প্রসিদ্ধ কুম্ভকারগণ দশভুজা প্রতিমা গড়িয়াছিল। একজন পণ্ডিত সেইস্থলে উপস্থিত হইলে, কুম্ভকার জিজ্ঞাসা করিল—"পণ্ডিত মহাশয় প্রতিমা কেমন হইয়াছে?"—পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"প্রতিমা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্গাদেবীর বৃদ্ধাঙ্গুলি মহিষের উপর থাকায় বড় বিশ্রী দেখাইতেছে।" কুম্ভকার কহিল "মহাশয় কি করিব—"দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥" তখন পণ্ডিত মহাশয় অধোবদন হইলেন।

সুতরাং কাব্যতীর্থ মহাশয় যমের দাড়ী দেখিয়া যে কেন বিস্মিত হইলেন তাহা বলিতে পারি না। কারণ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২২৭ অধ্যায়ে যমের রূপ বর্ণনায় দেখিতে পাই—

"দংষ্ট্রা করালবদনং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণং।
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং প্রস্ফুরৎ সাধরোত্তরং॥

অষ্টাদশভুজং শুদ্ধং নীলাঞ্জন চয়োপমং।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং ব্রহ্মদণ্ডেন তর্জ্জকং॥
মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নি সম লোচনং।
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেরুমিবোত্থিতং॥
প্রলয়াম্বুদ নির্ঘোষং পিবন্তমিব সাগরং।
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যমুদ্গিরন্ত মিবানলং॥" ইত্যাদি······

উপরোক্ত বর্ণনায় যমের দাড়ী যে, ভয়ানক হইবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। চিত্রকরগণ অবশ্য পৌরাণিক চিত্রই আঁকিয়া থাকে।

যাহা হউক দেবতাদিগের যে দাড়ী আছে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে দেবগণের ধ্যান একস্থলে একরূপ নহে, এমন কি একই পুরাণে একই দেবতার বিভিন্নরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। আমাদের দেশে মথুরা ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থলে যে সহস্র সহস্র মন্দির ছিল তাহাতে সকল প্রকার দেবমূর্ত্তি চিত্রিত ছিল। মামুদ কান্যকুব্জে ১০,০০০ দশহাজার এবং মথুরায় ১৬,০০০ ষোল হাজার মন্দির ভূমিসাৎ করেন। (Elliot's History of India and Al Berum Indica···দ্রষ্টব্য) ঐ সমস্ত মন্দিরে হিন্দুদেবসভা (Pantheon) চিত্রিত ছিল। সে সমস্ত এখন বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্বর্গের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে হইলে যবদ্বীপে যাইতে হয়। আজি সেখানে হিন্দুসভ্যতার উজ্জ্বলনিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। যবদ্বীপের বিরাট বলভদ্র মন্দিরে এবং ব্রহ্ম-বলের সহস্র মন্দিরে এখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ ও মহিষমর্দ্দিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে। তাহাতে শিবের "আনাভিলম্বিতকূর্চ্চ" দেখিতে পাই। (Crawford's History of the Indian Archipelago page 252-60) তদ্ব্যতীত Stamford Raffle's History of Java নামক পুস্তকের চিত্রসমষ্টিতে দেবতত্ত্বের অনেক রহস্য জানা যায়। Wilsen and Leeman's Boro Buddor নামক ৩৯৩ খানি Elephant folio যুক্ত চিত্রাবলীতেও দেবতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

শ্মশ্রুতত্ত্ব সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

পক্ষধর মিশ্রের মহত্ত্ব।

মিথিলাবিজয়ী পণ্ডিত শিরোমণি রঘুনাথ, যাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ উন্নত, যাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তৎসাময়িক স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে নবদ্বীপ, ন্যায়ালোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, তিনি মিথিলা নিবাসী মহাত্মা পক্ষধর মিশ্রের সর্ব্বপ্রধান প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। নৈয়ায়িক কুলপতি পক্ষধর মিশ্র মিথিলায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তৎকালে একমাত্র মিথিলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার উপায় না থাকায় পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতেই ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন।

১৪২১ শকাব্দে রঘুনাথও নবদ্বীপের শিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক মিথিলায় এই মহা পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করেন। তিনি পক্ষধরের চতুষ্পাঠীস্থ ছাত্রগণকে তর্কে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। পক্ষধর শিষ্যগণের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিতেন। কোনও ছাত্র সূক্ষ্মতর্কে যদি যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইত তবেই তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া পড়াইতেন। কিন্তু, রঘুনাথ কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের সেই চিরন্তন প্রথার লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাওয়া অবধি পক্ষধর আর ছাত্রের দিকে পৃষ্ঠ দিতে পারেন নাই।

পক্ষধর রঘুনাথকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন বটে, তিনি সময়ে সময়ে তর্ক উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। সে সময়ে মিথিলা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও উপাধি প্রদত্ত হইত না। এবং প্রদত্ত হইলেও সে উপাধি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইত না। এই কারণে মিথিলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করিয়া এবং তথাকার ন্যায়শাস্ত্রের টীকা সকল সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিয়া

যাহাতে উপাধি দান করিতে সক্ষম হন এই চেষ্টায়ও তিনি মিথিলা আসিয়াছিলেন। মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব এই বাসনা রঘুনাথের হৃদয়ে চিরদিনই বলবতী ছিল।

মিথিলা ব্যতীত কোথাও ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি পাওয়া যাইত না। পক্ষধর মিশ্রও কাহাকেও সে পুঁথি একেবারে দিতেন না, অথবা তাহা নকল করিয়া লইতেও সম্মতি প্রদান করিতেন না। কিন্তু রঘুনাথের আন্তরিক বাসনা ঐ পুঁথি সংগ্রহ। শিক্ষা সমাপনান্তে নবদ্বীপ ফিরিবার সময় রঘুনাথ তাঁহাকে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাত করাইলেন। কিন্তু পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন রঘুনাথ পুঁথি নকল করিয়া লইবারও অনুমতি পাইলেন না, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। পক্ষধরকে দারুণ স্বার্থপর জ্ঞান করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিশ্র গুরুকে রাত্রিযোগে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে নিশীথের সমাগম হইল। হিংস্র জীব ব্যতীত সমগ্র প্রাণী বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। পক্ষধরের চতুষ্পাঠীও নীরব। ছাত্রেরা সকলেই নিদ্রাভিভূত। আকাশে শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র বিরাজমান কচিৎ বায়ু তাড়িত এক এক খণ্ড মেঘ আসিয়া সেই তুহিন শুভ্র দিগন্তব্যাপী চন্দ্র-কিরণ-মালাকে আচ্ছাদন করিতেছিল। এই সময়ে এক খণ্ড কাল মেঘ আসিয়া রঘুনাথের নির্ম্মল চিত্তকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে রঘুনাথ আজ উন্মত্ত! গুরুহত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প। এই গভীর নিশীথে দৃঢ় মুষ্টিতে ভীষণ ছুরিকা ধারণ করিয়া রঘুনাথ পক্ষধরের দ্বারদেশে আসিয়া বসিলেন। আর পক্ষধর এখন অনন্ত সুখে মগ্ন। সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি এখন নানা প্রেমালাপে ব্যাপৃত। নানা প্রকার বাক্যালাপের পর পক্ষধরের সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পারেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ বস্তু আপনার নিকট নির্ম্মল বলিয়া বোধ হয়? আকাশের ঐ চন্দ্র, না আমি, না আপনার সন্তান?" পক্ষধর ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "যদি প্রকৃত কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, আর যদি প্রকৃত কথা আমাকে বলিতে হয়, তবে বলিব আমার

ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে নবদ্বীপ হইতে নবাগত নব্য যুবক রঘুনাথের বুদ্ধিই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল! চন্দ্রেও কলঙ্কের ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, রঘুনাথের বুদ্ধিতে সে রেখার এক বিন্দুও নাই।” হত্যা-আশে মত্ত রঘুনাথের কর্ণে এ কথা পৌঁছিল। রঘুনাথ স্তম্ভিত হইলেন, দূরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আপনার শিক্ষা, আপনার বুদ্ধির উপর ধিক্কার দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বাহিরে ক্রন্দনের স্বর শুনিয়া পক্ষধর বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন ভূমিতলে অস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর রঘুনাথ কাঁদিতেছেন। পক্ষধর জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি রঘুনাথ?” রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের পা জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, “দেব, আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন! বলুন, কোন্ প্রায়শ্চিত্তে আমার এ পাপের শেষ হইবে? পুঁথির নকল পাই নাই বলিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে ঐ ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তুষানলই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।” পক্ষধর রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “এই অনুতাপই তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। বৎস, দেখিতেছি তোমার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমার বাটীতে তুমি আরও কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে দেশে যাইও। তুমি আমার সন্তানের তুল্য, আমার গৃহেই তুমি বাস কর।” বলা বাহুল্য, রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং অসাধারণ স্মৃতি শক্তি প্রভাবে সেই সকল পুঁথি তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ রায়।

রাঠোর বালক ।

(চতুর্থ সর্গ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি নীরবিল বীর
নেত্রদ্বয় পূর্ণোজ্জ্বল রক্তিম বরণ—
যথা ভীমসেন আঁখি—যবে দুঃশাসন
আকর্ষিল পতিব্রতা কৃষ্ণার বসন।
সমগ্র রাঠোর সেনা নিশ্চল নির্ব্বাক
প্রস্তর নির্ম্মিতপ্রায় সম্মুখে তাঁহার
জীবন প্রবাহগতি মাত্র জ্ঞান হয়
নিরখি সে রক্তস্রোত বদনে নয়নে—
চক্ষে অগ্নিরেখা। মুছি স্বেদধারা
দ্বিগুণ উৎসাহে বীর পুনঃ আরম্ভিল—

"শিশোদিয়া কুলরবি বাপ্পাধুরন্ধর
বাল্যকালে বনে বনে—নগণ্য গোপাল
বিতাড়িত যুবাকালে স্বদেশ বাহির—
কতক্ষণ থাকে অগ্নি ভস্ম আবরিত ?
দীপিল জ্বলিল যবে চৌদিক উজলি
স্থাপিল এ পুণ্যরাজ্য ধর্ম্মসনাতন।
চিতোরের একছত্র বীর অধিপতি
আপনার বংশ তরু সম্মানকুসুমে
করিলেন কুসুমিত। বিজয় পতাকা
উড়িল সগর্ব্বে তাঁর পারস্য অবধি।

নিল দীক্ষা প্রজাগণ পুত্র পরিজন
মন্ত্র তার—স্বাধীনতা, স্বাধীন জীবন—

অরসিকের ভাগ্যে রসের অবতারণা বিড়ম্বনার কারণই হইয়া থাকে। আমি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই—তবে যেখানে তিনি পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, সেইখানে তাঁহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

প্রথমতঃ—কাব্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াও মধ্যে মধ্যে কেন ইংরাজী কথার অবতারণা করিলেন? ইহাতে ইংরাজিভাষানভিজ্ঞের প্রবন্ধ পাঠে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। 'Original Research', 'Heading', 'Philosophy', 'D.Sc'. 'Positive' 'Negative' 'Yak' প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য নহে। কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ প্রারম্ভে অর্ব্বাচীনতা পরিহার এবং প্রাচীনতা প্রতিপাদন মানসে বলিয়াছেন—"প্রবন্ধের Heading (শিরোনামা?) দেখিয়া কেহ যেন আমার বিদ্যাবুদ্ধির সমালোচনা করিয়া আমায় একটা অর্দ্ধপক্ক-ছোকরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না।" যাহা হউক, কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্মশ্রুতত্ত্বের যে অভিনব রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন, অতঃপর কেহই তাঁহাকে অর্ব্বাচীন মনে করিবেনা! তবে দুর্জ্জনে বাক্যের সাধুত্বে সন্দিহান হয় (যথা "স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ"), সকলের মনোরম বাক্যও সুদুর্লভ ("সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ"), এবং প্রতিপুরুষের রুচিও বিভিন্না সুতরাং তাঁহার উদ্বেগের কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—তিনি অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়বিধ নৈয়ায়িক প্রমাণ দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন; কারণ নাপিতের অভাবে যদি দাড়ীর অভাব হয় তবে দেবতাদের অনেক দ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে। "মনুষ্য ধর্ম্মা শ্মশ্রুলত্বাৎ" শব্দে দেবতার দাড়ী নাই এই অর্থ কখনই বুঝায়না। কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিতেছেন "আমাদের কর্ত্তারা খুটিনাটী করিয়া প্রত্যেক দেবতার প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন।"—যদি তিনি সেইগুলি পাঠ করিতেন তবে আমাদেরও অনর্থক মাথা ব্যথা করিবার প্রয়োজন হইত না। তাঁহার গবেষণাও ফলবতী হইত। যাহা হউক আমরা তাঁহার "এত প্রমাণ প্রয়োগেই সন্তুষ্ট" হইতে পারিলাম না—অথচ সংস্কৃত শাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিবার

আমাদের অবকাশও নাই। কারণ শাস্ত্রের অনন্তত্ব এবং বেদিতব্য বিষয়ের বহুত্বের সহিত আমাদের স্বল্পকাল এবং বহুবিঘ্নের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সারভূত পদার্থের সন্ধান জানিনা যে উপাসনা করিব।

উপসংহারে কোথায় দেবতার দাড়ী আছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাউক।

বিবাহিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই বোধ হয় অগ্নিদেবের দাড়ীর সন্ধান জানেন। অগ্নি বৈদিক দেবতা। চারি বেদেই তাঁহার স্তুতিগীত দেখিতে পাই। আবার অগ্নি পৌরাণিক দেবতা। পুরাণে তাঁহার দাড়ীর বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। কাব্যতীর্থ মহাশয় যদ্যপি ব্রাহ্মণ হন তবে আজিও তাঁহার অবুঢ়ায় হয় নাই। বিবাহ হইলে তাঁহার মত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই অগ্নির দাড়ী দেখিতে পাইতেন।

সকলেই জানেন বিবাহসংস্কারে কুশণ্ডিকা করিতে হয়। সেই সময়ে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া বলিতে হয়—"ওঁ ক্রব্যাদং অগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ * * * * ওঁ ইহৈবায়ং ইতরং জাতবেদাঃ দেবেভ্যঃ হব্যং বহতু প্রজানন্।" তাহার পরেই নিম্নলিখিত অগ্নিস্তব পাঠ করিতে হয়—

> "সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ।
> বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
> ওঁ পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ।
> ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

অর্থাৎ "হে অগ্নে! তোমার করাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলি সর্ব্বদিকেই বিস্তৃত রহিয়াছে। তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। তুমি সর্ব্ব বস্তুতেই অধিষ্ঠান কর—তুমি মহান্। তুমি সংস্কৃতাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়া সকল কার্য্য (যাগ যজ্ঞাদি) সম্পাদিত কর। তোমার ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ ও চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ। তোমার অঙ্গ ও জঠর স্থূল. তুমি রক্তবর্ণ তুমি ছাগবাহন, তোমার করে অক্ষমালা। তুমি সপ্তার্চ্চি বা সপ্তশিখাসম্পন্ন—তুমি মহাশক্তি সম্পন্ন।"

তৎপরে পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদীগমন এবং ব্যস্ত সমস্ত হোমের পরে শাট্যায়ন হোম করিতে হয়। সেই সময়ে "অগ্নে ত্বং বিধু নামাসি" বলিয়া

অগ্নির স্তব করিতে হয়—তাহাতে অগ্নির শ্মশ্রুর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

হায়! কালের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। নতুবা বিজাতীয় ভাব শনৈঃ শনৈঃ আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিত না। কাব্যতীর্থ মহাশয় ইংরাজীদর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পাস্ করা এবং বিজ্ঞানপরীক্ষায় ডাক্তার উপাধিলাভ করার প্রতি লুব্ধ ও ক্ষুব্ধ কটাক্ষপাত না করিয়া যদি মৌলিক গবেষণাবলে (Original research) স্বদেশীয় শাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিতেন—তবে কত তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিতেন এবং কতস্থলে দেবতার দাড়ী দেখিয়া দেবসভ্যতার মূলতত্ত্ব জানিতে পারিতেন।

কিন্তু শাস্ত্রানুসন্ধান ত দূরের কথা, নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহ সংস্কারে সর্ব্বদা উচ্চারিত অগ্নির স্তবেও যখন তিনি দেবতার দাড়ী দেখিলেন না তখন আর কি বলিব। আমরা বিদেশের ইতিহাস আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারি—কিন্তু দুই একটী প্রধান দেবতার স্তব অভ্যাস করি না।

কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশী দেবদেবীর চিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যমের দাড়ী সে এক ভয়ানক ব্যাপার"—তিনি কি মনে করেন যে চিত্রকরগণ গণ্ডমূর্খ যথেচ্ছাচারিতানুসারে চিত্র অঙ্কন করে? তাহা কখনই নহে। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুককর প্রসঙ্গ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে ঘূর্ণীর প্রসিদ্ধ কুম্ভকারগণ দশভূজা প্রতিমা গড়িয়াছিল। একজন পণ্ডিত সেইস্থলে উপস্থিত হইলে, কুম্ভকার জিজ্ঞাসা করিল—"পণ্ডিত মহাশয় প্রতিমা কেমন হইয়াছে?"—পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"প্রতিমা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্গাদেবীর বৃদ্ধাঙ্গুলি মহিষের উপর থাকায় বড় বিশ্রী দেখাইতেছে।" কুম্ভকার কহিল "মহাশয় কি করিব—"দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥" তখন পণ্ডিত মহাশয় অধোবদন হইলেন।

সুতরাং কাব্যতীর্থ মহাশয় যমের দাড়ী দেখিয়া যে কেন বিস্মিত হইলেন তাহা বলিতে পারি না। কারণ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২২৭ অধ্যায়ে যমের রূপ বর্ণনায় দেখিতে পাই—

"দংষ্ট্রা করালবদনং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণং।
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং প্রস্ফুরৎ সাধরোত্তরং॥

অষ্টাদশভুজং শুভ্রং নীলাঞ্জন চয়োপমং।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং ব্রহ্মদণ্ডেন তর্জ্জকং॥
মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নি সম লোচনং।
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেরুমিবোত্থিতং॥
প্রলয়াম্বুদ নির্ঘোষং পিবন্তমিব সাগরং।
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যমুদ্গিরন্ত মিবানলং॥” ইত্যাদি······

উপরোক্ত বর্ণনায় যমের দাড়ী যে, ভয়ানক হইবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। চিত্রকরগণ অবশ্য পৌরাণিক চিত্রই আঁকিয়া থাকে।

যাহা হউক দেবতাদিগের যে দাড়ী আছে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে দেবগণের ধ্যান একস্থলে একরূপ নহে, এমন কি একই পুরাণে একই দেবতার বিভিন্নরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। আমাদের দেশে মথুরা ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থলে যে সহস্র সহস্র মন্দির ছিল তাহাতে সকল প্রকার দেবমূর্ত্তি চিত্রিত ছিল। মামুদ কান্যকুব্জে ১০,০০০ দশহাজার এবং মথুরায় ১৬,০০০ ষোল হাজার মন্দির ভূমিসাৎ করেন। (Elliot's History of India and Al Berum Indica···দ্রষ্টব্য) ঐ সমস্ত মন্দিরে হিন্দুদেবসভা (Pantheon) চিত্রিত ছিল। সে সমস্ত এখন বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্বর্গের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে হইলে যবদ্বীপে যাইতে হয়। আজি সেখানে হিন্দুসভ্যতার উজ্জ্বলনিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। যবদ্বীপের বিরাট বলভদ্র মন্দিরে এবং ব্রহ্মবনের সহস্র মন্দিরে এখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ ও মহিষমর্দ্দিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে। তাহাতে শিবের “আনাভিলম্বিতকূর্চ্চ” দেখিতে পাই। (Crawford's History of the Indian Archipelago page 252-60) তদ্ব্যতীত Stamford Raffle's History of Java নামক পুস্তকের চিত্রসমষ্টিতে দেবতত্ত্বের অনেক রহস্য জানা যায়। Wilsen and Leeman's Boro Buddor নামক ৩৯৩ খানি Elephant folio যুক্ত চিত্রাবলীতেও দেবতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

শ্মশ্রু তত্ত্ব সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

পক্ষধর মিশ্রের মহত্ত্ব।

মিথিলাবিজয়ী পণ্ডিত শিরোমণি রঘুনাথ, যাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ উন্নত; যাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তৎসাময়িক স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে নবদ্বীপ, ন্যায়ালোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, তিনি মিথিলা নিবাসী মহাত্মা পক্ষধর মিশ্রের সর্ব্বপ্রধান প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। নৈয়ায়িক কুলপতি পক্ষধর মিশ্র মিথিলায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তৎকালে একমাত্র মিথিলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার উপায় না থাকায় পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতেই ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন।

১৪২১ শকাব্দে রঘুনাথও নবদ্বীপের শিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক মিথিলায় এই মহা পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করেন। তিনি পক্ষধরের চতুষ্পাঠীস্থ ছাত্রগণকে তর্কে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। পক্ষধর শিষ্যগণের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিতেন। কোনও ছাত্র সুক্ষ্মতর্কে যদি যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইত তবেই তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া পড়াইতেন। কিন্তু, রঘুনাথ কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের সেই চিরন্তন প্রথার লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাওয়া অবধি পক্ষধর আর ছাত্রের দিকে পৃষ্ঠ দিতে পারেন নাই।

পক্ষধর রঘুনাথকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন বটে, তিনি সময়ে সময়ে তর্ক উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। সে সময়ে মিথিলা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও উপাধি প্রদত্ত হইত না। এবং প্রদত্ত হইলেও সে উপাধি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইত না। এই কারণে মিথিলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করিয়া এবং তথাকার ন্যায়শাস্ত্রের টীকা সকল সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া টোল খুলিয়া

যাহাতে উপাধি দান করিতে সক্ষম হন এই চেষ্টায়ও তিনি মিথিলা আসিয়াছিলেন। মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব এই বাসনা রঘুনাথের হৃদয়ে চিরদিনই বলবতী ছিল।

মিথিলা ব্যতীত কোথাও ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি পাওয়া যাইত না। পক্ষধর মিশ্রও কাহাকেও সে পুঁথি একেবারে দিতেন না, অথবা তাহা নকল করিয়া লইতেও সম্মতি প্রদান করিতেন না। কিন্তু রঘুনাথের আন্তরিক বাসনা ঐ পুঁথি সংগ্রহ। শিক্ষা সমাপনান্তে নবদ্বীপ ফিরিবার সময় রঘুনাথ তাঁহাকে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাত করাইলেন। কিন্তু পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন রঘুনাথ পুঁথি নকল করিয়া লইবারও অনুমতি পাইলেন না, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। পক্ষধরকে দারুণ স্বার্থপর জ্ঞান করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিশ্র গুরুকে রাত্রিযোগে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে নিশীথের সমাগম হইল। হিংস্র জীব ব্যতীত সমগ্র প্রাণী বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। পক্ষধরের চতুষ্পাঠীও নীরব। ছাত্রেরা সকলেই নিদ্রাভিভূত। আকাশে শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র বিরাজমান কচিৎ বায়ু তাড়িত এক এক খণ্ড মেঘ আসিয়া সেই তুহিন শুভ্র দিগন্তব্যাপী চন্দ্র-কিরণ-মালাকে আচ্ছাদন করিতেছিল। এই সময়ে এক খণ্ড কাল মেঘ আসিয়া রঘুনাথের নির্ম্মল চিত্তকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে রঘুনাথ আজ উন্মত্ত! গুরুহত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প। এই গভীর নিশীথে দৃঢ় মুষ্টিতে ভীষণ ছুরিকা ধারণ করিয়া রঘুনাথ পক্ষধরের দ্বারদেশে আসিয়া বসিলেন। আর পক্ষধর এখন অনন্ত সুখে মগ্ন। সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি এখন নানা প্রেমালাপে ব্যাপৃত। নানা প্রকার বাক্যালাপের পর পক্ষধরের সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পারেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ বস্তু আপনার নিকট নির্ম্মল বলিয়া বোধ হয়? আকাশের ঐ চন্দ্র, না আমি, না আপনার সন্তান?" পক্ষধর ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "যদি প্রকৃত কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, আর যদি প্রকৃত কথা আমাকে বলিতে হয়, তবে বলিব আমার

ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে নবদ্বীপ হইতে নবাগত নবা যুবক রঘুনাথের বুদ্ধিই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল! চন্দ্রেও কলঙ্কের ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, রঘুনাথের বুদ্ধিতে সে রেখার এক বিন্দুও নাই।" হত্যা-আশে মত্ত রঘুনাথের কর্ণে এ কথা পৌঁছিল। রঘুনাথ স্তম্ভিত হইলেন, দূরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আপনার শিক্ষা, আপনার বুদ্ধির উপর ধিক্কার দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বাহিরে ক্রন্দনের স্বর শুনিয়া পক্ষধর বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন ভূমিতলে অস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আর রঘুনাথ কাঁদিতেছেন। পক্ষধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি রঘুনাথ?" রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের পা জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব, আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন! বলুন, কোন্ প্রায়শ্চিত্তে আমার এ পাপের শেষ হইবে? পুঁথির নকল পাই নাই বলিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে ঐ ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তুষানলই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।" পক্ষধর রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এই অনুতাপই তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। বৎস, দেখিতেছি তোমার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমার বাটীতে তুমি আরও কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে দেশে যাইও। তুমি আমার সন্তানের তুল্য, আমার গৃহেই তুমি বাস কর।" বলা বাহুল্য, রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং অসাধারণ স্মৃতি শক্তি প্রভাবে সেই সকল পুঁথি তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ রায়।

রাঠোর বালক।

(চতুর্থ সর্গ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি নীরবিল বীর
নেত্রদ্বয় পূর্ণোজ্জ্বল রক্তিম বরণ—
যথা ভীমসেন আঁখি—যবে দুঃশাসন
আকর্ষিল পতিব্রতা কৃষ্ণার বসন।
সমগ্র রাঠোর সেনা নিশ্চল নির্ব্বাক
প্রস্তর নির্ম্মিতপ্রায় সম্মুখে তাঁহার
জীবন প্রবাহগতি মাত্র জ্ঞান হয়
নিরখি সে রক্তস্রোত বদনে নয়নে—
চক্ষে অগ্নিরেখা। মুছি স্বেদধারা
দ্বিগুণ উৎসাহে বীর পুনঃ আরম্ভিল—

"শিশোদিয়া কুলরবি বাপ্পাধুরন্ধর
বাল্যকালে বনে বনে—নগণ্য গোপাল
বিতাড়িত যুবাকালে স্বদেশ বাহির—
কতক্ষণ থাকে অগ্নি ভস্ম আবরিত ?
দীপিল জ্বলিল যবে চৌদিক উজলি
স্থাপিল এ পুণ্যরাজ্য ধর্ম্মসনাতন।
চিতোরের একছত্র বীর অধিপতি
আপনার বংশ তরু সম্মানকুসুমে
করিলেন কুসুমিত। বিজয় পতাকা
উড়িল সগর্ব্বে তাঁর পারস্য অবধি।

নিল দীক্ষা প্রজাগণ পুত্র পরিজন
মন্ত্র তার—স্বাধীনতা, স্বাধীন জীবন—

সুখ হইবে। কিন্তু শারীরিক সুখই কি সর্ব্বস্ব? সুরেশকে লইয়া কি সুনীতি সুখী হইবে? না হইবার কারণও কিছু পাইলাম না।

তার আসিল, ট্রেণ আসিতেছে। ফরাসকে বলিলাম "বাতি বারো।"

ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

কবিতা-কুঞ্জ।

শয়তানের প্রতি।

শয়তান! পূর্ণ তব হিংসা অভিলাষ
কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে ভুলাইয়া নারী
কি ফল খা(ও)য়ালে তুমি সুখশান্তি নাশ
চরিতার্থ প্রতিহিংসা—নাগর নাগরী
মিশে ছিল কি মিশ্রণে নন্দন ভিতর—
ক্রূরকর্ম্মা স্বর্গভ্রষ্ট! কেমনে স্থাপিলে
ভয় লজ্জা মান আদি এত ব্যবধান?
নির্ম্মল শরতচাঁদ কেন কলঙ্কিলে
রহিলে গো অবিচল কাঁদিল না প্রাণ?
সেই সে অতুল প্রেম অতীব সুন্দর
নাহি গুরু নাহি লঘু সব একাকার
পরমেশ প্রীত মনে দিয়াছিলা যারে
সৃষ্টির গরিমা তার প্রতিকৃতি নরে
আর কি ভুঞ্জিবে কেহ অবনী ভিতর?

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

তীব্র কিছু দাও।

প্রদীপের মিটি মিটি
তুষানল ধিকি ধিকি
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে পুনঃ নিভে যায়—
এই যে অলস সুখ
এই যে অলস দুখ
পারি না সহিতে আর
দাও কিছু উগ্রতর যা হয় তা হয়।
দাও তীব্র শেলাঘাত
উপেক্ষার বজ্রাঘাত
ছিঁড়ে যাক হৃদি তার, নিভে যাক সুর
মর্ম্মভেদী হাহা স্বরে
বিশ্বখানা ভেঙ্গে চুরে
ছুটুক শোণিত স্রাব অগাধ প্রচুর।
কিম্বা—
ভোগবতী গঙ্গা প্রায়
ফল্গুনির শর যায়
বহুক প্রেমের উৎস কেটে যাক ঘোর
হৃদয়টা দ্রব করে
তোর সনে মিশাইয়ে
ছুটাই অনন্তপথে হইয়ে বিভোর।

শ্রীউমাচরণ ধর।

প্রয়াগে।

আজি এ প্রয়াগ তীর্থে প্রশান্ত সন্ধ্যায়,
পবিত্র সঙ্গমে বসি গঙ্গা যমুনার,
মনে হয় ভেসে ভেসে চলেছি কোথায় ;—
ভুলিয়া গিয়াছি প্রিয় স্বদেশ সংসার!
হে ধরণী! তব স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চল,
কি করুণ স্নেহে হেথা দেছ বিছাইয়া,
দূর দূর বহুদূর চির সমুজ্জ্বল
কি সুন্দর ছবি চোখে রেখেছ ধরিয়া।
প্রয়াগে দুইটি তব করুণার ধারা
মিলিত হয়েছে কিবা মধুর উচ্ছ্বাসে
নীল কালিন্দীর নীর; রজতের পারা
গঙ্গার হিল্লোল সহ কি শোভা বিকাশে।
বিরাম বিহীন আঁখি আসিছে মুদিয়া,
কে যেন তৃপ্তির সুধা দিতেছে ঢালিয়া।

বৈদ্যনাথ।

কি চারু সৌন্দর্য্য ভরা প্রকৃতি আশ্রমে
হে শিব মন্দির তব! পুণ্য তপোবন!
কি শ্যামল শৈল শোভা চির আঁখি রমে;
মনে হয় দেবতার ত্রিদিব সদন।
বহিছে রজত নদী প্রান্তর বেড়িয়া,
বনফুল বাসে আহা মুগ্ধ প্রাণমন।
কত পাখী প্রজাপতি হৃদয় মোহিয়া,
উন্মুক্ত পবন পথে করে বিচরণ।
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী সিংহলের পথে
যান যবে লঙ্কেশ্বর তোমারে লইয়া
অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁর চূর্ণি মনোরথে
রচি রম্যতীর্থ হেথা রহিলে বসিয়া।
জরামৃত্যুহরা তব স্বাস্থ্য নিকেতন,
বৈদ্যরূপে বৈদ্যনাথ প্রিয় দরশন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মাসিক পত্রিকা।

(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ।] কার্ত্তিক ১৩১১। [নবম সংখ্যা।

গীতা।

১। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিনটী জীবের নিঃশ্রেয়সের ক্রম। সত্য কথা, যোগী ভক্ত এবং জ্ঞানী সাধনাবস্থায় নিতান্ত স্বার্থপর। কিন্তু যোগ-পথে যিনি আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার জন্য কর্ম্ম যেরূপ আবশ্যক ইঁহাদের সিদ্ধাবস্থায়ও সেইরূপ আবার কর্ম্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতের আদিতেও কর্ম্ম এবং শেষেও কর্ম্ম। আদিতে যে কর্ম্ম তাহার উদ্দেশ্য একদিকে নিজের চিত্তশুদ্ধি অন্যদিকে যথাসাধ্য জগৎরক্ষার চেষ্টা; কিন্তু শেষে যে কর্ম্ম সে কর্ম্মের লক্ষ্য জীবে দয়া, জগতের প্রকৃত রক্ষা। যে ব্যক্তি নিজে আধি ব্যাধি জরা মরণাদি মৃত্যু সংসার সাগর অতিক্রম করিতে পারে নাই সে ব্যক্তির জগৎরক্ষার সাধ্য কোথায়? আত্মরক্ষার ক্রম না জানিয়া জগৎরক্ষা করিতে গেলে জগতের প্রকৃত অভ্যুদয়ও হয় না আত্মবিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এজন্য গীতা বলিতেছেন আত্মরক্ষার কর্ম্ম যাহা তাহাতে জগচ্চক্র পরিচালনার ব্যাপার রহিয়াছে। "যজ্ঞ শিষ্ঠাশনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ।" যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে

মুক্ত হয়েন কিন্তু যাহারা নিজের জন্য পাক করে সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে। ৩।১৩

২। গীতা তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে যোগ দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি এবং তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞান। বেদের বিভাগও এই তিনটি—কর্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ড। ভগবান ব্যাসদেব, ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই ক্রমই শিক্ষা দিয়াছেন। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই ক্রমের ব্যতিক্রমে ধর্ম্ম জগতে অনিষ্ট আছে। এজন্য ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

৩। কর্ম্ম ভক্তি এবং জ্ঞানের ক্রম—

"ইদানিং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব
ভবদারাধনং লোকে যথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥৮
ইদমেব সদা প্রাহু র্যোগিণো মুক্তি সাধনম্
নারদোঽপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥৯
ব্রহ্মক্ষত্রাদি বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মোক্ষদম্
স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র সুলভং মুক্তি সাধনম্ ॥১০ অঃ রা কিঃ ৪।

রাঘব এক্ষণে জগতে যোগিগণ যেরূপ ক্রিয়ামার্গ অবলম্বনে আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন সেই পদ্ধতি অবগত হইবার বাসনা করি। কমল যোনি ব্রহ্মা, ভগবান ব্যাস, দেবর্ষি নারদ এই সকল যোগী ইহাকেই মোক্ষ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি এবং স্ত্রী শূদ্রাদির বিভিন্নতা নাই, সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের লোকই ইহা হইতে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মুক্তিই জীবের প্রয়োজন। জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। "তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈশ্চ সম্ভোসস্যাঽহমস্তথা ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনো। তদাবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়।" মহাদেবও বলিতেছেন "তাবৎ ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে". (পীঠমাল তন্ত্র।৮।২১) কিন্তু বিনা ভক্তিতে জ্ঞান হইবেনা। "মদ্ভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রগাত্রেষু মুহ্যতাম্ ন জ্ঞানং ন মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্ম শতৈরপি" ॥ (ব্যাসদেব অঃ রা রামহৃদয়)। যেখানে ভক্তিকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে সেখানে ভক্তিদ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি এই ক্রম শাস্ত্রে দেখা যায়।

প্রসঙ্গেঽধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিত্তকারঃ
মুক্তিং যাস্তীতি তদ্ভক্তি মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥ অর রা অরণ্য ১০।৪৩।

ভক্তিকেই যেখানে মুক্তি বলা হইয়াছে সেখানে ভক্তির পরে জ্ঞান এবং জ্ঞানে মুক্তি ইহাই ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত। শবরীকে ভগবান রামচন্দ্র যে ভক্তি সাধনা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার ক্রম দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

ভগবান রামচন্দ্র বলিতেছেন—

পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো রা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ
ন কারণং মদ্ভজনে শক্তিরেব হি কারণম্। ২০
যজ্ঞ দান তপোভির্বা বেদাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ।
নৈবদ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা॥২১
তস্মাৎ ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতি রেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্॥২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥২৩
আচার্য্যো পালনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ॥২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠ সাধন মীরিতম্
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তম মুচ্যতে॥২৫
মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদি সহিতং তথা॥২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি সাধনং যস্য কস্য বা॥২৭
স্ত্রীয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌ যোনি গতস্য বা।
ভক্তি সঞ্জায়তে প্রেম লক্ষণা শুভ লক্ষণে॥২৮
ভক্তৌ সঞ্জায় মাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা
মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মসি॥২৯

স্যাত্তস্মাৎ কারণং ভক্তি র্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তি মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্॥

ভক্তি সাধনার অঙ্গ তত্ত্ববিচার। এই তত্ত্ববিচার দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে মুক্তি লাভ হয়। এইজন্য ভক্তি হইতে মুক্তি হয় ইহা বলা হইয়াছে। যেকালে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন সেইকালেও কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই যে মুক্তির ক্রম এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। এইজন্য ভগবান শঙ্কর স্পষ্টাক্ষরে ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তির ক্রম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেবের মতই সমর্থন করিয়াছেন।

"নতুজ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তি শতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায় শতৈরপি॥

জ্ঞান বিনা শতযুক্তিতেও মুক্তি নাই আবার ভক্তি বিনা শত উপায় অবলম্বন করিলেও জ্ঞান সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির্জ্ঞানংতথামুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্টাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ।

অগ্রে ভক্তি পরে জ্ঞান পরে মুক্তি ক্রমই সাধারণ ক্রম। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত।

৪। ভক্তির পূর্ব্বাবস্থা যোগ। এই যোগের দুই অঙ্গ। প্রথম নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয় ধ্যান। গীতা বলিতেছেন যাঁহারা যোগপথ আরোহণেচ্ছু তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেন। গৃহে থাকিয়াই এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ অবধি সাধনা করা যায় কিন্তু যাঁহারা যোগারূঢ় তাঁহাদিগকে নির্জ্জন স্থানে গিয়া সাধনা করিতে হইবে।

আরুরুক্ষোর্মুনে যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

'আরুরুক্ষুর সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম কিন্তু যোগারূঢ়ের কর্ম্ম আত্মসংস্থ যোগ। এই আত্মসংস্থ অবস্থাতে সাধক "সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ শনৈ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যাবৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"॥ ইহা ধ্যানযোগ, এই ধ্যানযোগ হইতেও

ব্যুত্থান হয় এজন্য গীতা যোগের পরে ভক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ"

৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধ্যান যোগের পূর্ব্বাবস্থায় সাধক গৃহী। এই সময়ে তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেন। এই কর্ম্ম লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। গমন ভোজনাদি সমস্ত কর্ম্মকে লৌকিক কর্ম্ম বলে এবং যজ্ঞ দান তপস্যার নাম বৈদিক কর্ম্ম। এই উভয়বিধ কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। ভগবান্ বলিতেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি যদাপি যৎ
যত তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণং॥

"করোষি অশ্নাদি" কর্ম্ম লৌকিক কিন্তু যজ্ঞ দান এবং তপস্যা বৈদিক। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে যখন ভগবৎ প্রসন্নতা অনুভূত হইতে থাকিবে, যখন ভগবৎ আনন্দে হৃদয় প্লাবিত হইতে থাকিবে তখনই একান্তে আত্মসংস্থ যোগ সাধনের সময় আসিবে। তাহার পরে ভক্তিযোগ সাধনা।

৬। প্রথম ষটুকে আত্মসংস্থ যোগ পর্য্যন্ত যে যে ক্রম গীতা দেখাইয়াছেন আমরা তাহা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ এবং ধ্যানযোগ এই ছয়প্রকার যোগের কথা আছে। গীতার প্রতি ষট্কেই সাধক, সাধনা এবং সাধ্য এই তিন দৃশ্য আছে; আমরা সংক্ষেপতঃ সাধনার কথাই বলিব। সাধনার কথা বলিতে গেলে যতটুকু সাধ্যবিষয় বলা আবশ্যক তাহাও গীতার ক্রম মত আলোচনা করিব।

৭। গীতা শাস্ত্রে একটি অধ্যায়ের সহিত আর একটি অধ্যায়ের সম্বন্ধ ক্রম বড়ই স্বাভাবিক। আমরা প্রথম ষট্কের এই অধ্যায় সম্বন্ধ দেখাইব। গীতা পরিচয়ে ইহাও নিতান্ত আবশ্যকীয় তত্ত্ব।

৮। গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদ যোগ। কেহ কেহ সৈন্যদর্শন যোগও বলেন। সৈন্যদর্শনেই বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল এজন্য এই অধ্যায়কে সৈন্যদর্শন বিষাদযোগ বলা যাইতে পারে। "শোকসংবিগ্ন মানসঃ" এই বাক্যে অধ্যায় শেষ হইয়াছে। গীতা শাস্ত্রে কোথাও নিরর্থক শব্দ নাই কোথাও ক্রমবিভ্রাটও নাই। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু সকল মনুষ্যই কর্ত্তব্য

প্রতিপালন করিতে গিয়া কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া প্রায় লোকে শোকসংবিগ্ন মানস হইয়া থাকে।

৯। যে কারণেই হউক লোকে শোকসংবিগ্ন মানস হইলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মগ্রহণরূপ ব্যভিচার করিয়া থাকে। ইহা হইতেই ধর্ম্ম ও সমাজের ব্যভিচার উপস্থিত হয়, পরে জাতিরও অধঃপতন হইতে থাকে। সংসারে এরূপ মনুষ্য কে আছে যে শোকসংবিগ্ন মানস নহে? ব্যক্তি পরিবার সমাজ জাতি কোথায় শোকের অভাব? জগৎ হইতে এই শোক দূর হইবে কিরূপে?

১০। শোকের নিবৃত্তি দুই প্রকার। (১) ক্ষণিক নিবৃত্তি। (২) আত্যন্তিক নিবৃত্তি। যাহারা শোকের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র চেষ্টা করেন তাহারা ব্যবহারিক জগৎ মাত্র দর্শন করেন। ইঁহারা প্রবৃত্তি মার্গের জীব। ইঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্লেশভোগ করিতে হইবেই। কিন্তু যাঁহারা শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা নিবৃত্তি মার্গের জীব। ইহারা নিত্য আনন্দ প্রাপ্তি ভিন্ন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারেন না। যে পথে গমন করিলে ক্রম অনুসারে চির আনন্দ লাভ করা যায় তাহাকে আমরা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ বলিলাম। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গই গীতার পথ।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সুনীতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

তাহার পরদিন প্রভাতে মিরপুর হইতে একখানি পত্র পাইলাম। নব কুমার বাবু লিখিয়াছিলেন—

মিরপুর
১১ই ফাল্গুন।

কল্যাণবরেষু—

জ্যোতি অনেকদিন তোমার পত্রাদি পাই নাই কেন? আশাকরি ভগবদকৃপায় তুমি সুস্থশরীরে আছ।

অধুনা আমাদিগের বড় একটী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তোমায় এতাবৎকাল বলি নাই আমাদের স্ত্রীপুরুষের একান্ত ইচ্ছা ছিল তোমার সহিত সুনীতির বিবাহ হয়। সম্প্রতি তোমার সেই অতিথি সুরেশচন্দ্র তাহার করপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিয়াছে। যদ্যপি অর্থে সুখ থাকে এবং পিতামাতা কন্যার সুখ প্রত্যাশী হয় তাহা হইলে এরূপ বিবাহে অমত প্রকাশ করা অবিধেয়। কিন্তু সুরেশচন্দ্র ধনী যুবক কিরূপ স্বভাব চরিত্র কিছুই জানা নাই। সুনীতির মাতা একান্ত অসম্মত।

যদ্যপি আপত্তি না থাকে তোমারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব মনস্থ করিয়াছি। আমি দরিদ্র, বড় লোক জামাতা করিলে যথাযোগ্য সম্মান পাইব না আশঙ্কা করি; তাই গৃহিণীর যুক্তিই উপযুক্ত মনে করিতেছি। যাহা হউক এ বিষয়ে তোমার মতামত লইয়া কার্য্য করিব। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনবকুমার শর্ম্মা।

পূর্ব্বে হিন্দুবিধবার যখন সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তখন তাহার আত্মীয় স্বজন চিতা প্রস্তুত করিয়া দিত, সাধ্বী তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া হৃদয়ের মহত্ব সাহসিকতার সুউচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইত। কিন্তু আমার হস্তে নবকুমার মুখোপাধ্যায় যে ভার দিয়াছিলেন তাহাতে আমার অধিকতর সাহস ও উদারতার আবশ্যক হইয়াছিল। আমি বুঝিলাম আমার আপনার চিতা আপনি সাজাইয়া তাহাতে আপনার কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে। একবার ভাবিলাম—কেন এত কথায় কাজ কি, আমি ইচ্ছা করিলেই ত সুরেশকে রণক্ষেত্র হইতে তাড়াইতে পারি, আর তাহার পর—ছি! ছি! ঘোর স্বার্থপরতা! ইহার নাম প্রণয়, ইহার নাম আত্মত্যাগ?

তাহার কথামত যথাসময়ে সুরেশ আসিয়া পৌঁছিল। আজ তাহার সুন্দর মুখের হাসি আমায় বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহার কুঞ্চিত কেশদাম দেখিয়া আমার হৃদয়ে সর্পভীতি উপস্থিত হইতেছিল। সুরেশ বলিল—কিহে আমার চিঠি পড়িয়া আমার দুর্দ্দশার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ

ত? আমার এখন আপনা আপনি হৃদয়ে কবিত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে। লিখিলে বোধ হয় তোমা অপেক্ষা সুন্দর কবিতা লিখিতে পারি।

আমি অনেক কষ্টে একটু হাসিলাম, বলিলাম—তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার ভালবাসা love at first sight—সেরূপ প্রণয়ের জোরটা কিছু বেশী হয়।

সুরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, তাহা তুমি কি বুঝিবে। যদি কখনও বাস্তবিক ভাল বাসিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিবে ভালবাসার কিরূপ উৎপীড়ন।

হা অদৃষ্ট! যদি কখনও ভাল বাসিয়া থাকি? বড় লোকের ছেলেরা যে সাধারণতঃ নির্ব্বোধ হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহা না হইলে সুরেশ আমার চিন্তাক্লিষ্ট কালিমালেপিত মুখখানা দেখিয়া বুঝিতে পারিল না আমার হৃদয়ের মধ্যে কি পাবক পুষিয়া রাখিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল সুরেশের জন্য আমি স্বয়ং মিরপুরে যাত্রা করিব এবং যথাশক্তি চেষ্টা করিব যাহাতে সুরেশের সহিত সুনীতির মিলন হইতে পারে সুরেশের প্রেমটা সত্য কিনা, তাহার সুনীতির জন্য বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে তুফান উঠিতেছিল কিনা তাহা বিশেষরূপে জানিয়া লইলাম। দেখিলাম বালিকা কেবল একজন নিরপরাধীকে বিষপান করাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার প্রদত্ত বিষের জ্বালায় সুরেশও জ্বলিতেছিল। আরও কতজনকে এরূপ ভাবে দগ্ধ করিয়া সুনীতি যন্ত্রণা দিতেছিল তাহা কেমন করিয়া জানিব। হায় হায়, ভগবান্ সর্ব্ববিদ্ হইয়া এরূপ প্রাণহন্তা জীব সৃষ্টি করিয়া কেন পৃথিবীতে দীর্ঘনিশ্বাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন?

(৬)

নবকুমার বাবুকে বিদিমত বুঝাইলাম—সুরেশের প্রণয় প্রকৃত, তাহার চরিত্রে আমি এ পর্য্যন্ত দূষণীয় কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহাতে দোষ থাকিলে নিশ্চয়ই আমি জানিতে পারিতাম। তাহাদের বংশ প্রসিদ্ধ এবং এককথায় তাহার হস্তে পড়িয়া সুনীতি দুঃখিনী হইবে না। নবকুমার বাবু এসকল কথা বুঝিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সহজেই একথা বুঝিলেন এবং আমার কথামত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীজাতি কিন্তু কোন কথা সহজে নিঃসন্দেহে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না।

গৃহিণী বলিলেন—তোমরা যাহা ভাল বুঝ তাহা কর। আমি মেয়ে মানুষ, অত শত বুঝিনা। আমরা সামান্য লোক, আমাদের বড়লোক কুটুম্বে কাজ কিগা? আমার কথা শুন তবে যা এতদিন বলছি তাই কর, জ্যোতির সঙ্গে সুনীতির বিবাহ দাও।

হরি! হরি! মুখরা স্ত্রী স্বামীর মুখখানি শুকাইয়া দিল। নবকুমার বাবু মহা অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—হ্যাঁ তবে কি জান? জ্যোতি ঘরের ছেলে তাই।

আমি লজ্জায় আশায় বিস্ময়ে কথা কহিতে পারিলাম না। তবে ত আমার ভাগ্যটা বেশ করিয়া যাচাই করা হইয়াছে। আমায় না দেখিয়া না বিচার করিয়া ইহারা পরিত্যাগ করিতেছে।

যাহা হউক কতক আমার বাগ্মীতার জোরে, কতক কর্ত্তার জমিদারের শ্বশুর হইবার আশায় শেষে ঠিক হইয়া গেল সুনীতির জীবন ধনাঢ্য সুরেশের জীবনের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত হইবে।

আমি ফিরিয়া আসিবার সময় ভাবিলাম একবার সুনীতির সহিত দুইটা কথা কহিয়া যাই। ইহার পর পরস্ত্রী হইলে তাহাকে দেখিলেও পাপ হইবে। কিন্তু দুঃখীর দুঃখতামসের মধ্যে যদি চন্দ্রিমা উদিত হয় তাহা হইলে সে আবার দুঃখী কিসে? সুতরাং বিধি সে সাধে প্রতিবাদী হইলেন। আমাকে দেখিয়া সুনীতি সরিয়া গেল। তাহার বদনে বিরক্তির স্পষ্ট লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। ভাবিলাম বিরক্ত ত হইবেই। এ তোমার দোষ নহে, সুনীতি, এ মনুষ্যচরিত্র। যখন গল্প শুনিতে, উপদ্রব করিতে তখন কত বাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়াছি, আর কি তোমার মনে স্থান পাইতে পারি?

যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিলাম; যথাসময়ে সুরেশ আসিল; যথাসময়ে তাহাকে শুভ সংবাদ প্রদান করিলাম, সুরেশ মহাখুসী। আমার ষ্টেসনের ধূলাপূর্ণ জীর্ণ টেবিল চাপড়াইয়া বসিল! capital chap! ভাই তোমার মত বন্ধু আমার আর নাই।

আমি মনে মনে ভাবিলাম আর তোমার মত—যাক্ সে কথা!

ক্ষণিক বাদানুবাদের পর সুরেশ এক রহস্যময় প্রস্তাব করিল। সে যখন জীবনে সুখী হইতেছে এবং তাহার সুখের যখন আমিই কারণ তখন সে আমায় সুখী না করিলে সেটা অকৃতজ্ঞতা হয়।

সুরেশের একটি আত্মীয়া আছে। বালিকা সুরূপা, তাহাকে আমার বিবাহ করিতে হইবে।

ইংরাজীতে যাহাকে adding insult to injury কহে এ তাহাই হইল। আমি কোথায় মরিতেছি আপনার ক্ষতে, হৃদয়ের একটি গুপ্ত সংবাদ লইয়া তাহার উপর আবার এ এক রহস্য! খুব তর্ক বিতর্ক বাক্ বিতণ্ডা হইল। সুরেশ বলিল, এ বিষয়ে তোমার মাতা বিশেষ সম্মত। আমি ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছি এবং তাঁহাকে শীঘ্র আমার বাটীতে লইয়া আসিব।

বাস্তবিকই ত। আমি কি আমার সমস্ত জীবনটা কাঁদিয়া কাটাইব। আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? যদ্যপি ভাঙ্গা হৃদয়ের ভগ্নাবশেষ গুলা নূতন মিস্ত্রী আসিয়া জোড়া তাড়া দিয়া নূতন করিয়া আবার হৃদয় গাঁথিতে পারে ভালইত। মাতারও ত সখ আছে। অলস ভাবে সম্মত হইলাম। ভাবিলাম তাহা করিয়াই কি এ প্রতিমা হৃদয় হইতে মুছিতে পারিব? আমার মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না। সুরেশ সম্মতি লইল।

সুরেশ বলিল—তোমার বিবাহ অগ্রে হইবে। তথাস্তু! মরিতে বসিয়া আর অগ্র পশ্চাত কি?

(৭)

আমি এখন পরিণীত। আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার বিবাহে শঙ্খ বাজিয়া ছিল। পুরনারীরা হুলুধ্বনি দিয়া ছিল। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়াছিল। সকলই হইয়াছিল। দেব বৈশ্বানর সাক্ষী হইয়াছিলেন।

আমি যে পরিণীত সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিবাহের পর খেয়াল চাপিল কাহার সহিত বিবাহ হইল? কেন সুরেশের আত্মীয়ার সহিত। সুরেশের আত্মীয়া বড় লোকের আত্মীয়া। বিবাহ সম্বংশেই করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমার সহধর্ম্মিণীটি দেখিতে কেমন! আমি বিবাহিত, আমার সহধর্ম্মিণী কেমন দেখিতে তাহা দেখি নাই? বা, তবে ত আচ্ছা বিবাহ করিয়াছি।

বিবাহের সময়ে কেমন করিয়া ছাই বধূর মুখ দেখিব? বিবাহ ত

করিয়াছিলাম মাতার হৃদয়ে সুখ দিবার জন্য, নানা প্রকার প্রশ্ন এড়াইবার জন্য, প্রাণের আগুন নিভাইবার জন্য। এই প্রাণের আগুনই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। এত বড় একটা শুভকার্য্য হইয়া গেল, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে চিরদিনের জন্য দুইটা পবিত্র জীবাত্মার দেবতার সমক্ষে একত্রে বন্ধন হইল কিন্তু পোড়া প্রাণের আগুন বক্ষে একটা চাঁদ মুখের বালিকার ছবি আঁকিয়া তাহার দৃষ্টি লোপ করিয়াছিল, অর্দ্ধাঙ্গিনীর মুখ খানা দেখিতে পাইলাম না।

আবার মন্ত্রের সময় পুরোহিত কি একটা নাম বলিয়াছিলেন আমার স্মরণ আছে আমি কিন্তু সুনীতির নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া ছিলাম। না না, পুরোহিত যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তাহাই বলিয়াছিলাম। কেন পুরোহিত ত সুনীতিই বলিয়াছিলেন। বাহবা বাহবা, ইহারও নাম সুনীতি। কিন্তু এ সুনীতি দেখিতে কেমন?

এইরূপ সাত পাঁচ মাথা মুণ্ড ভাবিতেছিলাম, হাসিতে হাসিতে সুরেশ আসিল, বলিল কিহে কেমন বধূ হইয়াছে?

সর্ব্বনাশ, ভাবিলাম যখন আমার বধূ হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে সুন্দর। বলিলাম তোমায় ভাই কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব বলিতে পারি না। বেশ বধূ হইয়াছে। তবে তখন লজ্জায় তাহার মুখ খানা দেখিতে পাইনাই এখন একবার দেখাইতে পার।

হাসিতে হাসিতে বন্ধু আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। দেখিলাম বধূ পার্শ্বের গৃহে একগলা ঘোমটা টানিয়া স্থির হইয়া কলাবধূর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। বধূর মুখের কাপড় খুলিয়া মুখুয্যে গৃহিণী হাসিয়া বলিল, "বাবা ভগবান্ আমার কথা শুনিয়াছেন। দেখ বধূর মুখ দেখ।"

আঃ সর্ব্বনাশ! এযে নবকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা—আমার জীবনের আরাধ্য প্রতিমা সুনীতি!!!

* * * * * *

সুরেশ বলিল—আমি এককথায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম বালিকা সুনীতির শ্রীপদে তুমি তোমার হৃদয়খানি বিক্রয় করিয়াছিলে। তোমার মনের ক্ষমতা

পরীক্ষা করিবার জন্য এ খেলা খেলিয়াছিলাম। তোমার স্মরণ নাই আমি বিবাহিত।

আমি বলিলাম—বটে! সুরেশ বলিল, তাহার পর যখন তুমি আমার বিবাহ স্থির করিয়া আসিলে আমি স্বয়ং মিরপুরে গেলাম। মুখুয্যে মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি সম্মত হইলেন।

তাহার পর সুনীতি আমায় সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। শেষে সে লজ্জার মাথা খাইয়া তাহার মাতাকে বলিয়াছিল সুরেশের সহিত বিবাহ হইলে সে বিষ খাইবে। সে আমায় বলিল—তোমার কিন্তু খুব ভালবাসা। এক কথায় অপরের সহিত পরিণীত হইতে সম্মত হইলে।

আমি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলাম—আহা! সে সব পুরাণ কথা ছাড়িয়া দাও সুনীতি।

সমাপ্ত।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সভ্যতা ও স্বাধীনতা।

জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ স্পৃহাটা পাশ্চাত্য জগতে বহুদিবসাবধি বলবতী। আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকার শ্বেতকায় অধিবাসীরা স্বাধীনতা শব্দ শুনিলে আনন্দে নৃত্য করে এবং তাহাদের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতেছে এরূপ একটা জ্ঞান মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে ধন, মান, জীবন, পরিবার সকলই ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যবাসী অসি ধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্থাপন সময়ে এই স্বাধীনতা ক্রয় করিবার নামে যে পরিমাণে শোণিতপাত হইয়াছিল, মানব প্রকৃতির মহান্ লুক্কায়িত গুণরাশি যে প্রকার দুর্দ্দমনীয় অমানুষিক ভীতিপ্রদ বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা ভাবিতেও হৃৎপিণ্ডের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। স্বাধীনতা পাইতে প্রকৃতপক্ষে ফরাসী জাতি ক্রমে অধীনতা ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু

তাহাদের মুখে "স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব" এ কথা সর্ব্বদাই শ্রুত হইত।

এই স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা ইউরোপের নূতন নহে। এ মন্ত্রে বহু পূর্ব্বে আথিনিয়ান দীক্ষিত ছিল, এই মন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া রোমান্ টারকুইনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্রের বিধান করিয়াছিল, এই মন্ত্র সাধিবার জন্যই ব্রুটাস তাহার প্রিয় সুহৃদ্ জুলিয়াসের বক্ষে গুপ্তহত্যার নির্দ্দয় ছুরিকা আমূল বসাইয়া দিয়াছিল। নেদারলাণ্ডের ইতিহাসটাই একটী স্বাধীনতা লাভের পরিশ্রমের গল্প। ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয়বিধ স্বাধীনতাই ইউ-রোপীয়ের প্রিয় এবং স্বাধীনতা শব্দে সকল ইউরোপীয়ের হৃদয়তন্ত্রী সুমধুর সুরে গীত গাহিয়া উঠে।

স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার নামই স্বাধীনতা। মানব পশু নহে। সে সকল কার্য্যই হিতাহিত বিচার করিয়া করিতে জানে, পশুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মানব কখনও একই বাঁধাপথে চলে না। আমার বিচার ফলের মত কার্য্য যদ্যপি কাহারও প্রতিরোধ ব্যতিরেকে কোনও বাধা বিঘ্ন না পাইয়া সাধিত হইতে পারে, যেমন মনের ইচ্ছা ঠিক সেই ভাবে মনুষ্য কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার কার্য্যকে আদর্শ স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে। ঠিক মনের প্রবৃত্তি ও মানসিক ভাবের অনুযায়ী কর্ম্ম করাকেই আমার বিশ্বাসে স্বাধীন কর্ম্ম বলে। যে জাতি যাহা ইচ্ছা সেই মত ব্যবহার আইনাদি প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, যে জাতির আইন করিবার সময় অপর জাতির মুখ চাহিতে হয় না বা অপর জাতির সুবিধা অসুবিধা, সন্তোষ বা রোষের বিষয় চিন্তা করিতে হয় না, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার আদর্শ অনুসারে সেই জাতিই স্বাধীন। সে জাতি শুধু আপনার জাতীয় ইচ্ছারই একমাত্র অধীন, অপর কোনও জাতির অধীন নহে। ঠিক সেই চক্ষে দেখিলে, আদর্শ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থে তাহার আপনার সুখস্বচ্ছন্দতা, আহার বিহার করিবার অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে মানবের হস্তে ন্যস্ত করা। যে ব্যক্তি তাহার জীবনসংগ্রামের সমস্ত ভারটুকু স্বকীয় করে লইয়া যথাইচ্ছা অপ্রতিহত ভাবে অস্ত্র চালনা করিতে পারে, যাহার আত্ম সংরক্ষণজনিত বা আত্মসুখকর কার্য্য করিতে অপর কাহারও প্রতিরোধ সহ্য করিতে হয় না তাহাকেই স্বাধীন মানব বলা যাইতে পারে।

আমরা শুনি জগতের সভ্যতা বিস্তারের একটী অঙ্গ জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন করা। অবশ্য ইহা অপেক্ষা সাধু উদার বৃত্তি ধারণা করা দুরূহ। সকলেরই মুক্তির পথ যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উদ্যমের দ্বারা মুক্ত করিতে হইবে এবং সারা বিশ্বের এই কঠোর পরিশ্রমগুলা যখন সেই শেষ মুক্তি পাইবার কার্য্য মাত্র, তখন মানবের আত্মচেষ্ট কার্য্যে, স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্ম্মে বাধা দেওয়া শয়তানি কার্য্য, ঘোর অধর্ম্ম। সুতরাং আধুনিক জগতের সভ্যতার উন্নতিকারীগণের হস্তে সুবর্ণ অক্ষরে স্বাধীনতা লিখিত উড্ডীন পতাকা পরিদৃশ্যমান হয়। আমরা পূর্ব্বে যে আদর্শ স্বাধীনতার বর্ণনা স্থির করিয়াছি সেই আদর্শ স্বাধীনতা ভাল কি মন্দ তাহা কিছু বলিতে চাহি না। তবে সভ্যতা ঐরূপ স্বাধীনতার পোষক কিম্বা সভ্যতার উন্নতির সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গণ্ডীর সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

জড় জগতের প্রতিরোধ ছাড়িয়া দিলে, আদর্শ স্বাধীনতা যতদুর সম্ভব সেই পরিমাণে দৃষ্ট হয়, বন্য পশু পক্ষীদিগের মধ্যে। কুঞ্জবিহারীন বিহঙ্গকুলের স্বাধীনতার ঈর্ষা করে না এমন ব্যক্তি জগতে বিরল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সম্মুখের আম্র শাখে বসিয়া শ্যামাপক্ষী কি সুন্দর সঙ্গীতধারে ধরাতল বিমোহিত করিতেছিল। তাহার হৃদয়ের স্বাধীনতার বাধা বিঘ্ন নাই; এখনই পাখিটি অনন্ত অসীম আকাশের কোলে ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। উড়িবার সময় শ্যামা কাহার ত অনুমতি লইল না, কাহারও মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিল না। সুন্দর বনের ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা শার্দ্দূল চক্ষু মুদিয়া অলস ভাবে পড়িয়াছিল। হঠাৎ রোষকষায়িত আগ্রহবিস্ফারিত সুগোল স্ফটিক নয়নে ব্যাঘ্র দেখিল সম্মুখে একপাল কুরঙ্গ। অমনি মৃগমাংস ভক্ষণের স্পৃহাটা শার্দ্দূল হৃদয়ে জাগরুক হইল, তাহার ইচ্ছা হইল মৃগ বধ করিব। যথা ইচ্ছা তথা কার্য্য। সে কার্য্যে বাধা দিবার কেহ ছিল না, ব্যাঘ্র ছুটিল, প্রাণপণে ছুটিল। শীকারও ছুটিল শিকারীও ছুটিল। নদ নদী, খাল নালা, তরু লতা, শিলাখণ্ড ও শুষ্ক মহীরুহ স্কন্ধ সকল উল্লম্ফন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হিংস্রক ধাবিত হইল।

ইহা অপেক্ষা স্বাধীনতা এ বিশ্বে দৃষ্ট হয় না। আপন ইচ্ছা অনুরূপ

কার্য্য করিতে জগতে কেবল পশু পক্ষীই সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নহে। বাহ্যিক কারণে এ স্বাধীনতারও সীমা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রথমতঃ জড় জগতের এবং শারীরিক গঠন জন্য স্বাধীনতার সঙ্কীর্ণতা। জীব জড় জগতের ও ঈশ্বরের বিধানের অধীন। তথায় স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ অপর জন্তুর দ্বারা আপনার শরীরের ও প্রাণের ক্ষতি হইবার আশঙ্কাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতার সীমা ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। এ দুইটি ছাড়িয়া দিলে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা নিম্ন শ্রেণীর অসামাজিক পশু পক্ষীদিগকে ভোগ করিতে দেখা যায়। এক স্থানে কতকগুলা তণ্ডুল কণা পড়িয়াছিল। ঠিক তাহারই পার্শ্বে একটি শ্যেনপক্ষী এক নিহত বিহঙ্গম শোণিতে তাহার জঠরাগ্নি শমিত করিতেছিল। এই সময় একটি বৃক্ষের শাখে বসিয়া একটি ক্ষুধার্ত্ত পারাবত লুব্ধচক্ষে সেই তণ্ডুলরাশি দেখিতে-ছিল আর ভাবিতেছিল, যদ্যপি কাল সদৃশ চিরশত্রু শ্যেন তথায় না থাকিত তাহা হইলে ভূমিস্থিত তণ্ডুলকণার সাহায্যে কেমন উদরজ্বালা নিবৃত্তি করি-তাম। এ স্থলে পারাবতের ইচ্ছা থাকিলেও স্বাধীনতা ছিল না। জীবন রক্ষার জন্য তাহার ইচ্ছামত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিল।

ঠিক পশুপ্রকৃতির বর্ব্বর মনুষ্যের স্বাধীনতাটা এই শ্রেণীর। সে অপ্রতি-হতভাবে বন্য ব্যাঘ্রের মত যথা ইচ্ছা কার্য্যাদি করিতে পারে। নরভোজী ভীষণ অসভ্য নর সকলের ইচ্ছা হইলে এবং সাধ্য থাকিলেই যাহাকেই হউক হত্যা করিয়া আহার করিতে পারে। অসভ্য নরের অপরের সহিত কোন প্রকারে বিরোধ হইলেই সে তাহাকে যথা ইচ্ছা সাজা দিয়া আপনার হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে। এরূপ কার্য্য ভাল কি মন্দ তাহা কিছু বলি-তেছি না, কিন্তু এরূপ অবস্থায়, মানবের বর্ব্বর দশায় তাহার যে স্বাধীনতা সর্ব্বা-ধিক তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ক্রমে মানব যত উন্নত হয় তাহার স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। উপরে বলিয়াছি আত্মরক্ষার চেষ্টা বা স্বতোত্তেজিত স্বাভাবিক বৃত্তি বন্য পশু ও তদ্‌শ্রেণীর মানবের স্বাধীনতার প্রথম বিরোধী। তাহার পর একটু উন্নত হইলে জীবের এবং প্রধানতঃ মনুষ্যের ভালবাসা স্বাধীনতার একটি শত্রু। যখন মানব পরিবার মধ্যে থাকিতে শিক্ষা করে, যখন ক্রমশঃ স্ত্রী পুত্রের স্নেহের

সুস্নিগ্ধ শীতলকারী ক্ষমতা বর্ব্বর নরের পাশববৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন মানবের স্বাধীনতার আর একটি সঙ্কোচক কারণ সমুদ্ভূত হয়। তখন ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ও পুত্র কলত্রের মঙ্গল হেতু আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তখন মায়ার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়, পাঁচজনের নিন্দার ভয়ে, ভবিষ্যতে প্রিয়জন বিরহ দুঃখ পাইবার আশঙ্কায় অনেক সময় স্ত্রীহত্যার ইচ্ছা থাকিলেও বর্ব্বর তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিতে পারে না। কিন্তু ইহা কি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা? স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতার সীমা সঙ্কোচ দ্বারা কিন্তু মানব নৈতিক জগতে এক স্তর উন্নতি করিতে সমর্থ হইল। এবং এই স্বাধীনতার সঙ্কীর্ণতা ভাল কি মন্দ তাহা সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। পাশ্চাত্যিয়েরা যখন স্বাধীনতার নাম শুনিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে তখন তাহাদিগের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থে যে পাশবিকতা তাহা বুঝিলে স্বাধীনতার নামে নৃত্য করে কিনা তাহা বলিতে পারি না। সুতরাং স্বাধীনতা প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা না জানিয়া তাহার পূজা করা তাহার নিকটে কত স্বার্থ কত কি বলি দেওয়াটা যে একটা পাশ্চাত্য সুপারষ্টিশান সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাহার পর মানবসমাজ যত সংস্কৃত ও সুসভ্য হইতে আরম্ভ করিল ততই আদিম সীমাহীন যথেচ্ছাচারী স্বাধীনতার গণ্ডী কমিতে লাগিল। ক্রমে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য মানবকে অপরের স্বাধীনতা ভোগের বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইল, ক্রমে মনুষ্যসমাজ যখন দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ হইল তখন আমার যথেচ্ছ তীরক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। আমার তীরক্ষেপ আমার প্রতিবাসীর মৃত্যুর কারণ হইলে তাহার পরিবারের নিকট আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হইত। ফৌজদারী আইনের ইহা প্রথম সোপান, কিন্তু ইহাতেও স্বাধীনতার বহুল পরিমাণে সঙ্কোচ হইল। তাহার পর মানব যখন অধিকতর সভ্য হইল তখন পরিবারস্থ একজনের মৃত্যুর জন্য পরিবার কর্তৃক দণ্ড পাইবার অধিকারে রাজার নিকট চলিয়া গেল। এখন আমার কাহাকে প্রথম প্রস্তাবে মারিবারও ক্ষমতা নাই বা কাহারও নিকট হইতে মার খাইলে তাহাকে তাহার প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতাও নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ সুসভ্য জগতে স্বাধীনতা পাইবার এবং স্বাধীনতা

ভোগ করিবার অর্থাৎ এক কথায় ইহার অর্থ না জানিয়া স্বাধীনতা শব্দের পূজা করিবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইবার পূর্ব্বে কিন্তু শেষোক্ত স্বাধীনতাটুকু সকলের ছিল। একথা বোধ হয় আমাকে বিশদ করিয়া বলিতে হইবে না, সুসভ্য আইন কর্ত্তাদের হস্তে পড়িয়া সমগ্র সুসভ্য জগতের প্রজাবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপ ভাবে সঙ্কুচিত। মোটের উপর দেখিতে গেলে নিম্নলিখিত কারণ কয়টির দ্বারা আমাদিগের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিতে হয়।

প্রথমতঃ—ঐশ্বরিক নিয়মবশতঃ।

দ্বিতীয়তঃ—মানব হৃদয়ের কমনীয় বৃত্তির জন্য।

তৃতীয়তঃ—আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য।

চতুর্থতঃ—আমাদিগের পারিবারিক ও সামাজিক অপরাপর মানবদিগের আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য।

পঞ্চমতঃ—রাষ্ট্রপরিচালকদিগকে তাহাদের শাসনপ্রণালী সুন্দর ও নিয়মিতরূপে করিতে দিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে আত্মস্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার জন্য।

ষষ্ঠতঃ—মানব ব্যতীত অপর গৃহপালিত ও বন্য জীবদিগের জীবনরক্ষা করিতে দিবার জন্য।

যেমন সমাজ সভ্যতার এক এক স্তর উন্নত হয়, তেমনি উহার ব্যক্তিনিচয়ের স্বাধীনতা ও উপরিউক্ত কারণগুলি এক এক করিয়া সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। ক্রমে সভ্য জগতে অযথা বিনা পাশে পশুপক্ষী বধ করাও নিবারিত হয়।

যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তেমনি জাতীয় স্বাধীনতা পৃথিবীর উন্নতি ও জগতের সভ্যতা বিস্তারের সহিত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এখনকার ইউরোপীয় "ইণ্টারন্যাশনাল" আইন তাহার সাক্ষ্য। এখন একটী স্বাধীন রাষ্ট্র যেমন ভাবে ইচ্ছা তাহার স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারে না। পূর্ব্বে এ বিষয়ে কোনও রূপ প্রতিবন্ধক ছিল না এবং চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এক রাজ এক রাজ্যের প্রজামণ্ডলী বা রাজসেনা যথেচ্ছা অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি করিতে পারিত।

সুতরাং সভ্যতা বাড়িলেই যে ব্যক্তিগত বা জাতীয় স্বাধীনতার সীমা বর্দ্ধিত হয়, এরূপ ধারণা ভ্রম মূলাত্মক ও কুসংস্কার সম্পন্ন। প্রকৃত পক্ষে

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ব্বরতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক এবং মানব যতই উন্নত ও সুসভ্য হয় সে ততই নিয়মাদির অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করিতে শিখে। এবং এইরূপ নিয়মের ভিতর বাস করিবার সামর্থ্য ও স্পৃহা আত্মসংযমের নামান্তর মাত্র।

উপরোক্ত গবেষণা পাঠ করিয়া কেহ যেন সন্দেহ করিবেন না যে, লেখকের উদ্দেশ্য দাসত্বের পক্ষ সমর্থন করা। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা liberty, freedom প্রভৃতি যে সকল কথা আমরা নিত্য ব্যবহার করি, তাহাদের প্রকৃত ধারণা ব্যবচ্ছেদ করা। এই সকল সীমা ও প্রতিবন্ধকের ভিতর থাকিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা তাহাই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা যে অর্থে অজ্ঞব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হয় তাহা ব্যভিচারের নামভেদ মাত্র।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(গল্প)

(১)

জনসাহেব বলিলেন "বালক তোমার অবস্থা দেখিয়া তোমাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন বোধ হইতেছে। যদি তোমার কিছু প্রার্থনা থাকে বল।"

ইডেন গার্ডেনের একটি ঝোপের ভিতর ভয়ে এবং দুঃচিন্তায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর আশ্রয়বান্ধবহীন দ্বাদশবর্ষীয় বালক শ্যামাচরণ একটু নিদ্রার উদ্যোগ করিতে ছিল অকস্মাৎ হ্যাট কোট ধারী গৌরাঙ্গ মূর্ত্তির আগমনে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল; সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাঙ্গালায় এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল। কি উত্তর দিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

সাহেব আবার বলিলেন "তোমার কিছু ভয় নাই, যদি কিছু প্রার্থনা থাকে বল।"

তাঁহার সদয় বাক্যে বালক সাহস পাইয়া বলিল "সাহেব আমার নাম শ্যামাচরণ, আজ তিন দিন হইল আমার খুড়া মহাশয় কার্য্যে বাহির হইয়া আর বাসায় ফিরেন নাই। তিনি জাহাজে কর্ম্ম করিতেন তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া শুনিলাম হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। বাসায় গিয়া দেখিলাম বাটীওলা আমাদের ঘরে চাবি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় দেশে পাঠাইয়া দেন।"

সাহেব তাহার মুখ পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন "শ্যামাচরণ অদ্য আমার সহিত আইস পরে তোমার সমস্ত বন্দবস্ত করিয়া দিব।"

অকূল পাথারে কূল পাইয়া বালক শ্যামাচরণ তাহার সহিত গমন করিল।

জন সাহেব ধর্ম্মতলার মোড়ে একটী দোকানে তাহাকে কিছু খাবার খাওয়াইয়া চাঁদনি হইতে জামা ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দিলেন। তাঁহার বাটীর নিকটে ওয়েলিংটন স্কয়ারে একটি পরিচিত মেসে আহারাদির বন্দবস্ত করিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন "দুইটার সময় ঐ বাটীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

(২)

টিফিনের পর ড্রয়িংরুমে বসিয়া জন সাহেব সিগারেট পানে নিযুক্ত ছিলেন। বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখো একঠো বাঙ্গালি লেড়কা হামরা সাত মুলাকাত করনে আনেসে হিঁয়া লে আইও।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বেহারা শ্যামচরণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

সাহেব সস্নেহে তাহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার দেশের কথা বলিতেছিলে, সেখানে তোমার কে আছেন?"

শ্যামাচরণ কহিল "আমার মাতা ভিন্ন এক্ষণে আর কেহই নাই, আর কাকা ছিলেন তাঁহার কথাত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি।" দর দর ধারায় বালকের গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। দয়ার্দ্র হৃদয় জনসাহেব নিজ

রুমালে তাহার মুখ মুছাইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে কিংবা এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে? যদি পড়াশুনা করিতে চাহ তবে সমস্ত খরচ বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি। শ্যামাচরণ কলিকাতায় পড়িতেই আসিয়াছিল; এই কথা শুনিয়া আগ্রহে বলিয়া উঠিল "সাহেব ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন! অনুগ্রহ করিয়া আমার লেখা পড়ার বন্দবস্ত করিয়া দিন, অনাথ বালক চির জীবন আপানার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। বাসায় যাইয়া শ্যামাচরণ মাতাকে সমস্ত বিবৃত করিয়া পত্র লিখিল। দুঃখিনী বিধবা দেবরের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিলেন, পরে পুত্রের আশ্রয় প্রাপ্তির কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

(৩)

জনসাহেবের একটী দশমবর্ষীয়া কন্যা ভিন্ন পুত্রাদি ছিলনা। শ্যামাচরণের উজ্জ্বল নয়ন, পরিষ্কার বাক্য বিন্যাস এবং সুন্দর আকৃতি সাহেবের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি তাহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন এবং সমস্ত বিষয়ে পিতার ন্যায় যত্ন লইতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ ও স্বীয় মেধাবলে কয়েক বৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। জনসাহেব শ্যামাচরণের কৃতীত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মেস হইতে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন এবং স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ রাখিয়া আহারাদির বন্দবস্ত করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণের মাতা পুত্রের পাশের কথা শুনিয়া মা দুর্গার পূজা দিয়া প্রার্থনা করিলেন "মা আমার শ্যামের একশত বৎসর পরমায়ু হউক, সে সহস্রপোষী হউক।"

(৪)

একদিন জনসাহেব ও শ্যামাচরণ বাঙ্গলায় কথা বার্ত্তা কহিতে ছিলেন। কন্যা এমিলি বিস্ফারিত নেত্রে শুনিতে ছিল। তাহার বড় ইচ্ছা সেও কিছু বাঙ্গালা শিখে। পিতাকে বলিল "বাবা যদি শ্যামাচরণ বাবু আমায় একটু বাঙ্গালা পড়ান।" সাহেব হাসিয়া বলিলেন "শ্যামাচরণ! যদি তোমার অবসর হয় তবে উহাকে এক একদিন একটু করিয়া বাঙ্গালা পড়াইও।" এমিলি

প্রতিদিন অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে লাগিল। বালিকা বড়ই অনুসন্ধিৎসু ছিল; একটা জিনিষের যে শুধুই নামটা শিখিয়াই সে ক্ষান্ত হইবে সে এমন পাত্রী নহে, তাহার কি ব্যবহার কোথায় পাওয়া যায় সমস্তই তাহাকে বলিতে হইত। শ্যামাচরণের পড়ান তাহাকে বড়ই ভাল লাগিত। সে সেই সময়টার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া থাকিত।

(৫)

ইহার পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্যামাচরণ বি, এ, পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেছেন। বিংশ বর্ষীয়া ইংরাজ যুবতী এমিলি এখনও শ্যামাচরণের নিকট পাঠ গ্রহণ করে। এমিলি এক্ষণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত রঘুবংশ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর পাঠের সময় পূর্ব্বের ন্যায় উন্মুক্ত হাস্য ও গল্পের স্রোত নাই। এমিলির আকর্ণবিশ্রান্ত নীল নলিন আঁখির সহিত শ্যামাচরণের তেজস্মান পূর্ণোজ্জ্বল চক্ষু মিলিত হইবা মাত্রই উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন, পরক্ষণে যুবতীর শুভ্র ধবল মুখমণ্ডলে গাঢ় রক্তিম চ্ছায়া পরিদৃষ্ট হইত। কখন বা শ্যামাচরণ পড়াইতে পড়াইতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন, কখন বা রঘুবংশে দীলিপ ও সুদক্ষিণার প্রেমালাপ আবৃত্তি করিতে করিতে শ্যামাচরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। নির্জ্জনে অবসর পাইলেই এমিলির চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। আপনাকে কত তিরস্কার করিতেন আপনার অবস্থা ভাবিতেন মাতার কথা ভাবিতেন কিন্তু কিছুতেই মনের বেগ রোধ করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ তিনি ম্লান এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সাহেব তাহার স্ফূর্ত্তিহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে শরীর অসুস্থ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। এমিলি যে এসকল বুঝিতে পারিত না তাহা নহে। শ্যামাচরণই তাহার হৃদয়ের দেবতা হইয়াছিলেন। তেজস্বিনী ইংরাজ যুবতী ভাবিয়া ছিলেন যদি শ্যামাচরণ বাবু তাহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেন তবেই সে বিবাহ করিবে নচেৎ আজীবন অনূঢ়া অবস্থাতেই কাটাইয়া দিবে। কতবার মুখ ফুটিয়া বলি বলি মনে করিয়াছিল কিন্তু সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই।

(৬)

একদিন শ্যামাচরণ বাবু ও এমিলি দুইজনে গড়ের মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ মুষল ধারায় বৃষ্টিআরম্ভ হওয়ায় তাহারা দ্রুতপদে একটী বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইয়া এমিলি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। শ্যামাচরণ তাহাকে উঠাইয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে লইয়া গেলে। যুবতীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস তাঁহার কপোল স্পর্শ করিতে লাগিল। এমিলি বলিয়া উঠিল "শ্যামাচরণ যদি তুমি ইংরাজ হইতে" যুবক হৃদয় বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল "এমিলি! এমিলি! আমি তোমার জন্য সব করিতে পারি—যদি বল খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছি।" এমিলি তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া নির্জ্জন বৃক্ষতলে গাঢ় চুম্বন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্যামাচরণ জনসাহেবের নিকট তাহার কন্যার কর প্রার্থনা করিলেন আরও বলিলেন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্য নাই। জনসাহেব শ্যামাচরণকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন তাঁহারও মধ্যে মধ্যে ঐ ইচ্ছা হইত কিন্তু শ্যামাচরণ মনে কষ্ট করিবে কিম্বা এমিলি অমত করিবে ভাবিয়া কিছু বলেন নাই। এক্ষণে কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা অবগত হইয়া প্রসন্ন বদনে অনুমতি দিলেন। ইংরাজ, শ্যামাচরণের মাতার মত গ্রহণ বিশেষ আবশ্যকীয় মনে করিলেন না, মোহান্ধ শ্যামাচরণ ভাবিলেন মাতাকে আর এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না, যতদিন গোপন থাকে থাক, তারপর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রাথনা করিয়া লইব।

* * * * * *

জর্ডন নদীরজলে অভিসিক্ত হইয়া শ্যামাচরণ খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। একদিন পরিষ্কার অপরাহ্নে সমবেত সুহৃদবর্গ সমক্ষে লাল বাজারের গির্জ্জায় তাহাদের পরিণয় সম্পাদিত হইয়া গেল।

এদিকে দেশে শ্যামাচরণের মাতা ঠিক সেই সময়ে গোগুলদের বাটী একটী সুন্দরী বালিকা আসিয়াছে শুনিয়া পুত্রবধূ করণেচ্ছায় দেখিতে যাইতে ছিলেন, হঠাৎ দরজায় বাধা লাগিয়া অঙ্গুলিষ্ঠে রক্তস্রোত বহিয়া গেল। যন্ত্রণায় চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

(৭)

নববিবাহিত দম্পতির "হ'নমুন" বড় সুখে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর শ্যামাচরণ ও এমিলি গড়ের মাঠে সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিয়া বাটী ফিরিতে ছিলেন। সে দিন বিজয়া দশমী। বাদ্যকোলাহলে ভগবতীর নিরঞ্জন হইতে ছিল। বাঙ্গালি শ্যামাচরণের শরীর রোমাঞ্চ হইল। সম্মুখে দশভূজা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন। পত্নীর সাবধান বাক্য তাহার কর্ণগোচর হইল না. সুদূর পল্লীগ্রামে মাতার কথা, বিজয়া দশমীর আনন্দ উৎসব, আপনার আত্মীয় স্বজনের পরিচিত মুখমণ্ডল তাহার মন আকুলিত করিয়া তুলিল। মুহ্যমাণ হইয়া বাটী ফিরিলেন।

বাটী গিয়া দেখিলেন মাতার নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে। পূজার সময় বাটী না যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত আকুল হইয়াছেন, একবার যাইতে বলিয়াছেন আরও লিখিয়াছেন, বধূ করিবার জন্য একটী সদ্বংশীয়া সুন্দরী কন্যা দেখিয়াছেন যদি তাহার মনোমত হয় তবে শীঘ্রই বিবাহ দিবেন। শ্যামাচরণের হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল, নয়ন বহিয়া দরদর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। এমিলি তাহার এবম্প্রকার ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলেন "মাতার গুরুতর পীড়া, কল্যই তাহাকে দেখিতে যাইব।"

(৮)

পরদিন প্রাতঃকালে হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধুতি চাদর পরিধান পূর্ব্বক শ্যামাচরণ দেশাভিমুখে রওনা হইলেন। পরিচিত উদ্যান এবং পুষ্করিণীর ধার দিয়া সভয় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাটীর দরজায় আঘাত করিয়া হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মাতা আহ্লাদে ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার মুখ পানে চাহিতে পারিল না। বাটীর ভিতর যাইয়া অরুন্তুদ বেদনায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিয়া বলিল "মা মা, আমি মহাপাপী, বিধর্ম্মী খৃষ্টান হইয়া জন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি। আমায় ক্ষমা করিও, মনে করিও তোমার পাপিষ্ঠ পুত্র আর ইহজগতে নাই।" মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া অভাগিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

* * * * * *

শ্যামাচরণের মাতা চেতনা প্রাপ্তা হইলেন বটে কিন্তু অভাগিনীর মস্তিষ্ক চির দিনের জন্য বিকৃত হইয়া গেল। ভাবী পুত্রবধূর দোষগুণ বিচারই তাহার প্রলাপ হইয়াছিল। শ্যামাচরণ লজ্জায় দেশে কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারেন নাই।

একজন দূর সম্পর্কীয়া পিতৃষসাকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন। ইহার পর জীবনে, অনেক নিশা তাহাকে জ্বালাময় অশান্ত হৃদয়ে কাটাইতে হইত। পতিপ্রাণা এমিলি অনেক চেষ্টা করিয়াও সান্ত্বনা দিতে পারিতেন না।

শ্রীউমাচরণ ধর।

কবিতা কুঞ্জ।

বিজয়া দশমী।

নমস্কার ও প্রার্থনা।

বিজয়ার নমস্কার লহগো আজিকে,
এস করি আলিঙ্গন শত্রু মিত্র ভুলি—
ভাসাবে তরণী পুনঃ কর্ম্ম সিন্ধুদিকে
অকূলেতে দিশেহারা, আকুলি বিকুলি
কাঁদিবেনা কাঁদিবেনা। যে অমিয় পান
করিয়াছ আজি সবে, আকণ্ঠ পুরিয়া
বহিবে সে সুধাধার জুড়াবে পরাণ
ছুটিবে অনন্তকাল হৃদি উছলিয়া।
গাও সবে জয় জয় ধ্বনিয়া ভারত
কোটী কোটী কণ্ঠ আজি মহোৎসবে মাতি
সে প্রণব মহামন্ত্র—জীব মোক্ষপদ
ফুটুক জীবনপদ্মে আজীবন ভাতি।
বরষে বরষে মাগো! ঢাল শান্তিধার—
নিবারিতে শোক তাপ, জ্বালা হাহাকার।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

পরিচিতা।

পরিচিতা কত কাল পরিচিতা তুমি
স্বপ্নঘোরে কত দেখা তোমায় আমায়
নিরজনে চিন্তা-সখী ধরিয়াছে আনি
তোমার মুরতিখানি লাবণ্য আধার।
কতবার বলিয়াছি তুমিগো আমার
পরায়েছি কত মালা—কখনো প্রতিমা
নেত্রকোণে ফুটায়েছে কত আকুলতা
কায়াখানি কি আবেশে করিয়া বেষ্টন
বহায়েছি হৃদি-উৎসে অমিয়া-লহরী।
প্রতিষ্ঠিয়া দেবী তোমা হৃদয় মন্দিরে
সারাটী জীবন আমি করিব আরতি
হা! হা! লোকাচার মর্ম্মভেদী কত কথা
আবরণ ব্যবধান এত সাবধানে
কেমনে বাড়িবে মোর প্রেম অভিসার?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বারাণসী।

মর্ত্ত্যমাঝে বারাণসী তুমি তেজময়ী,
জগতের মুক্তিক্ষেত্র সুন্দর ভারতে;
কত সুখ, কত দুঃখ, হৃদিমাঝে লই,
আসে কত নর নারী জীবন জুড়াতে।
বৈধব্য নিদাঘে শুষ্ক বালিকা কোমল
আসিয়ে তোমার ক্রোড়ে লভিছে সান্ত্বনা,
নিত্য লক্ষ আঁখি হ'তে মুছ অশ্রুজল
মধুর আশ্বাস দিয়ে নিবারি যাতনা।
হে বরেণ্য পুণ্যভূমি বিশ্বের আবাস!
সে অপূর্ব্ব দীক্ষা দাও এ মর জীবনে
রহেগো জাগ্রত চিত যেন বারমাস
মহিমা জড়িত বিশ্ব তত্ত্বের সাধনে;
রহি যেন সে গভীর স্বপনে মজিয়া,
ধরণীর তুচ্ছ দুঃখ সতত ভুলিয়া।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ঈশ্বর।

শুনি বিশ্বে তুমি হও দয়ার ঈশ্বর
অন্ধ আমি নাহি তোমা দেখিতে নয়ন;
তোমারি সৃজিত সব ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, মৃত্যু ও জীবন।
কি ভাবে মজিয়ে আছি উদ্ভ্রান্ত স্বপনে,
জীবন রহস্য-নিশা কভু না পোহায়,
ভোরে ডাকি উঠে পিক্, ফোটে ফুল বনে,
শিশু মুখে হাসি—নর ব্যথিত চিন্তায়।
কিছুই বুঝিনা আমি ধরাতপ্ত কবি,
অপূর্ব্ব মহিমা তব অপূর্ব্ব সৃজন;
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে হেরি মরীচিকা ছবি,
দাও মোরে জ্ঞানময় জ্ঞানের নয়ন;
সে সুখ সম্পদ ভরা আনন্দ উচ্ছ্বাস,
লভি যেন যে ক'দিন মর্ত্ত্যে করি বাস।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

কৃষক—পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১১। কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বর্ত্তমান সংখ্যায় "বিবিধ সংবাদ মন্তব্য" "স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম নীল" "সজিনা" "বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত নিয়মে তুঁত গাছের আবাদ" "ফল প্রসঙ্গ" "লোণা জলে বীজতলা ফেলা" "গোলাপ প্রসঙ্গ" এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় এরূপ মাসিক পত্র বিরল। ইহা পাঠে কৃষকের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশীয় কৃষকমণ্ডলী অশিক্ষিত। যে সমস্ত আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোক দেশীয় কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছেন এবং যাঁহাদের বাগানের ও ফল ফুলের গাছের সখ আছে। তাঁহারা ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দেখিতে পাইবেন।

জাহ্নবী—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১১। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। জাহ্নবী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া অতিশয় পুলকিত হইলাম। "বিদ্যাসাগর" (কবিতা)—মন্দ হয় নাই তবে "বিদ্যাসাগর" সংক্রান্ত কোন কবিতা পাঠ করিলেই মনে পড়ে মাইকেলের সেই—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত—বিদ্যাসাগর ইউনিয়ন ক্লব হইতে প্রকাশিত জাহ্নবীতে যদ্যপি উক্ত কয়েক ছত্র প্রতি সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হয় তাহা হইলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইব। "বিধির বিধান" রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। "আহ্বান" কবিতাটী স্থানে স্থানে ভাল লাগিল না, যথা—"আমার মাথার কিরে" "করে যাও দেখা সনে অভাগীর" "হেলায় বহিয়া এনো ওরে দুঃখিনীর" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনের "বায়ু" শীর্ষক প্রবন্ধটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে স্থানে স্থানে ইংরাজী Technical terms প্রয়োগ অনিবার্য্য সুতরাং পাঠকালীন সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য না করাই শ্রেয়। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফির "আবৃত্তির উপযোগিতা" প্রবন্ধটী আর একটু বিশদ হইলেই ভাল হইত। ইহাতে বক্তৃতা (Acting) সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেও বোধ হয় অসংলগ্ন হইত না উপরন্তু তদ্বারা বর্ত্তমান অবৈতনিক ও "ফেরিওয়ালা" (?) Private রঙ্গালয় সমূহের বিশেষ উপকার সাধন হইতে পারিত; বিশেষতঃ বক্তৃতা (Acting) সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় পুস্তকও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ের "সুখই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য ফল" অভিধেয় প্রবন্ধটী সুলিখিত ও সারগর্ভ। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বড়ালের "পবিত্র জাহ্নবী তটে" কবিতাটী আমাদের বেশ লাগিয়াছে; আমরা নবীন কবিকে কবিতা কুঞ্জে সাদরে আহ্বান করিতেছি। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের "ছদ্মবেশী" একটী কৌতুকাবহ ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস, আমরা ইহার শেষাংশ পাঠ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

প্রকৃতি—৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১। বৈশাখ মাসের পর আমরা ভাদ্র সংখ্যা "প্রকৃতি" পাঠে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। "বিপ্লব" একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ, লেখার বেশ বাঁধুনী আছে। "মন্দির বাসিনী" (গল্প) স্থানে স্থানে অসংলগ্ন বোধ হইল, চরিত্র বিকাশও ভালরূপ হয় নাই তবে ভাষাটী মন্দ নহে। "মন্দের মূল কোথায়?" শ্রীযুক্ত প্রকৃতিনাথ বসু বি, এ লেখনী প্রসূত। সামান্য দুই চারি পৃষ্ঠায়, জটিল ভাষায়, এত বড় গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। লেখকের মতে, এক অনন্ত অসীমশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং এই সৃষ্টি অপূর্ণ এবং এই অপূর্ণতাই মন্দ। এখন দেখা যাউক, এই

অপূর্ণতা মন্দ কিনা। অপূর্ণতা অপূর্ণ রাখিবার যে বৃত্তি বা ইচ্ছা তাহাই মন্দ। তাহার মূল মায়া। সাধারণ কথায় ইহাকে অহংজ্ঞান বা অহংতত্ত্ব বলে। প্রকৃতপক্ষে অপূর্ণতাই ভাল বা সম্পূর্ণতা পাইবার সোপান। প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সাধকগণ জীবনে অপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সম্পূর্ণতা পাইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অপূর্ণতা কখনই মন্দের মূল হইতে পারে না। Annie Besant's Origin of Evil নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। এই মন্দের মূল কি তাহা খৃষ্টানী মতে বিচার করিবার জন্য শয়তানের স্বর্গচ্যুতি বিবরণ পঠনীয়।

নব-বিকাশ—১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১১। শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা এম, এ, বি, এল সম্পাদিত। শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্তই আমরা এই নূতন মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় "আবাহন" কবিতাটী মন্দ হয় নাই। "আমাদের অভাব ও তন্মোচনের উপায়" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকা" "জাতি গঠনে ব্যক্তি" "জ্ঞান ও বৈরাগ্য" প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ। শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর "আশীর্ব্বাদ" পাঠে আমরা সুখী হইলাম, আমরা এই নূতন মাসিকের উন্নতি কামনা করি।

নবনূর—২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১১। নারীজাতির অভাব দূরীকরণোদ্দেশে মিসেস আর এস হোসেন নিয়মিতরূপে এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় "গৃহ" ও "অর্দ্ধাঙ্গী" তাহার অন্যতম। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের পরাধীনা গৃহহীনা নারীর জন্য বড়ই মর্ম্মাহতা হইয়া লেখিকা "গৃহ" অভিধেয় প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। "অর্দ্ধাঙ্গী" অভিধেয় প্রবন্ধে লেখিকা বলিতেছেন "স্বামী" শব্দের অর্থ "প্রভু" পুরুষ স্ত্রীজাতির প্রভু হইতে পারে না অতএব তাঁহার ইচ্ছায় "স্বামী" শব্দের পরিবর্ত্তে "অর্দ্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হউক। আমরাও বলি, "স্বামী" শব্দের পরিবর্ত্তে "অর্দ্ধাঙ্গ" শব্দ প্রয়োগ করিলে যদ্যপি আধুনিক স্বাধীনচেতা শিক্ষিতা রমণীদিগের মন উঠে তবে তাহাই হউক। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "জাতীয় সমস্যা" অভিধেয় প্রবন্ধটী বেশ সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা পাঠে সমাজের কতকটা উপকার হইতে পারে। মৌঃ এস্, এ আল-মুসাভী "অবনতি প্রসঙ্গ" অভিধেয় প্রবন্ধে মিসেস্ আর এস হোসেনের "আমাদের অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধের এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ করিয়াছেন কোন কোন স্থলে তাঁহার সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও, প্রবন্ধটি বেশ যুক্তিপূর্ণ একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কবিতা-গুচ্ছের "প্রার্থনা" কবিতাটী বেশ হইয়াছে।

ধূমকেতু—২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন ১৩১১। "পরগাছা বা পেরেসাইট" প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে। "তুমি ও আমি" রবীন্দ্র বাবুর—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও॥"

গানটীর অনুকরণে লিখিত হইলেও, কবিতাটী আমাদের ভাল লাগিল না। "হরবৎ নগরের দেওয়ান বংশ"—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দে রায়ের লেখনী প্রসূত। "কুমার সম্ভব" কাব্যে অনুদিত—মন্দ নহে। "মলিনা" গল্পটী আমাদের ভাল লাগিল না।

শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ—২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩১১। দেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। "অবতার" একটী ক্রমশঃ সারগর্ভ প্রবন্ধ। "রাঙা পা দুখানি" কবিতাটী নিতান্ত মন্দ হয়নাই। "শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ"—সাধারণের এই উপদেশগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা পাঠে হিন্দু সাধারণের বিশেষ উপকার হইতে পারে। "ঈশোপনিষৎ" মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যা। পত্রিকার স্থানে স্থানে পৃষ্ঠার গোলযোগ বশতঃ বড়ই পাঠের ব্যাঘাত ঘটে, শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ পরিচালকদিগের এদিকে দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

বিবিধ

শোক সংবাদ।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ প্রভুবর নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন পণ্ডিতপ্রবর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারা হইয়াছেন। তিনি কয়েকখানি সারগর্ভ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন, তাহার মধ্যে একখানি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি আমাদের সহযোগী "শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভে" শীঘ্রই এই মহাত্মার একটী জীবনী প্রকাশিত হইবে। ভগবান প্রভুপাদ স্বর্গীয় পণ্ডিত-প্রবরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিবারি প্রদান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অর্চ্চনার নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। আমাদের যে সমস্ত গ্রাহক এখনও অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহাদের নামে আমরা ক্রমশঃ ভিঃ পিঃ ডাকে অর্চ্চনা পাঠাইব, তাহাতে তাঁহাদের এক আনা অধিক দিতে হইবে। যাহারা ভিঃ পিঃ ডাকে মূল্য পাঠাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা জ্ঞাত করাইবেন নচেৎ আমরা বুঝিব কাহারও আপত্তি নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র—সহঃ সম্পাদক।

মাসিক পত্রিকা ও

সমালোচনী।

(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ ১৩১১। [দশম সংখ্যা।

গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১। আত্যন্তিক শোক নিবৃত্তির একটি মাত্র উপায় আছে। ইহার নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে, এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

ব্রহ্মরূপে অবস্থানের নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। ভগবান শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন "সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ"। ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে আর কোন শোক থাকে না। শেষ বয়সেও যদি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় তবে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইবে। ব্রাহ্মনির্ব্বাণের নামই মোক্ষ,ইহারই নাম সর্ব্ব দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি।

১২। গীতা ব্রাহ্মীস্থিতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং কিরূপে ইহা লাভ করিতে হইবে তাহাও বলিতেছেন। আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রকৃতি প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতিই বল বা অন্তঃপ্রকৃতিই বল, ভিতরে বাহিরে ইহার সর্ব্বত্রই চঞ্চলতা। কিন্তু যাহার উপরে এই তরঙ্গ রঙ্গ খেলা করিতেছে তাহাই স্থির ব্রহ্ম সমুদ্র। 'ব্রাহ্মীস্থিতি' এই বাক্যে আমরা এই মাত্র বুঝি যে, কোন এক চঞ্চল অস্থির ভাবকে ব্রহ্মভাবে আনিতে হইবে। ব্রহ্ম স্থির কাজেই ঐ অস্থির ভাব যখন

ব্রহ্মভাবে আসিবে তখনই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইবে। অস্থির সদা চঞ্চল এই বস্তুই জীবের চিত্ত। চিত্ত সর্ব্বদা যে অস্থির ইহা জানিবার উপায় কি? ইহার উত্তর বাসনা। চিত্ত বাসনাময়, এজন্য সর্ব্বদা আকুল। বাসনাই অতি সূক্ষ্মচিন্তা। চিত্ত সর্ব্বদা চিন্তা করে, সর্ব্বদা কি যেন কি কথা কয়। চিত্ত বা মন এক দণ্ডও চিন্তাশূন্য নহে। বাহিরে সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখ দেখিবে ভিতরে কিসের কথা চলিতেছে, কিসের চিন্তা হইতেছে, প্রাণস্পন্দনও ইহার পরিচয় দেয়।

সদা অস্থির এই চিত্তকে চিন্তাশূন্য বাসনাশূন্য করিতে হইবে? হস্তস্থিত মুকুর নাড়িলেই মুকুর-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, মুকুর-স্পন্দন রহিত করিলেই প্রতিবিম্ব স্থির থাকে। চিত্তকেও যখন ধ্যানযোগে আনয়ন করা যায় তখনই ইহা স্থির হয়। ধ্যান করিতে করিতে ইহা ধ্যেয় বস্তুতে যখন তন্ময় হইয়া যায় তখনই চিত্ত আপন সত্ত্বা হারাইয়া ব্রহ্মভাবেই পরিণত হয়। তদাকার কারিত হইয়া যায়। লবণ পুত্তলিকা সমুদ্র পরিমাণ করিতে গিয়া গলিয়া লবণাক্ত সমুদ্রই হইয়া যায়। ছায়া সূর্য্য দেখিতে গিয়া আপন সত্ত্বা সূর্য্যে হারাইয়া ফেলে। কিন্তু কিরূপে চিত্তকে বাসনাশূন্য করিতে হইবে? কিরূপে আসক্তি যাইবে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই উপদেশ দিতেছেন। বলিতেছেন, আত্মবিচার কর, আত্মজ্ঞান লাভ কর, যখন আত্মাকে জানিবে সেইক্ষণেই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিবে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মাকে দেখিতে হইবে। দেখিব কিরূপে? আত্মা ত বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু নহে? তাহা নহে সত্য, এই জন্য আত্মার কথা শ্রবণ কর। শুধু শ্রবণেও হইবে না। মনন করিতে হইবে। আত্মার কথা যাহা শুনিলে তাহার মধ্যে যাহা সংশয় হইতে পারে তাহা মীমাংসা কর। যখন তুমি আত্মা সম্বন্ধে মনন দ্বারা সর্ব্বসংশয়শূন্য হইলে তখনই ধ্যান আসিবে। ইহাই নিদিধ্যাসন। গীতা অর্জ্জুনকে প্রথমেই আত্মার স্বরূপ শুনাইতেছেন। বলিতেছেন, অর্জ্জুন আত্মার জন্য কোন শোক হইতে পারেনা, আত্মার মৃত্যু নাই। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়॥ অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয়

না। আত্মার জনম মরণ নাই, আত্মা নিত্য শাশ্বত। অর্জ্জুন তুমি বিশ্বাস কর যে তুমিই এই বস্তু। দেহ বা মন বা বুদ্ধি এসমস্ত হইতে তুমি পৃথক। প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন। যখন ইহা অনুভব করিবে তখন তোমার কোন শোক থাকিবে না, তুমি নিত্য আনন্দ লাভ করিবে। আত্মার সংবাদ দিয়া যে কর্ম্মদ্বারা আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারা যায় ভগবান তাহারও উল্লেখ করিতেছেন। ইহাই কর্ম্ম যোগ। দ্বিতীয়ে কর্ম্ম যোগের সূত্র নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তৃতীয়ে ইহার বিস্তৃতি।

১৩। কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইবে? ব্রহ্মত সকলের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছেন, তবে লোক দেখিতেই বা পায় না কেন, আর স্থিতি লাভই বা করিতে পারে না কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাসনা আসক্তি অথবা কামই ইহার কারণ। বাসনা ঢাকিয়া রাখে বলিয়া আত্মার প্রকাশ অনুভব করা যায় না। আত্মজ্ঞানের পরম শত্রু এই কাম। জ্ঞান-সূর্য্য পরিপূর্ণ থাকিলেও কাম-মেঘ মনুষ্যের চক্ষু আবরণ করিতেছে, ইহাতেই মনে হইতেছে সূর্য্য নাই। মনশ্চক্ষু হইতে এই কামান্ধকার সরাইতে হইবে। অতি প্রবল শত্রু এই কাম। এই শত্রুকে জয় করিলেই ব্রাহ্মীস্থিতি হইবে। গীতা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিতেছেন, "জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং।" বাসনা আসক্তি কামনা বা কাম জয়ের জন্যই সাধনা। গীতা যে সাধনার ক্রম দেখাইতেছেন তাহা এই :-(১) নিষ্কাম কর্ম্ম (২) আরুরুক্ষ অবস্থা (৩) যোগারূঢ় অবস্থা (৪) আত্মসংস্থ যোগ বা ধ্যান যোগ। প্রথম ষট্‌কের শেষ সাধনা এই ধ্যান যোগ, তাহার পরে দ্বিতীয় ভক্তি যোগ। সর্ব্বশেষে তৃতীয়টিকে জ্ঞানযোগে ব্রাহ্মীস্থিতি।

১৪। পূর্ব্বে বলা হইল ব্রহ্মীস্থিতি যাহা হইতে হয় না তাহাই কাম। কাম-জয়ের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কামজয়ের প্রথম অবস্থা নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয় অবস্থা ধ্যান যোগ। প্রথমেই কর্ম্ম করা চাই, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে হইবে না। যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে কাম বৃদ্ধি হইবে তখন অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত হইয়া জীবকে দুঃখ সাগরে নিরন্তর নিক্ষেপ করিবে। আলোক পূর্ণভাবে নিবিয়া যাইবে এবং উলঙ্গিত ব্যভিচার নৃত্য করিয়া বেড়াইবে। এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয় (১) কোন্ কর্ম্ম

আমাদিগকে করিতে হইবে এবং কিরূপ ভাবেই বা করিতে হইবে। গীতা কর্ম্ম অর্থে লৌকিক ও বৈদিক উভয় কর্ম্মই বলিতেছেন। ৯ম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে বলিতেছেন "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং" করোষি অশ্নাসি লৌকিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞ দান ও তপস্যা বৈদিক কর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে? গীতা বলিতেছেন "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।" আবার বলিতেছেন "ময়ি সর্ব্বাণিকর্ম্মাণি সংনস্যাধ্যাত্মচেতস। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ" কর্ম্ম আসক্তিশূন্য হইয়াই করিতে হইবে। একদিকে কর্ম্ম ফলের আসক্তি ত্যাগ অন্যদিকে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর, এই দুইটি নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব। অথবা পূর্ণভাবে ভগবানে নির্ভর করিতে পারিলেই কর্ম্ম ফলের আসক্তি ত্যাগ হয়। কর্ম্ম ফলে যখন মনে হয় এই কর্ম্মে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে জয় হইবে কি পরাজয় হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা আমি জানিতে চাই না—ভগবানের আজ্ঞা বলিয়াই কর্ম্ম করিয়া থাকি; না করিলে বড় ভয় হয় পাছে তিনি রুষ্ট হয়েন, বিশেষ তিনি না বল দিলে আমি কোন কর্ম্মই ঠিক মত করিতেও পারি না। এইরূপে প্রতি কর্ম্মকালে যখন ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরতা হয় অমনই কর্ম্ম নিষ্কাম হয়।

তৃতীয়ে আরও বলা হইয়াছে এই নির্ভরতা আসিবে কিরূপে? কারণ "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি।" স্বভাববশেই যখন মানুষ কর্ম্ম করিয়া ফেলে তখন ভগবানের কথা স্মরণ করিবে কিরূপে? ভগবান বলিতেছেন "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয় স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ তয়োর্ন বশ মাগচ্ছেৎ।" রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না। রাগ ও দ্বেষ কামের প্রধান সেনাপতি। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে কামরাজের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে, আত্মার স্বরূপ ঈশ্বরের রূপ গুণ লীলা শুনাইতে ২ বাধ্য কর তবেই কাম শত্রু জয় হইবে। ঈশ্বরে লুব্ধ হইলেই তোমার নির্ভরতা হইবে। তখন কর্ম্মও নিষ্কাম ভাবে করিতে পারিবে।

১৫। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞান যোগ। ইহা নিষ্কাম কর্ম্মেরই অঙ্গ। নিষ্কাম কর্ম্মে একদিকে কর্ম্মগুলি ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া করিতে হইবে কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ইহাতে থাকিবে না, অন্য দিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্ব-

প্রকার সংশয় ছেদন করিতে হইবে। গীতা এই অধ্যায়ে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। এই সমস্ত কর্ম্মের নাম (১) দৈব্য যজ্ঞ (২) ব্রহ্মযজ্ঞ (৩) সংযমযজ্ঞ (৪) ইন্দ্রিয়যজ্ঞ (৫) আত্মসংযম যজ্ঞ (৬) দ্রব্য যজ্ঞ (৭) তপোযজ্ঞ (৮) যোগযজ্ঞ (৯) স্বাধ্যায়যজ্ঞ (১০) জ্ঞানযজ্ঞ (১১) তাংশিতব্রত যজ্ঞ (১২) প্রাণায়াম যজ্ঞ। এই সমস্ত কর্ম্ম ও সর্ব্বপ্রকার লৌকিক কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা ঈশ্বরে ন্যস্ত করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধেও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছেদন করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারাই জ্ঞান লাভ হইবে। তখন "যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম্ আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।" জ্ঞানযোগে আত্মাই যে ঈশ্বর ঈশ্বরে এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ শূন্য হইতে হইবে। তখন নির্ভর সম্বন্ধে যাহা কিছু সংশয় তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। চতুর্থের শেষ শ্লোক তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগ মাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।"

১৬। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম কর্ম্ম সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারাই ধ্যান আসিবে ধ্যান আসিলেই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কাম জয়ের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক কিন্তু কর্ম্মে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে যখন ঈশ্বর ভাবে চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই ধ্যান যোগ। এই ধ্যান যোগেই কর্ম্ম সন্ন্যাস হয়। ধ্যানের অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই। পঞ্চমের শেষ তিন শ্লোকে ধ্যান যোগের সূত্রপাত করা হইয়াছে কিন্তু ষষ্ঠে তাহাই বিস্তার করা হইয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সংযম হয় তখন ইচ্ছা হয় ক্রোধ দূর হয় তখন সর্ব্বলোক মহেশ্বরই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ ইহার জ্ঞান হয়। ইহাই ধ্যান যোগের সূত্র। পঞ্চমের শেষ শ্লোকে ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্ সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।

১৭। ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যান যোগ। যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের সাধনা ততদিন মনুষ্য গৃহস্থ কিন্তু ধ্যান যোগের সাধনা কালে একান্ত আবশ্যক যোগপক্ষে যিনি আরোহণ ইচ্ছুক তাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ কিন্তু

যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম ধ্যান যোগ। এই ধ্যান যোগে আত্মসংস্থ হইতে হইবে। "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ একাকী যত চিত্তাত্মা-নিরাশীর পরিগ্রহঃ।" এই কালে নির্জ্জন পবিত্র স্থানে চেলাজিন কুশাসনে উপবেশন করিয়া কায়গ্রীব সমান রাখিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। এই কালের সাধনা সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন "সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।" এই আত্মসংস্থ যোগ বা ধ্যান যোগ কর্ম্ম মার্গের শেষ সাধনা। কিন্তু এই ধ্যানাবস্থা হইতেও ব্যুত্থান আছে, সেই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনাঃ
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ত তমো মতঃ॥

আত্মসংস্থ যোগী যখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বর ভজনা করেন তখন তিনিই যুক্তম। এইখানে যোগীভক্তকে ভগবান প্রাধান্য দিতেছেন।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি যোগ বলা হইতেছে এবং ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান যোগ সম্পূর্ণ। যে ব্রাহ্মীস্থিতি শোক সংবিগ্ন মানসের সর্ব্বথা প্রয়োজন সেই ব্রাহ্মীস্থিতির উদ্যাপন তত্ত্বের সহিত ব্রহ্মবস্তু অনুভব করা। ইহাতেই চিত্ত ব্রহ্মভাবে লয় প্রাপ্ত হয় অমনই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষাবস্থা।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম-এ।

মাধুরী।

(১)

মুরলীমোহন যে অশ্বথ বৃক্ষটির নিম্নে বসিয়া দারুণ মনোকষ্টের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতেছিল, প্রবাদ আছে সে বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য আশ্রিত। অপর সময় সন্ধ্যার পর স্থির হইয়া একাকী এরূপ স্থলে বসিয়া থাকিতে বীর-

হৃদয় যুবক মুরলীমোহনেরও ভীতি সঞ্চার হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্য তাহার জীবনে অবসাদ আসিয়াছিল, সমস্ত দিবসব্যাপী ভীষণ মানসিক সংগ্রামের পর মুরলীর আর উত্তেজনা বা প্রতিহিংসাবৃত্তি ছিল না, তাই সে নির্ভীক নির্লিপ্ত ভাবে স্থির হইয়া বরষাস্ফীত ভাগীরথীর উর্ম্মিমালার ক্রীড়া দেখিতেছিল

সে দিন ষষ্ঠী। কত দূরস্থিত গ্রামের প্রমোদ বাদ্য ভাগীরথীর তরঙ্গ বক্ষে নাচিতে নাচিতে উত্তর দিকে ছুটিতেছিল। পরদিন প্রাতে দুর্গাপূজা, সানন্দে গ্রামের বালকবালিকাগণ চীৎকার করিতেছিল তাহাও অস্পষ্ট ভাবে মুরলীর কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি ছিল। একখানি নর্ত্তনশীল বজরার উপর। ক্ষীণ শুভ্র চন্দ্রের কিরণে মুরলী বজরাখানির সুন্দর সুদৃঢ় গঠন দেখিয়া অলস ভাবে কত কি চিন্তা করিতেছিল।

মুরলী ভাবিল, ধনাঢ্য দুর্ব্বৃত্ত অধার্ম্মিক ধনপতি সিংহের শ্লেষপূর্ণ অত্যাচার সহ্য করিয়া দেশে থাকিয়া ফল কি? এইত বয়স। এখনকার উদ্দাম যৌবনের কর্ম্মশীলতা বৃথা নষ্ট করিয়া লাভ কি?

যুবক ধীরে ধীরে নদীতে নামিল। ভাগীরথীর অস্থির বিক্ষিপ্ত দুই একটা ঢেউ আসিয়া মুরলীর পদধৌত করিয়া দিল, আর কতকগুলা তরঙ্গ তীরের সহিত কলাৎ চলাৎ করিয়া কোন্দল করিতে লাগিল। বজরার সমীপবর্ত্তী হইলে একটা বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় নাবিক তাহার আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে হে, কি চাও?

মুরলী বলিল, আমি এই গ্রামবাসী; বজরার অধিপতির সহিত বিশেষ প্রয়োজন আছে একবার সাক্ষাৎ করিব।

নাবিক মনে মনে মুরলীর উদ্দেশ্যে দুই একটা সাধু বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্থির করিল নিশ্চয় যুবক কোনও ডাকাতের দলের চর। তাহাদের বজরার সন্ধান লইতে আসিয়াছে। সে উভয় সঙ্কটে পড়িল। যুবককে তাড়াইয়া দিলে হয়ত বিপদের সম্ভাবনা। সে তাহার দলকে সকল সংবাদ বলিয়া দিবে। আবার অজ্ঞাতকুলশীল এরূপ বলিষ্ঠকায় একট যোয়ান মরদকেই বা সে বজরায় আসিতে দেয় কোন্ সাহসে? একটু ইতস্ততঃ করিয়া নাবিক তাহার মনিবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল।

বজরার অধিপতির সম্মুখে নীত হইয়া মুরলী বিস্মিত হইল। বজরার সেই সুন্দর প্রকোষ্ঠটি অত্যন্ত পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। তাহাতে সুন্দর পশমী গালিচা বিস্তৃত, গালিচার চতুঃপার্শ্বে অনেকগুলি সুবর্ণ সূত্রের কারুকার্য্য খচিত বহু মূল্য উপাদান। আর সেই বজরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের চন্দ্রাতপ দেখিয়া মুরলীমোহনের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। আস্তরণের কৃষ্ণজমিটি এক পার্শ্বে উজ্জ্বল শুভ্র বহুমূল্য প্রস্তর রাশি সংযোজনে একটি চন্দ্র অঙ্কিত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য হীরক তারকা। বজরার এক পার্শ্বে বসিয়া সুন্দরবপু সুঠাম কলেবর এক ব্যক্তি সুবর্ণ প্রদীপের মৃদু ক্ষীণ আলোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন।

যুবক মুরলীমোহনকে সম্বোধন করিয়া নৌকাস্বামী ধনাঢ্য বিজনবিহারী তাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুরলী তাহার জীবনের দুঃখময় ইতিহাসের সকল কথাগুলিই এক এক করিয়া বিজন-বিহারীর নিকট নিবেদন করিল। তাহার পিতা সৎকুলোদ্ভূত হইলেও অমিত-ব্যয়িতাবশতঃ সমস্ত পিতৃধন নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের এক্ষণে যাহা সম্পত্তি ছিল তাহা হইতে তাহাদের ভরণ পোষণ কায়ক্লেশে কোনরূপে চলিতে পারে, কিন্তু তাহাদের গ্রামের ধনপতিসিংহের নিকট তাহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ করিতে না পারায় দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগের প্রতি প্রত্যহই কটু কাটব্য প্রয়োগ করিত। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ সকল নীরবে সহ্য করিতেন এবং মুরলীকে সান্ত্বনা করিতেন তাহা না হইলে এতদিন মুরলী ধনপতি সিংহের জীবনহন্তা হইত। তাহার পর সেই দিবসের সকল কথা মুরলীমোহন বিজনবিহারীকে বিদিত করিল। সে দিন প্রাতে ধনপতির সহিত তাহার বচসা হইয়াছিল। ধনপতি শপথ করিয়াছে দুই এক দিনে তাহাদিগকে গ্রাম ত্যাগী করিবে।

বিলাসী বিজনবিহারী স্থির হইয়া অষ্টাদশবর্ষীয় ব্যথিত যুবকের জীবনকাহিনী শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষুর সহানুভূতিপূর্ণ কটাক্ষে উত্তেজিত হইয়া মুরলী সরল ওজস্বিনী ভাষায় তাহার আখ্যায়িকা বিবৃত করিতেছিল। বিজনবিহারী স্থির কোমল দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্থল দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন প্রথায় পদদলিত গর্ব্ব ও পারিবারিক স্নেহ বন্ধন উন্মত্তভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সমগ্র হৃদয় খানিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাদের সর্ত্ত স্থির হইয়া গেল। বিজনবিহারীর সহিত মুরলীমোহন কার্য্য করিতে যাইতে সম্মত হইল। তরণীস্বামী কহিলেন—যদ্যপি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পার তাহা হইলে অচিরেই আমি তোমায় ঋণমুক্ত করিব। কল্যই রওনা হইব, প্রস্তুত আছ?

মুরলী কোনও আপত্তি করিল না। একবার তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করিয়া আসিতে তাহার বাসনা হইল। কিন্তু তাহার সাহস হইল না, মাতা জানিতে পারিলে তাহার গৃহত্যাগ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সে বলিল, অদ্যাবধিই আমি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। একজন কর্ম্মচারী তাহাকে অপর এক কামরায় লইয়া গেল।

বিজনবিহারী, নিত্যানন্দকে বলিলেন, কিহে সমস্তই প্রস্তুত ত? এই দেশের একটি যুবককে কর্ম্মে বাহাল করিয়াছি। কার্য্য খুব সাবধানে করিও।

নিত্যানন্দ মনে মনে প্রভুর কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিল না। প্রকাশ্যে বলিল, আজ রাত্রেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে, কাল প্রাতে আমাদের নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিব। বেলা দুই প্রহরের সময় নদীয়ার সীমার বাহির হইয়া যাইব।

(২)

তাহার পরদিন উদ্যমপুর গ্রামে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। লোকে পূজার আমোদ ভুলিয়া মুরলীমোহন ও ধনপতিসিংহের একমাত্র কন্যা মাধুরীর অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। ধনপতিসিংহ ব্যাঘ্রের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মুরলীর অগ্রজ ললিতমোহনকে বলিল, "অধর্ম্মী! বিশ্বাসঘাতক! আমি তোদের উপর যতই দয়া প্রকাশ করি তোরা ততই আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিস। তোর ভাইয়ের এই কাজ?" ললিতমোহন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল, মুরলীর দ্বারা এ কার্য্য হইয়াছে একথা ত বিশ্বাস করা যায় না। কাল রাত্র হইতেই কিন্তু দুই জনে তিরোহিত হইয়াছে। মাধুরীকে লইয়া গিয়া মুরলীই বা রাখিবে কোথা? মুরলীর মাতা রোদন করিতে করিতে বলিতেছিল, "ঠাকুর যশ মান ধন সকলই গিয়াছিল তাহার উপর পুত্রটি কোথায় পলাইয়া গেল। কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহার পলায়নের সহিত মাধুরীর অন্তর্ধানের কোনও সংস্রব নাই।"

উদ্যমপুর গ্রামের মধ্যে এখন ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনপতিসিংহ শ্রেষ্ঠ। ধনপতির পুত্র না থাকায় তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা বিষাদের ভাব ছিল বটে কিন্তু তাহা বলিয়া সে তাহার একমাত্র কুমারীকে প্রাণাপেক্ষা এমন কি তাহার সর্ব্বস্ব ধনের অপেক্ষা স্নেহ করিত না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় এই স্নেহবশঃতই ধনপতি এতদিন কন্যার বিবাহ দেন নাই। তিনি দরিদ্রকে বড়ই ঘৃণা করিতেন, তজ্জন্য একটা দরিদ্র সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে গৃহজামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভাবিতেন, আরও দুই এক বৎসর পরে কন্যার বিবাহ দিব। তখন সেকন্যা পরগৃহে যাইবে সে ভবিষ্যৎ বিপদ আশঙ্কা করিতেন না। তিনি বর্ত্তমান সমস্যার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন তাহাই তাঁহার যথেষ্ট।

যে রাত্রে মুরলী বিজনবিহারীর আশ্রয় গ্রহণ করিল সেই রাত্রের মধ্যযামে দুইটি কৃষ্ণকায় সবল পুরুষ মাধুরীর পালঙ্ক নিম্ন হইতে নির্গত হইল। সে পালঙ্কে মাধুরীর মাতাও নিদ্রিতা ছিলেন। একটি মুক্তগবাক্ষ রন্ধ্র দিয়া জ্যোৎস্নার আলোক আসিয়া নিদ্রিতা মাধুরীর রক্তিম কপোলদ্বয় শুভ্র রজত ধারায় ধৌত করিয়া তাহাকে অপরূপ শোভান্বিত করিতেছিল। পাপিষ্ঠেরা মাধুরীর মাতাকে স্পর্শ না করিয়া একেবারে মাধুরীর মুখবিবরে বস্ত্রখণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল। কিশোরী নিদ্রাবিহ্বলা নয়নে একবার তাহাদের মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু তাহার চীৎকার করিবার বা সে পামরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও ক্ষমতা ছিল না। তাহারা নিঃশব্দে তাহাকে নির্জ্জন গ্রামাপথ দিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল। মাধুরী মূর্চ্ছিতা ভয়বিহ্বলা বাণবিদ্ধ হরিণীর মত নৃশংস নিষ্ঠুর মানব-রাক্ষসদিগের অভিলষিত স্থানে নীত হইল।

যাহারা রটাইতেছিল মাধুরী স্বেচ্ছায় মুরলীর সহিত চলিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই জানিত মুরলীর সহিত মাধুরীর কোনও প্রকার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। একস্থানে বাসবশতঃ শৈশবে সেই গ্রামের সকল বালকবালিকাই একত্রে ক্রীড়া করিত; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের যত্নে, বালিকা তাহার আপনার শ্রেষ্ঠতা, তাহার পিতার ধনের আধিক্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং সে নির্ধন বালকবালিকার

সহিত মিশিত না। দুষ্ট লোকে কিন্তু এসব কথা ক্ষণেকের জন্ম বিস্মৃত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিল তাহারা কতদিন নিভৃতে মুরলী ও মাধুরীকে একত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে। ধনপতিসিংহ বুঝিল কোনও প্রকার ঔষধাদি খাওয়াইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা ভুলাইয়া মুরলী তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার এত ঐশ্বর্য্য, এরূপ বিভব, এরূপ মান সত্বেও সামান্য দরিদ্রতনয় মুরলীর নিকট তাহাকে পরাভূত হইতে হইল দেখিয়া ক্রোধে দুঃখে ধনপতি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবমানিত ব্যাঘ্রের মত সমস্ত গ্রামে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(৩)

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে ভাগীরথী তীরে ইস্‌লামবাগ নামক একখানি পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ইসলামবাগের কোন চিহ্ন আজি কালিকার দিনে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু পলাসীর ঈষৎ উত্তরে এখনও লোকে ইস্‌লামবাগের চিহ্ন দেখাইয়া দিতে পারে। এখনও তথাকার রায়দিগের সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পুর্ব্বে যে স্থল মনুষ্য গায়ক গায়কীর সুকণ্ঠ বীণা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সম্মিলনে অপূর্ব্ব উন্মাদক গীতিধ্বনিতে পূর্ণ থাকিত অধুনা সে স্থল মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গম কূজন পরিপূরিত। ইস্‌লাম-বাগের রায়দিগের অট্টালিকা চিরকালই সঙ্গীতের জন্ম বিখ্যাত এবং তথায় অদ্যাবধি স্বভাবের সরল সঙ্গীত শ্রুত হইবে। এখনকার সঙ্গীত সুমিষ্ট কি তখনকার বিলাসপ্রিয় জমিদারের বৈঠকখানার গায়কগণ অধিকতর মধুরকণ্ঠী ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রায়বংশীয়েরা মুর্শিদাবাদ স্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে ইসলামবাগ ও তাহার সমীপবর্ত্তী অনেকগুলি পরগণা শাসন করিত। বঙ্গের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন ইংরাজদিগের রাজ্যশাসন সময় হইতে এবং বিশেষতঃ ১০ সালের বন্দোবস্তের পর হইতে জমিদার শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ কালিকার জমিদারদিগের অধিকাংশেরই পূর্ব্বপুরুষগণ দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষি বাণিজ্য বা নবাব সরকারে চাকুরি করিতেন মাত্র। মুর্শীদকুলি খাঁ স্বয়ং ব্রাহ্মণ ঔরসে হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। তিনি ঋণগ্রস্ত বিলাসপ্রিয় অথচ অদম্য ও বংশমর্য্যাদাগর্ব্বিত পুরাতন হিন্দু ও

মুসলমানদিগের জমিদারী কর্ম্মঠ উৎসাহসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি প্রাচীন জমীদারবংশ তখনও তেজস্বী ছিল। এই কারণেই এবং মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ বলিয়া নবাব জাফীয়র খাঁ ইসলামবাগের রায়দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

বিজনবিহারী রায় এই ইস্লামবাগের জমীদার। তাঁহার পিতা মুর্শীদকুলি খাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সুবৃহৎ পিতৃসম্পত্তির একমাত্র মালিক হইয়া ক্রমে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় বিজন বিহারী শাসনকার্য্যে সেই সময়কার জমীদারদিগের ভূষণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ সাহস ও অদম্য বাসনা ছিল, বিজনবিহারীর সে পরিমাণে ধর্ম্মশীলতা ছিল না। কোনও বৃত্তির উদ্রেক হইলে তাহার পরিপূরণের জন্য বিজনবিহারী যে সকল উপায় অবলম্বন করিত সে কখনও সেগুলি ন্যায় কি অন্যায় তাহা বিচার করিত না। অবাধ্য দুর্দ্দান্ত প্রজা সরকারের ক্ষমতা অমান্য করিতেছে, রায় মহাশয় অনুমতি দিলেন, হারামজাদার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও। পত্তনিদারের ঘোটকী সুন্দর অশ্বশিশু প্রসব করিয়াছে স্নেহবশতঃ পত্তনিদার ঘোটক শিশুটি জমিদারকে নজর দিতে পারিতেছে না, বিজনবিহারী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, ঘোটকী ও ঘোটকশিশু উভয়কে বিষ পান করাও। এসকল দুর্ব্বলতা, এরূপ পাশবিকতা, তৎকালীন জমীদারদিগের নিকট অবশ্য কিছু নূতন বা উৎকট ব্যাপার ছিল না। পরন্তু অপর একটি চরিত্রদোষে যুবক বিজনবিহারী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকেও পরাস্ত করিত। সকল প্রকার ভোগলালসার মধ্যে তাহার রমণী উপভোগ-তৃষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী অনুপমা এতৎ-কারণে কিরূপ মনোকষ্ট ও দারুণ শোক পাইত তাহা স্ত্রীলোক ভিন্ন কেহ সহজে অনুমান করিতে সক্ষম হইত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বিজনবিহারীর নির্ভীকতা অতুলনীয় ছিল। সে ভাবিত সাধারণের মতামত গ্রাহ্য করা এবং লোকনিন্দার ভয়ে ভীত হওয়া কাপুরুষতা। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিজনবিহারী পরগৃহ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ললনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়া নিজ অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিত।

বিজনবিহারী যখন নবদ্বীপ হইতে সুসজ্জিত বজরায় সশস্ত্র অনুচরবর্গ

সমভিব্যাহারে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন বিশ্রামের জন্ম উদ্যমপুরের স্বল্পজনাকীর্ণ ঘাটের ধারে বজরা বাঁধিলেন। ষষ্ঠীর দিন প্রাতে বহুসংখ্যক গ্রাম্যললনা ঘাটে স্নান প্রয়াসে আসিয়াছিল, ধনপতি সিংহের কন্যা মাধুরীর প্রস্ফুটোন্মুখ নাতিতীব্র স্নিগ্ধ রূপরাশি ইন্দ্রিয়দাস বিজনবিহারীর চক্ষে পড়িয়া তাহার অদম্য পাশবিক স্বেচ্ছাচারিতাকে উত্তেজিত করিয়া দিল। তাহার বিশ্বস্ত কৃতান্ত দূত সদৃশ অনুচর দুইটিকে ডাকিয়া জমিদার আজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক ঐ বালিকাটিকে আমার নৌকায় আজ রাত্রে হাজির করিয়া দিতে হইবে। কৌশলে পারিলে ভালই হয়, কারণ বিদেশে লড়াই করিবার ইচ্ছা নাই।

মাধব ও রমানাথ এরূপ কার্য্য বহুবার করিয়াছিল। তাহারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে থাকিয়া ধনপতিসিংহের গৃহ দেখিয়া আসিল, তাহার পর কৌশলে মাধুরীর গৃহের সন্ধান লইল। সন্ধ্যার পর একটি বৃক্ষসাহায্যে বাটিতে উঠিয়া দুর্ব্বৃত্ত দুইজন মাধুরীর গৃহে লুকাইয়া রহিল। কেহ কোনও সমাচার পাইল না বা কেহ কিছু সন্দেহও করিল না। তাহার পর সংজ্ঞাহীনা ধনপতি দুহিতা বজরায় নীত হইয়া বিজনবিহারীর স্ত্রী অনুপমার প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইল। অনুপমা নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন, ভক্তিভরে বলিলেন—গৌরাঙ্গ দেব তোমার মন্দির তোমার শ্রীধাম দেখিয়াও স্বামীর চেতনা হইল না। আর স্বামীর পাশবিকতার প্রশ্রয় দিব না, বালিকার রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। ক্রমশঃ।

রাঠোর বালক।

পঞ্চম সর্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ম্লানময়ী সন্ধ্যাসতী বিস্তারি অঞ্চল
ভীমগড় রণক্ষেত্র আচ্ছাদিলা ধীরে—

দুঃখপূর্ণ নাটকের অভিনয় শেষে
যথা পড়ে যবনিকা। যবন শিবিরে
পরিশ্রান্ত সেনাপতি নাদিল ফুকারে
রণ সম্বরণী তূর্য্য। অহোরাত্রব্যাপী
প্রজ্বলিত ভীমযুদ্ধ রজনীর মত
এবে হল অবসান। রাঠোর সমরে
জীবন্ত যবন সেনা অদৃষ্টে বাখানি
চলিল শিবির পানে লভিতে বিশ্রাম।

ভীমগড় রণাঙ্গনে কি দৃশ্য ভীষণ—
কাটামুণ্ড ছিন্ন হস্ত বিদীর্ণ হৃদয়—
অজস্র শোণিতপ্রবাহে কর্দ্দমাক্ত মহী—
মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ—ব্যথিত বেদন—
উঠিছে করুণ স্বর বিদারি অম্বর—
বহে বায়ু হাহাস্বরে ; শকুনি গৃধিণী—
অমঙ্গল অনুচর—মৃত দেহোপরি—
উল্লাসে বসিয়া তারা করিছে চীৎকার—
ক্ষিতি ব্যোম পরিপূর্ণ প্রচণ্ড তাণ্ডবে
দৃশ্য তার ভয়ানক বীভৎস, বিকট।

কোথাও যবন সেনা পলায়ন পর
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিল শিবির উদ্দেশে
অনেক রাঠোর বীর শমন তাহার
পৃষ্ঠদেশ খণ্ডিয়াছে প্রচণ্ড আঘাতে।
অগণ্য ম্লেচ্ছের মধ্যে আবার কোথাও—
রাজপুত বীর কোন ত্যজেছে জীবন—
যেন ছায় রণক্লান্ত লভিছে বিশ্রাম
রচিয়া বীরের শয্যা শত্রু দেহ'পরি—

পুরাকালে, কুরুক্ষেত্রে, ভীষ্ম মহারথী
শরশয্যাপরি যথা ত্যজিলা জীবন।

কয়জন রুধিরাক্ত রাজপুত সেনা
হইলেন সমবেত সেনাপতি পাশে—
তখন চন্দন বীর রণ অবসানে
কোষবদ্ধ করিলেন পিতৃদত্ত অসি
পূর্ণোজ্জ্বল নেত্র দ্বয়ে সহস্র হীরক
করিল বিকীর্ণ যেন একত্রে কিরণ—
স্ফীত ধমনী তার বহিল চঞ্চল
সঘনে নিশ্বাস ঘন ঘর্ম্মাক্ত শরীর—
সমুদ্র মন্থন অন্তে যথা নাগরাজ
সুধা আশে দেব দৈত্য বিরোধ সময়।

কহিলেন সেনাগণে "আজিকে সমরে
বীরগণ! রক্ষিয়াছ আপন সম্মান
নিষ্কলঙ্ক আভাময় পূর্ণ জ্যোতি তার
হয় নাই বিন্দুমাত্র দূষিত মলিন—
কিন্তু হায়! প্রাতে যবে অরুণ উদয়—
সউৎসাহে সউদ্যমে ভীমগড় হ'তে
তিনশত ভ্রাতা বন্ধু হইনু নির্গত—
এবে তমোনিশা মাঝে কয়জন তার
কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু, কেহ সুত পিতা
বিসর্জ্জিয়া চিরতরে যেতেছি ফিরিয়া?

হে চিতোরের অধিষ্ঠাতা একলিঙ্গ দেব!
রাজয়ারাসুতরক্ত কতকাল আর
এইরূপে প্রবাহিবে মোগল ইচ্ছায়?
কিম্বা এ পরীক্ষা তব হে শম্ভো ধূর্জ্জটী!

দণ্ডী সহ বিসম্বাদে যথা পীতাম্বর
দেখিলেন বিস্মৃত কি পাণ্ডু সুতগণ
ভূমণ্ডলে সারধর্ম্ম—আশ্রিত রক্ষণ ;
তুমিও দেখিছ দেব উম্মিলী ত্রিনেত্র
অনুরক্ত ভক্তগণ ভোগ বিনিময়ে
স্বাধীনতা, বংশমান, দিবে কি আহুতি ?

বারেক অপাঙ্গে হের ভীমগড় ভূমি
নেহার নেহার প্রভো ! পরীক্ষার ফল—
বিখণ্ডিত, রক্তস্নাত, রাঠোরের দেহ
কেহ বৃদ্ধ, কেহ যুবা, কেহবা বালক
নিঃশব্দে পতিত আছে অসাড় অবশ
আশে পাশে স্তূপাকার শত্রু শব রাশি—
বিকৃত, বিচূর্ণ, কিম্বা দৃঢ় নিষ্পেষিত—
মনে কিবা হয় তব দেব ত্রিলোচন !
বাপ্পার রোপিত বীজ হয়েছে নির্ম্মূল ?
পরিণত কিংবা বৃক্ষে ফল ফুলে নত ?

নীরবিলা বীরবর এতেক কহিয়া—
বৃদ্ধ যোদ্ধা অরিসিংহ কহিল তখন
"কি ফল হে সেনাপতি ! বিলম্বি হেথায় ?
চল সবে দুর্গে ফিরি লভিতে বিশ্রাম,
বিষাদ আপ্লুত হৃদে দেখিতেছ হায় !
পরিচিত কত বন্ধু, ভীমগড় ভূমে—
এই দেহ জীর্ণবস্ত্র নশ্বর ভঙ্গুর
গিয়াছে রাখিয়া তারা। জীবাত্মা তাদের
উপনীত এতক্ষণ স্বরগের দ্বারে—
মনেরেখ কালি রণে "আমাদের দিন।"

ভাবিছ কি সেনাপতি পুরাঙ্গনা কথা?
সুনিশ্চিন্ত হও বীর রাজপুত নারী—
জানে তারা বিধিমতে রক্ষিতে সম্মান;
মিবারের বিধিবদ্ধ প্রথা সনাতন
শিশোদিয়া পুরুষের শয্যা "রণভূমি"
রাজপুত রমণীর "চিতা আরোহণ।"
চমকি চন্দন সিংহ সুপ্তোত্থিত প্রায়
শুনিল তাহার বাণী। নেত্র প্রান্তে তার
দুইটী অশ্রুর বিন্দু উঠিল ভাসিয়া
ভাতিল মানস পটে মাতার বদন।

কতদিন, কত কথা, হইল স্মরণ
জননীর ভালবাসা, দয়া, স্নেহ, মায়া—
কতক্ষণ মৌনভরে মাতৃ পরিণাম
নীরবে ভাবিল বীর। হৃদিবেগ রোধি
রুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিল "বৃদ্ধ অরি সিংহ!
সম্যক তোমার বাণী—ধ্রুব যা কহিলা—
হউক না যতদূর নির্ম্মম কঠোর—
মিবারের চিরন্তন প্রথা সনাতন
শিশোদিয়া পুরুষের শয্যা "রণভূমি"
রাজপুত রমণীর "চিতা আরোহণ।"

ক্রমশঃ

শ্রীউমাচরণ ধর।

যুক্ত রাষ্ট্র।

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জীবন বর্ত্তমান রাখিবার ইচ্ছা মানব সমাজে যেরূপ প্রবল, অপর জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের

রাষ্ট্র পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনাও তেমনি মানব জীবনে স্বাভাবিক। বিলাতের রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত বার্ক সাহেব আমেরিকার যুদ্ধের প্রারম্ভে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা যতক্ষণ অপর জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত না করিতে পারি ততক্ষণ আমরা স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।* ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ বলিয়া থাকেন, নেপোলিয়নের হৃদয়ে সদ্বৃত্তি কিছুই ছিল না; তিনি কেবল জয়ী হইবার বাসনায় যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া বেড়াইতেন, অপরের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া নিরীহ জাতিদিগের দেশের সুখ শান্তি অপহরণ করিয়া আপনার বিজয় তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেন।† পক্ষপাতী বিজাতী ঈর্ষা-পরবশ ইংরাজ লেখকগণের কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের সহিত শুধুই উদ্দেশ্য-বিহীন দেশ জয় বাসনার যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মানুষ রোগগ্রস্ত হইলে স্বভাবতঃ তাহার একটা প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া লয়। যে সকল রাষ্ট্র বৃহৎ, যে সমাজের লোকবল, অর্থবল প্রভৃতি প্রচুর, তাহারা ইচ্ছা করিলে আপনারাই তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। ঘৃণিত দাসত্বের নিগড় পদে বাঁধিয়া পরমুখাপেক্ষী পর-কৃপালোলুপ পরাশ্রয়াশী হইয়া না থাকিবার বাসনা থাকিলেই তাহারা "অল্পা-নাম অপি বস্তুনাং সংহতা কার্য্যসাধিকা" এ নীতি বুঝিতে পারে। সুতরাং এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, একব্রতে ব্রতী হইয়া, এক নিশানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাদের স্বাধীনতা হারাইবার আশঙ্কা থাকে না এবং আপনাদের লোক সংখ্যার প্রাচুর্য্য বশতঃ ধনের বাহুল্য প্রযুক্ত এবং স্বদেশানুরাগের আশীর্ব্বাদে তাহারা শত্রু আক্রমণ ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যায়। কিন্তু অর্থবল এবং লোকবল বিহীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রভূত স্বদেশানুরাগ ও স্বাধী-নতা রক্ষার ইচ্ছা থাকিলেও অপর জাতির উপরোক্ত বিজয় জুগুপ্সার হস্ত হইতে

* "They feel themselves in a state of thraldom, they imagine that their souls are couped and cabined in, unless they have some man, or some body of men, dependent on their mercy" Speech at Bristol 1780.

† "The aim of Nepolean was that of a vulgar conqueror"—*Green.*

পরিত্রাণ পাওয়া তত সহজ নহে। তাহাদিগের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সকলেই দুর্ব্বল বোধে সেই রাজ্য আক্রমণ করিবে এবং ক্রমে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া সেই ক্ষীণপ্রাণ রাজ্যের স্বাধীনতা কালের অনন্ত গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং সে দেশে বিজাতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইবে সন্দেহ নাই।

এ নীতি সমর্থন করিতে আমাদিগকে বিদেশী ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হইবে না। যতদিন হিন্দুজাতির অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন হিন্দুর প্রতি রক্তকণিকার সহিত এশিক্ষা সংবদ্ধ থাকিবে। যতদিন শস্য-শ্যামল ভারতবর্ষে বৃক্ষলতা জন্মিবে ততদিন তাহাদের গাত্রে এ নীতি জলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিবে। এত বড় ভারতবর্ষ, এত বড় উর্ব্বরা দেশটা, এমন রত্নগর্ভা পবিত্র স্থান দুই একটা আফগান যোদ্ধা আসিয়া নির্ব্বিরোধে জয় করিয়া লইল তাহার কারণ কি? যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষে স্বদেশানুরাগ ছিল না তাঁহারা অজ্ঞ। যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষের প্রজায় প্রজায় একতা ছিল না তাঁহারা ঠিক ব্যাপারটা বুঝেন নাই; কিম্বা আফগানেরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক বিক্রমশালী বা অধিক সমরকুশল ছিল ইহা যাঁহাদের অভিমত তাঁহারাও ভারতের ইতিহাসের শিক্ষা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভারত-বর্ষে রাজায় রাজায় এমন একটা বাধ্যবাধকতা ছিল না যাহার দ্বারা এক জনের রাজভক্ত প্রজা অপরের জন্য প্রাণ দিতে পারিত। কান্যকুব্জের ভূপতি যদি বলিতেন, প্রজাবর্গ দিল্লীশ্বরের জন্য যুদ্ধ কর তাহা হইলে কণৌজের এমন কেহ বীর থাকিত না যে দিল্লীর জন্য মরিতে ভীত হইত। কান্য-কুব্জের রাজার যদ্যপি ইচ্ছা হইত তাহা হইলেই তিনি দিল্লীশ্বরের উপকারার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতেন, কিন্তু এমন কিছু বিধান ছিল না এমন কিছু ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে বাঁধাবাঁধি ছিল না যাহাতে অর্থেশ্বরকে বঙ্গেশ্বরের বিপদে নিশ্চয়ই অসি ধারণ করিতে হইত বা যোধপুর ভূপালকে জয়পুর নরপালকে রক্ষা করিতেই হইত।

আধুনিক পাশ্চাত্যজাতি এ নীতি টুকু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছে। তাঁহারা এরূপ পাশাপাশি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শত্রুতা বা উদাসীনতার কি কুফল তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। আমি বাঙ্গালী সকল বিষয়ে, ভাষায়, ব্যবহারে,

খাদ্যে, পোষাকে আমি ঠিক বিহারীর মত হইতে পারি না, আর আমার আপনার জাতীয়তা ছাড়িয়াই বা কেন বিহারীর আচার ব্যবহার, ভাষা পরিচ্ছদ আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে যাইব? তাহা বলিয়া আমি আমার বাঙ্গালীত্ব পুরামাত্রায় বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া যদ্যপি বিহারী আচার-পদ্ধতি-প্রচলিত, বিহারী শাসিত বিহার শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত এরূপ স্বর্ত্তে আবদ্ধ থাকি যে বিহার ও বাঙ্গালার সৈন্ত এক উভয় দেশের শত্রু এক উভয় জাতি পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালা কহিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া কাপড় পরিয়া বেহারীর সহিত বেশ স্বার্থ মিলাইতে পারে। এই ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনাকে ফেডারেশন বা যুক্তরাজ্য প্রথা বলে এবং সুসভ্য পাশ্চাত্যীয়েরা এই প্রথার অনুগ্রহে অনেকে সুখে স্বচ্ছন্দে আত্মোন্নতি করিতে পারিতেছে।

সুতরাং যখনই দুই কিম্বা বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আপনাপন স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া বিজাতীপরাজয়ের হস্ত হইতে এবং আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া হীনবল ও বিব্রত হইবার আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাইতে মনস্থ করিবে তখনই তাহাদের যুক্ত রাজ্য প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রের গঠন করা কর্ত্তব্য। এ প্রথায় জাতীয় স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকে, সমর ও অশান্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায় এবং কালে জাতীয়তার সীমা বর্দ্ধিত হইয়া এক মিশ্র সবল জাতির অভ্যুত্থান হইবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য যুক্ত রাষ্ট্র প্রথা অনুসারে রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে কতকগুলি সর্ত্ত আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ যে যে রাষ্ট্র যুক্ত হইবে তাহাদের মধ্যে দুই একটি বিষয়ে একপ্রাণতা থাকিলেই অধিক ইষ্টের সম্ভাবনা; ধর্ম্মের বন্ধন, ভাষার বন্ধন এক প্রকার রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি থাকিলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। যদ্যপি একটি রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র শাসিত এবং অপরটি রাজতন্ত্রের সেবক হয় তাহা হইলে এতদুভয় রাষ্ট্রের যোজন হওয়া প্রভূত পক্ষে অসম্ভব। তাহার পর যে সকল রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হইবে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বলের যদ্যপি অধিক বিভিন্নতা থাকে তাহা হইলে সে যুক্ত রাষ্ট্র অল্পজীবী হইবে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে সে রাষ্ট্র অধিক বলশালী, সুবিধা পাইলেই তাহার প্রজাবৃন্দ

অপর অল্পবলশালী জাতির অপেক্ষা যুক্তরাজ্য গঠনে বা শাসনে অধিক হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাইবে, সুতরাং অচিরেই অশান্তি ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে এবং যুক্ত রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। অবশ্য একটি রাষ্ট্র যদ্যপি এরূপ অধিক পরিমাণে বলশালী হয় যে উহা একাকী যুক্ত রাজ্যের অপর সকল রাষ্ট্রের বিপক্ষে বা এক কালে কতগুলির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে ত যুক্ত রাজ্য স্থাপিত হইতেই পারে না। এবং স্থাপিত হইলেও তাহা অকৃতকার্য্য হইবে।

তৃতীয়তঃ, যুক্ত রাজ্যের কোনও একটি রাষ্ট্র তাহাদের বিজাতীয় শত্রু নিপাত করিতে একাকী সক্ষম হইলেও উপরোক্ত প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রের গঠন হইতে পারে না। যুক্ত রাজ্য প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া। সুতরাং অসহায় অবস্থায় পরসাহায্য ব্যতিরেকে যে জাতি অরিনিপাত করিতে সক্ষম তাহাদের আবার দুর্ব্বল বলশালী জাতির সহিত আত্মরক্ষার জন্য মিলিত হইবার আবশ্যক কি? এ মিলন মৃণ্ময় ও কংসময় পাত্রের মিলন হইবে; এ মিলনে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ঘটিবে।

আধুনিক যুক্তরাজ্য প্রথা শাসিত প্রধান রাষ্ট্র জার্ম্মনি, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও সুইটজারলণ্ড। জার্ম্মানির ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন প্রাচীন জার্ম্মানীর শাসন প্রণালী ১৮১৫, ১৮৩২, ১৮৬৬, এবং পরিশেষে ১৮৭১ খৃঃ পরিবর্ত্তনে এক প্রকার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মানীর প্রত্যেক রাজ্যই স্বায়ত্ব শাসিত প্রত্যেক জার্ম্মান ভূপালই আভ্যন্তরীক শাসন বিষয়ে স্বাধীন, কিন্তু সমগ্র সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রত্যেক রাজ্য হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া একটি সভা গঠিত হয়, সেই সভাই যুক্ত রাজ্যের জন্য আইনাদি লিপিবদ্ধ করে। সুইটজার্লণ্ডেরও ইহাই অবস্থা। প্রত্যেক ক্যাণ্টন স্বাধীন। প্রত্যেক ক্যাণ্টন স্বায়ত্বশাসিত, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে, প্রজাবৃন্দের দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচিত হয়, প্রত্যেক ক্যাণ্টনের আভ্যন্তরীন শাসনের জন্য প্রত্যেক ক্যাণ্টন সুবিধা মত বিধানাদি করিতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় সম্বন্ধ রক্ষার জন্য এবং সুইস ক্যাণ্টন সকলের পরস্পরের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য একটি সভা আছে

তাহাতে প্রত্যেক ক্যাণ্টন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে।* আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের শাসন যন্ত্রের কথা সকলেই বিদিত। আমেরিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বায়ত্ত শাসন পুরা মাত্রায় বর্ত্তমান। কিন্তু কতকগুলি ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের উপর সংন্যস্ত।

যুক্ত রাজ্য গঠন করিবার পদ্ধতির সূক্ষ্ম বিবরণ ব্যবচ্ছেদ করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। ইহার মোটামুটি নীতি কি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।† ইহার গঠন দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমতঃ যুক্তরাজ্যের কোনও নিয়ম প্রত্যেক রাষ্ট্রের উপর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ আবার সেই আইন মান্য করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ না করিলে সে দেশের প্রজাগণ তাহা মানিয়া লইবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রজা দুই প্রকার আইনের দ্বারা শাসিত হইতে পারে—তাহার দেশীয় শাসন কর্ত্তার আইন এবং যুক্ত রাষ্ট্রের শাসন প্রণালীর আইন। শেষোক্ত প্রণালীই বিশেষ সুবিধা জনক ও হিতকারী।

যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের সুবিধা ও হিতকারী পরিণাম সকল লাভ করিবার জন্য অবশ্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যকে আপনাদিগের ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র সভার (Federal council) হস্তে অর্পণ করিতে হয়। কোন্ কোন্ ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্র রক্ষা করিবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র সভার হস্তে ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য তাহা সহজেই স্থির করা যায়। যে সকল কার্য্যের উপর সমস্ত যুক্তরাজ্যের শান্তি বা পরিচালনা নির্ভর করে সেই সকল কার্য্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র সভার উপর নির্ভর করা বিধেয়। তদ্ব্যতীত সাধারণ শাসন ভার প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ আয়ত্ব মধ্যে রাখিয়া দিতে পারে। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের সকল আইন ও শাসন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ফেডেরাল গবর্ণ-

* ১৭৮৯ খৃঃ পূর্ব্বে সুইস ক্যাণ্টন সকল পরস্পর মিত্ররাজ্য ছিল। এ সম্বন্ধ ১৮১৫ খৃঃ ঘনীভূত হয়। তাহার পর ১৮৭৮-১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তনে সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

† এ বিষয়ে Mill's Representative Govt. এবং Sidgwick's Element of Politics দ্রষ্টব্য।

মেণ্টের অধীন। জার্ম্মানীর রাজ্যগুলি জুলভেরিন (Zolverin) নামক সন্ধিসূত্রের দ্বারা পরস্পরের পণ্য দ্রব্যের উপর কর উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার পর মুদ্রাযন্ত্র (Coinage) সংক্রান্ত নিয়মাবলীও যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে পতিত হওয়া উচিত। ডাক বিভাগও এতদর্থে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য। সকল রাজ্যে এক নিয়মে এবং এক শাসন অধীনে ডাক বিভাগ না থাকিলে প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট ও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথাটি এক প্রকার আধুনিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন জগতে মিত্ররাজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল। সে প্রথামতে এক রাজা অপর রাজার বিপদ্‌কালে উপকার করিতেন এবং মিত্র রাজার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ বন্ধনে দৃঢ়তা কোনও প্রকার ছিল না। প্রাচীন ভারতবর্ষে ও প্রাচীন গ্রীসে যদ্যপি এই আধুনিক প্রকারে যুক্তরাজ্য প্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস অপর প্রকার হইত। প্রাচীন গ্রীসে ম্যাসিডোনিয়া অভ্যুত্থানের পর কিয়ৎ পরিমাণে এরূপ যুক্তরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু একেয়ান (Achean) ও ইটোলিয়ন (Aetolian) লিগ্‌ ঠিক উপরোক্ত প্রথায় সংগঠিত হয় নাই।

আর একপ্রকার রাজ্যের সম্মিলন আছে যাহাকে যুক্তরাজ্য বলা যাইতে পারে না। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মিশ্রণে যে ব্রিটিস্‌ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহা যুক্তরাজ্য নহে।* ব্রিটিস্‌ রাজ্যে ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি দেশের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালীর অস্তিত্ব নাই। ইহা একই রাজ্য। চারিটি রাজত্বেরই প্রতিনিধি একই পার্লামেণ্টে বসিয়া আইন নির্ম্মাণ করিতেছে। কিন্তু সমস্ত ব্রিটিশ্‌ সাম্রাজ্যটিকে একটি যুক্ত সাম্রাজ্য বলা যাইতে পারে। আমেরিকার ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহারা যথা ইচ্ছা আইনাদি লিপিবদ্ধ করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে ইংরাজ বাণিজ্যের উপরও কর বসাইতে পারে। কিন্তু তথাপি সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন জন্য উপনিবেশগুলি কতক পরিমাণে বিলাতের উপর

---

* Prof. Sidgwick বলেন—Federal unionএর দুইটি বিশেষত্ব—"Unity of the whole aggregate" এবং "Separateness of parts".— chap. xxvi.

নির্ভর করে। অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্ত্তারা ইচ্ছা করিলে অষ্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীন উন্নতির জন্য যথা ইচ্ছা একটা নূতন বিধান করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা তত্রতা সৈনিকদিগকে ইংলণ্ডের বিনা অনুমতিতে কোনও শত্রুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে পারেন না।

উদারচেতা সহৃদয় অনেক ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদিগের অভিমত ভারতবাসীগণ যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইলে তাহারাও উপনিবেশবাসীদিগের মত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। এবং সমগ্র ব্রিটিস্ যুক্ত সাম্রাজ্যের তাহারাও এক স্বাধীন অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। অবশ্য ঐ সকল মহৎ হৃদয় ইংরেজদিগের বাক্য সাফল্য লাভ করিবে কিনা তাহা যাঁহারা ইংরেজদিগের ভারত শাসন ও তাহাতে ভারতবাসীদিগের শাসন ভার প্রাপ্তির কথা জানেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যে সকল ভারতহিতাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ আছেন তাঁহারা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে পরে কি হইবার সম্ভাবনা তাহা কল্পনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইবার আবশ্যক নাই। দুঃখের বিষয় যাঁহারা ভারতবাসীকে ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাদিগের সমকক্ষ দেখিতে চাহেন, ভারত শাসন ভার তাঁহাদিগের হস্তে নিপতিত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথা হইতে পৃথিবীর অনেক উপকার আশা করা যাইতে পারে। অবশ্য সমস্ত সুসভ্য জগতে একটি যুক্তরাজ্য স্থাপিত হইবে কিনা সে কথা বলা দুরূহ। কিন্তু ক্রমে এই প্রথার আংশিক ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত সুসভ্য জগতে এমন একটি প্রতিনিধি সভা সংগঠিত হইতে পারে যাহার উপর রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বা মনোমালিন্য হইলে তাহা ভঞ্জনের ভার ন্যস্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে সুসভ্য জগতে অযথা সমর সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে এবং তাহার সহিত অমানুষিক লোকক্ষয়, অর্থ নাশ, প্রজানষ্ট, ও অশান্তির শেষ হইতে পারে। কিন্তু কোন্ মহাযুগে, পৃথিবীর কোন্ উন্নত অবস্থায় এরূপ শালিসির জন্য সমগ্র সুসভ্য জগতের প্রতিনিধি সভা গঠিত হইতে পারে তাহা বলা সুকঠিন। আমার বিশ্বাস এরূপ কাল কখনও আসিবে না।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্।

কবিতা-কুঞ্জ।

মুক্ত আত্মা।

(১)

সংসার বন্ধন মোর ছিন্ন করি
আজ ভুলিয়াছি যত হিংসা দ্বেষ,
ভালবাসা আর যত কিছু আশা
আজ হলো শেষ, মোর হলো শেষ।

(২)

বৃথা যার তরে কাঁদি দিবানিশি
কাটায়েছি কাল দুঃখেতে অশেষ,
আজি তারা সবে ভুলেছে আমায়—
সংসারের মায়া শ্মশানেতে শেষ!

(৩)

এইত সংসার, এর তরে এত
ভাবি তাই কেন—করিয়াছি হায়!
কেন সারাদিন ভ্রমি পথে পথে
ছিনু গো বিকায়ে সংসার-মায়ায়!

(৪)

শুধু স্বার্থে যেথা আদান প্রদান,
ভালবাসা যেথা স্বার্থের আশায়,
প্রেম, ভক্তি, যেথা চরণে দলিয়া
রূপ অর্থে পূজা করিতেছে হায়!

(৫)

সেই দেশ হতে লভিয়া মরণ
অনন্ত আকাশে পাইনু স্বদেশ।
বাঁচিল জীবন অনন্তে মিশিয়া—
ভুলি খেলা মোর আজি হলো শেষ!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মাতৃভাষা।

অয়ি মোর মাতৃভাষা! মহিমা মণ্ডিতা!
শতাব্দী অতীতে মাতঃ! কুসুম শোভিতা!
ভক্তকবি পুষ্পহারে পূজিল তোমায়
চণ্ডীদাস শ্রীগোবিন্দ—অক্ষয় অব্যয়
তাহা চিরমধুময়! কত কাল পরে
আভাময় স্থকিরিটী ঈশ্বর নির্ম্মিল
বঙ্কিম অমর শিল্পী হীরক বেষ্টিল—
সাজাইল বরবপু নব অলঙ্কারে
মাইকেল দীনবন্ধু—মণিমুক্তাভারে
রবীন্দ্র নবীন হেম। সৌন্দর্য্যশালিনি!
কে বলে মা দীনা তুমি! ভুবনমোহিনি!
সপ্তকোটী পুত্র তব যবে সমস্বরে
আরাধয়ে তব নাম মাতৃজয় ধ্বনি—
কত না বৈভব তব—অয়ি বিমোহিনি!

শ্রীউমাচরণ ধর।

গৃহে ফিরে চল।

স্বদেশ স্বগৃহ ত্যজি বহুদিন মন,
দূরে দূরে বহু দূরে সসঙ্গী একলা
করিলেত বিচরণ স্বজনে নিরলা;
লভিলে কত মত জন দরশন।
লভিলে কি প্রতিদানে—প্রণয়ে প্রণয়?
সারল্যেতে সরলতা? বিশ্বাসে বিশ্বাস?
স্নেহে স্নেহ? হিতে হিত? আশ্বাসে আশ্বাস?
কভু নহে, বিপরীত লভেছ নিশ্চয়!
তাই যদি, ক্ষান্ত হও, বৃথা কেন আর
কণ্টক কুটিল-পথে হবে অগ্রসর?

চেয়ে দেখ অবসন্ন চরণ তোমার
কাল মরীচিকা ভ্রান্ত হয়ে নিরন্তর।
মলিন উজ্জ্বল কান্তি, শুষ্ক কণ্ঠতল;—
পাইবে আবার শান্তি গৃহে ফিরে চল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বাসনা।

অন্য কোন সাধ নাই,
পুড়ে দেহ হ'ক্ ছাই,
মিশাক্ ধরায়—
পঞ্চভূতে মিশে যাক্
স্মৃতিটুকু পড়ে থাক্
অযত্নে হেথায়।

শুনেনা যেন সে ভুলি
সে ভস্মাবশেষ গুলি
এই অভাগীর,
কাঁদিতে দিওনা তারে
কাঁদিতে সে জানেনারে
হইয়া অধীর।

ভুলক্রমে পেয়ে ব্যথা
যদি সে আসেগো হেথা
দলে ভস্মরাশি——
"তুমিগো আমার" বলে,
লুটাবে সে পদতলে,
তীব্র জ্বালা নাশি।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

গ্রন্থ—সমালোচনা।

প্রসাদী—গীতি-কবিতা, শ্রীযুক্ত করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। পাঠ করিতেই, বোধ হইল, ইহা রবীন্দ্র বাবুর "চিত্রার" ছাঁচে ঢালা। উচ্চ আদর্শের অনুকরণে আংশিক সফলতা লাভ করা বিচিত্র নহে, সুতরাং কবি যে কথঞ্চিৎ সফলকাম হইয়াছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে তাঁহার কল্পনার মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হইল, যথা—

"রাঙ্গা আঁখি মেলি আনারসরাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত তাজ
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন দীঘিপারে।"

* * * * * *

"শারদ কৌমুদী থেকে সুধা গলাইয়ে
বিম্বাধর হতে তব বর্ণ ফলাইয়ে।"

ইত্যাদি নবীন কবি হইলেও যেখানে তিনি গ্রাম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সেখানে তাঁহার পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, নমুনা দেখুন—

"ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট
অশথের তলে বসেনাক হাট

সারাদিন রাত বৃষ্টির ছাট
ঝরিতেছে একঘেয়ে
ভাসিল পুকুর আউষের ভুঁই
পালায় কাৎলা, কালবোস্ রুই
আঙ্গিনার জল করে ছল ছল
কই যায় কাণে হেঁটে।"

ইত্যাদি। অন্যান্য কবিতার মধ্যে তাঁহার "ধ্রুবব্রত" "ঊষা" "আত্মদান" "যাচনা" "প্রার্থনা"—কবিতাগুলি কাব্যোদ্যানের সরস কলিকা। "৺হেমচন্দ্র" শীর্ষক কবিতাটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, পাঠে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, যথা—

"কত আশা করেছনা! কিছু কি পূরেছে তার
ওগো অন্ধ কবি ?
অরুন্তুদ গীতে তব জেগেছে কি হিন্দুস্থান
প্রায়শ্চিত্ত লভি!
এই অভিসপ্ত ভূমে বুঝি গুরো পথ ভুলে
পড়েছিলে এসে!
কেন না জন্মিলে কবি উপযুক্ত কালে আর
উপযুক্ত দেশে ?"

"দেবোদ্দেশে" কবিতাটী বেশ হইয়াছে। আমরা "প্রসাদী" পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

আশা—শ্রাবণ ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় "হিন্দু বিধবা" অভিধেয় প্রবন্ধটী সুলিখিত ও সারগর্ভ। "হেমলতা নাটক" ও "পৌরাণিক প্রসঙ্গ" পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য নাটক ও প্রবন্ধ। "ভরসা কোথায়" এটীও পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর, এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। "আশার" কলেবর অতি ক্ষুদ্র তাহার উপর এতগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় পাঠে পরিতৃপ্তি হইল না।

নববিকাশ—আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১১। এবার নব বিকাশের যুগ্ম সংখ্যা। বর্ত্তমান সংখ্যায় "এস মা!" একটী সুদীর্ঘ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা—ভক্তের উচ্ছাস, সুতরাং বেশ হইয়াছে। "লক্ষ্মী ও সরস্বতী"—পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বারাঙ্গনাতত্ত্ব—নূতনত্ব কিছুই পাইলাম না, সুতরাং প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। "একটী হাসি" একটী অদ্ভুত

কবিতা! আমরা এই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"বস অনুতাপ, বেয়াদপি সবে কর মাপ,
আমি একটু হাসি।"

পাঠক কবির "বেয়াদপি মাপ" করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। আবার শুনুন—

* * * *

"হাস তবে জিহ্বা, শুধু কেঁদে ফল পাস কিবা?
কেবল কাঁদিলি, ভুলে নয় একটু হাসিলি
উচ্চ তান ধরে, হাস দেখি আজ প্রাণ ভরে
হেসে মাতগল, যে বলে বলুক সে পাগল
আমি একটু হাসি।"

কবি এরূপ অপূর্ব্ব ও "কাষ্ঠ-হাসি" না হাসিলেই ভাল করিতেন, অপূর্ব্ব হাসি হাসিলেই যে হাস্যাস্পদ হইতে হয়! "একটু কাঁদি"—কবিতাটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। মায়া (গল্প) প্রথমাংশে বাজে বকুনীর ভাগটাই বেশী—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতগুলি দুই এক স্থানে অস্বাভাবিক, পাঠে বোধ হয় শেষ মিল বজায় রাখিবার জন্য লেখককে বড়ই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। শেষাংশটুকু বড়ই সংক্ষেপ। "অর্জ্জুনের শোকশান্তি" ক্রমশঃ প্রবন্ধ। "কৃষ্ণাঙ্ক দ্বীপ" প্রবন্ধটী সুলিখিত ও গবেষণাপূর্ণ।

ধূমকেতু—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩১১। ধূমকেতুর যুগ্ম সংখ্যা আমরা আশ্বিন মাসেই পাইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় 'ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" প্রবন্ধটী গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। "চেতনা" কবিতাটী মন্দ নহে। "উপাধি-ব্যাধির মুষ্টিযোগ"—লেখক "উপাধি-ব্যাধি" আরোগ্য কল্পে যে মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিয়াছেন অনেক উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সেই মুষ্টিযোগ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। "প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম" প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। "প্রেমের প্রথম স্বপ্ন" দেখিতে দেখিতে কবি "যে আত্মহারা দিশেহারা বিহ্বল বেহোস্" হইবেন, আশ্চর্য্য কি। প্রত্যাবর্ত্তন (গল্প)—এরূপ অসংলগ্ন অস্বাভাবিক গল্প বহুদিন আমরা পাঠ করি নাই। মহত্ব (প্রবন্ধ)—প্রবন্ধটী সারগর্ভ লেখার বেশ বাঁধুনী আছে।

নবনূর—কার্ত্তিক ১৩১১। "ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ"—ক্রমশঃ প্রবন্ধ। "বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান"—লেখক হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপনার্থ দুই একটী সদুপদেশ দান করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই ধন্যবাদের পাত্র। কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলি কবিতা চলনসই; "এই শেষ" শীর্ষক কবিতায়—

"আমার ক্ষুণ্ণ হৃদয় মলিন
চলিল অন্যদেশ।"

* * * * * *

হায় কারো কাছে, আছে কিনা আছে
দেখি প্রেম সবিশেষ।"

উক্ত কয়েক ছত্র না লিখিলেই ভাল হইত।

মাসিক পত্রিকা ও

সমালোচনী।

(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ।] পৌষ ১৩১১। [একাদশ সংখ্যা।

নিরাশ প্রতীক্ষা।

তোমারে পূজিব বলি বহুবর্ষ ধ'রে,
শূন্য এ মন্দির মোর—তোমারে সঁপিয়া
নিরাশ প্রতীক্ষা কত—কত সাধ ক'রে,
আপনি আগুলি' দ্বার রহিনু বসিয়া।

কত পুষ্প স্তরে স্তরে ফুটেছিল পাশে,
হরিত মধুর গন্ধে পথিকেরি মন;
স্বহস্তে রচিনু মালা শুধু তব আশে,
পরা'ব তোমারি গলে করিয়া যতন—

অনিমিষে কতনিশি পথ পানে চাহি
ফেলেছি তোমার ধ্যানে তপ্ত আঁখিজল,
শতধা এ হৃদিমাঝে হেন স্থান নাহি,
যথায় মুরতি তব নহে সমুজ্জল।

নীরব ক্রন্দন মোর শুনে নাই কেহ,
জীর্ণ এ মন্দির পানে চাহেনি ফিরিয়া;
শত ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে শীর্ণ মোর দেহ,
তবুও তোমারি আশে এখনও বসিয়া।

কত দিন—কত মাস—কত বর্ষ আর
এমনি নীরব ধ্যানে কাটিছে জীবন;
কত পান্থ—শ্রান্ত আঁখি হেরি বার বার
তবুও প্রতীক্ষা মোর নহে সমাপন—
এ হৃদি-মন্দির মোর এমনি করিয়া,
তব আশে চিরদিন রহিবে পড়িয়া।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

কর্ম্মফল ও গ্রহের ফের।

যখন ভোগসুখ-নিরত আনন্দ-বর্দ্ধিত ধনীজনের বিলাসহর্ম্ম্যের সহিত আপনার দীন হীন মলিন কুটীরের তুলনা করি, তখনই দেখি এ পার্থক্যের মূল আমার আপনারই দোষ। আবার যখন অশান্তিভরা দুঃখক্লেশময় আত্মজীবনের সহিত শান্তিময় স্বর্গীয় সুখভোগী মহজ্জনের সুখকর জীবনের তুলনা করি, তখনও দেখি এ ব্যাপারের মূলে রহিয়াছে আমারই আপনার শিল্পনৈপুণ্য। আমি আপনাকে যেমন করিয়া গড়িয়াছি, আজ আমি তেমনি হইয়াছি। যেমন বীজ বপন করিব, তেমনি শস্য পাইব, যেমন কর্ম্ম করিব, তেমনি ফল ভোগ করিব,—ইহা জগতের রীতি, ইহা নিত্য পরিলক্ষিত অবিনশ্বর সর্ব্বযুগস্থায়ী সার সত্য।

এ নীতিতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। জড়বাদ ও নাস্তিক দর্শন হইতে বেদ বেদান্ত সকল শাস্ত্রই এ নীতির সত্য স্বীকার করে। অগ্নিশিখায় হস্ত প্রদান করিলে দগ্ধহস্তের যাতনা সহ্য করিতে হয়, পৌষমাসের দারুণ শীতের সময় অনাবৃত দেহে শিশিরসিক্ত হইলে পীড়িত হইতে হয়, ইহা সকলেই জানে; এই নিয়মেই জগত চলিতেছে। আবার হস্তে ঔষধ লেপিয়া দীপশিখায় হস্ত প্রদান করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, ইহাও ঐ নীতির একটি দৃষ্টান্ত, তাহার বিরুদ্ধ-নীতির দৃষ্টান্ত নহে। কর্ম্ম ও কারণের সম্বন্ধ যতই গূঢ়, যতই রহস্যপূর্ণ ও জটিল হউক না কেন, তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। বৈজ্ঞানিকের জীবন এই সম্বন্ধ স্থির করিতেই অতিবাহিত হইয়া যায়, কোন্ কারণের কি কর্ম্ম, কোন্ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে কি ফল পাওয়া যায়, এই প্রশ্নই বৈজ্ঞানিকের হৃদয় আলোড়িত করে।

সুতরাং যখন নিরুপায় অসহায় অবস্থায় কলপ্রবাহিনী স্রোতস্বতীর স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাই আর দেখি কত ব্যক্তি সুন্দর সুগঠিত সুদৃশ্য তরণীবক্ষে নাচিতে নাচিতে নদীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আপন উদ্দেশে বাহিয়া যাইতেছে, তখন এ নীতি মনে থাকিলে আর জগতের নিয়মগুলাকে অসমীচীন ও অসংযত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তখন বুঝিতে পারি আমি স্বয়ং

অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, তটিনীর স্রোতের প্রাবল্য বিচার না করিয়া মাঝ দরিয়ায় ঝম্প প্রদান করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এ দুর্দ্দশা, আর আমার সহযাত্রী হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্বাপর সকল দেখিয়া নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছে তাহার বিপদ কম হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? জগতে যে যাহার কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আমি সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা আমার স্বোপার্জ্জিত উপহার। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন তাহার পূর্ব্বজীবন হইতেই সমুদ্ভূত, পূর্ব্বকৃত দোষ হইতে দুঃখ ও যাতনা উৎপন্ন হয়, এবং পূর্ব্বকৃত সুকৃতি হইতে শান্তি জন্মে। *

আত্মোন্নতি হিন্দুদিগের প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে আপন উদ্যমে আপন কর্ম্মের দ্বারা আপনার সাধনে নিজের মোক্ষের পথে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দুজাতির। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আপনার উন্নতির জন্যই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণ বিজনে বিপিনে, পর্ব্বতে কন্দরে, ইতর মনুষ্য কোলাহল হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়া জন্ম জন্মান্তর সাধনফলপ্রাপ্ত উন্নতজীবনের অধিকতর উন্নতি সাধনে কৃতচেষ্ট হইতেন। তাঁহাদের জীবনের এক অবস্থায় তাঁহারা আমাদিগেরই মত রমণী কাঞ্চন, ভোগস্পৃহা ও বিলাস লালসার দাসত্ব করিয়াছিলেন এবং আমাদেরও যে যুগ যুগান্তর কাল পরে, অযুত জীবন অন্তে তাঁহাদিগের মত উন্নত জীবন লাভ না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? অন্যে যাহা বলে বলুক, হিন্দুশাস্ত্র তাহা বলে না। আর্য্যজাতি বিশ্বাস করে জগতের এই ঘাত প্রতিঘাত, দুঃখ যন্ত্রণাগুলির শিক্ষায় ক্রমে জ্ঞান বিকাশ হয় এবং সেই জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে সর্ব্বজ্ঞ করে। তখন তাহার পিঞ্জরবদ্ধ আত্মার মুক্তি হইয়া যায় এবং সেই মুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হিন্দুর লক্ষ্য, এই উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রশ্মি লক্ষ্য করিয়াই মানব তাহার বাঞ্ছিত পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে।

---

* "The books say well, my Brothers! Each man's life
The outcome of his former living is
The bygone wrongs bring forth sorrows and woes
The bygone right breeds bliss."—

Edwin Arnold.

এই অনন্ত পথে সুদীর্ঘ যাত্রা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই করিতে হয়। এবং তাহার নিজের পথ প্রত্যেককেই আপনা আপনি দেখিয়া লইতে হয়। মনুষ্য সেই পথের দিকে অগ্রসর হয় তাহা আপনার অনুষ্ঠানের ফলে, সে পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, তাহাও আপনার নিজ কর্ম্মফলে। ইহাতে পরের উপর দোষারোপ করিবার কিছুই নাই। সেই অনন্ত পথে ভ্রমণ করিবার জন্য জগদীশ্বর যে সকল উপায় ও সুবিধা সৃজন করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের উপর নিজ যত্নে আধিপত্য ও আয়ত্ত বিস্তার করিয়া তাহাদের সাহায্য লইতে পার ভালই। আলস্যবশতঃ আত্মদোষে সেই অনন্ত অসীম পথে পায়ে কাঁটা বিঁধিয়া, বাধায় পা লাগাইয়া আপনি পড়িয়া মর, তাহা নিজের বুদ্ধি ও কর্ম্মের দোষে হইবে।

একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে জগদীশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মের ও ভোগের জন্য দায়ী করিয়া তাঁহার পক্ষপাতশূন্যতার দিব্য সুন্দর উদাহরণ দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রকারদিগের অনুগ্রহে যাঁহারা কর্ম্মফল নীতির সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা দুঃখের সময় বেশ শান্তি পাইতে পারেন। "কি করিব পূর্ব্বে ভ্রমবশে একটা কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তখন দুষ্ট সঙ্গীদিগের দলে পড়িয়া (অথচ নিজ ইচ্ছায় ও কার্য্যের দ্বারা) সমস্ত বৎসরটা নাচিয়া গাহিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইয়াছি এখন আর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া শোক করিলে কি ফল হইবে? আচ্ছা এ বৎসরটা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি নিশ্চয় পাশ করিতে পারিব। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" এইরূপ চিন্তা না করিলে অনুতপ্ত ছাত্রের যাতনার অবধি থাকিত না।

যতক্ষণ আত্মকৃত ভালমন্দ কর্ম্মগুলার সু ও কুফলগুলিকে এই কর্ম্মফল নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করি, ততক্ষণ কোনও গোল জন্মে না। বুঝি, একটা সত্যের কার্য্যবশতঃ কতকগুলা কার্য্য হইতেছে। সেই সত্যটাকে বুঝিতেও বিশেষ একটা কোনও কিম্ভুদকিমাকার মস্ত বড় মেধারও আবশ্যক হয় না বা সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করিতে জন্মজন্মান্তরের কঠোর সাধনেরও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যখন বলি কি করিব, নিজের কর্ম্ম ফলে দুঃখ ভোগ করিতেছি বা আমার প্রতিবাসী নিজ সুকৃতি ফলে সম্পদ

রাশি উপভোগ করিতেছে, তখন একটা সরল স্বাভাবিক কথাই বলিয়া থাকি মাত্র।

কিন্তু ইহা ব্যতীত অপর একটি কথার দোহাই দিয়া ও আমরা এক এক বার দুঃখের সময় শান্তি পাইতে চেষ্টা করি। নিজের অপরাধ অপরের স্কন্ধে ফেলিতে পারিলেই আমরা সুখী হই। সেই অভ্যাসের দোষেই হউক বা অপর কারণেই হউক, আমরা আমাদের মন্দ ভাগ্যের দায়িত্ব অনেক সময় গ্রহদিগের উপর নির্ভর করি। যখন উত্তরোত্তর জ্বালা যন্ত্রণার তীব্র কষাঘাতে বিরক্ত হইয়া গণকঠাকুরের স্মরণাপন্ন হই, তখন তিনি আঁক কাটিয়া শ্লোক আওড়াইয়া বলিয়া দেন, শনি তোমার বিপক্ষে, কি করিবে বাবা! গ্রহের পূজা দাও, বিপদ কাটিয়া যাইবে।

আমরা সাধারণতঃ চলিত কথায় যতটুকু বুঝি তাহাতে বোধ হয় লোক-বিশ্বাস গ্রহদিগের শুভ বা অশুভ দৃষ্টিই আমাদিগের সুখ দুঃখের কারণ। শনি বা রাহুর যখন আধিপত্য ছিল সেই লগ্নে জন্মিয়াছিলাম বলিয়াই আজ এ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যেমন ভাগ্যক্রমে আমার কোনও যত্ন বা ইচ্ছা ব্যতীত উপরোক্ত লগ্নে জন্মিয়াছিলাম, সেইরূপ যদি হঠাৎ অপর একটি শুভ লগ্নে জন্মিতে পারিতাম তাহা হইলে বড়ই সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিতাম।*

ঠিক উপরোক্ত প্রকারে যদি গ্রহদিগের মনুষ্য ললাটের উপর আধিপত্যের কথা বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে ত কর্ম্মফল নীতিটি অসত্য ও আজ-গুবি বলিয়া বিস্মৃতির তমসাবৃত নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের সুখ দুঃখের জন্য একজন কর্ত্তাই দায়ী হইতে পারে। যে রাজ্যের আধিপত্য দুই হস্তে ন্যস্ত, যে রাজ্যের শুভ অশুভ কার্য্যের জন্য দুইজন কর্ত্তা দায়ী, সে রাজ্যের শাসন বড়ই বিশৃঙ্খল, সে রাজ্যের শাসন কোন নিয়মের অধীন হইতে পারে না। যদি আমাদিগের কর্ম্মের জন্য আমরাই সম্যকরূপে দায়ী হই, তাহা হইলে গ্রহেরা তজ্জন্য দায়ী হইতে

* "Babies can't choose their own horoscopes, and, indeed if they could, there might be an inconvenient rush of babies at particular epochs."—George Eliot.

পারে না। আবার যদ্যপি আমাদের কর্ম্ম সকল গ্রহশাসিত ও গ্রহকৃত হয় তাহা হইলে যে ভগবান গ্রহগণের খামখেয়ালির জন্য আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তাঁহাকেই বা আমরা ন্যায়বান ও পক্ষপাতশূন্য সমদর্শী বলিতে পারি কেমন করিয়া ?

সুতরাং গ্রহদেবতাদিগের মনুষ্যভাগ্যের উপর ক্ষমতা ও মনুষ্যের শুভাশুভ ভাল মন্দ সকল প্রকার কার্য্য ও ফলের জন্য গ্রহদিগের দায়িত্ব বিষয়ে সাধারণ হিন্দুদিগের যেরূপ সংস্কার আছে তাহার সহিত কর্ম্মফল নীতির কিরূপ ভাবে সামঞ্জস্য হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের আজ কালিকার শিক্ষার দোষেই হউক বা যে কারণেই হউক, একথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি না যে আমরা হিন্দুশাস্ত্র সম্যকরূপে অবগত। সুতরাং শাস্ত্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে সাধারণ ভাবে বুঝিতে এ সমস্যা দুরূহ বলিয়া বোধ হয়।

তবে যদি গ্রহোপাসকগণ একথা বলেন যে যাহার যেরূপ কর্ম্মভোগ হইবে তাহা হিসাব করিয়া গ্রহের আধিপত্য নির্ণয় করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনও গোলই থাকে না। তাহা হইলে যেমন তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে জ্বরের প্রকোপ বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রকার নক্ষত্র গণনা করিয়া কাহার কিরূপ কর্ম্মফল ভোগ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু শরীরের উষ্ণতার জন্য তাপমান যন্ত্রও যেরূপ দায়ী, মনুষ্যের শুভাশুভের জন্য গ্রহগণেরও দায়িত্ব তাহা হইতে অধিক, একথা বলা যায় কেমন করিয়া ? মনুষ্যের কর্ম্মের জন্য মনুষ্যই দায়ী না হইলে সমাজে একটা বিবেক ভীতি থাকিত বলিয়া আমার ত বোধ হয় না। আর অপরে নাচাইতেছে আমরা নাচিতেছি, এ কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলেই বা এত বড় জগতব্যাপী পুতুল নাচ দিয়া ভগবানের কি আমোদ হইত তাহাও বুঝিতে পারা সুকঠিন।

বিপদের সময় গ্রহ শান্তি করিবার জন্য পূজা দিলে যে বিপদের লাঘব হয় তাহা আমি অস্বীকার করি না। আমাদিগের কাজ কর্ম্মের জন্য যখন গ্রহগণ দায়ী নহেন, যখন গ্রহগণ কেবল আমাদের সুখ দুঃখের নিদর্শন মাত্র, তখন গ্রহ পূজা দ্বারা আপদের লাঘব হইতে পারে একথা বলিলে

যেন একটা ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্যের অবতারণা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এবাক্য প্রলাপ নহে। কর্ম্মের দ্বারা যেমন কুফল পাওয়া যায়, কর্ম্মানুষ্ঠানে তেমনি সুফলও লাভ হয়। এক কর্ম্মের ফল কাটাইতে হইলে অপর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যেমন অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে হস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, আবার হস্তে ঔষধ লাগাইলে দগ্ধ হস্তের যাতনার উপশম হয়। অগ্নিতে হস্ত দেওয়া একটি কর্ম্ম এবং হস্তে ঔষধি লেপন অপর একটি কর্ম্ম। একটি কর্ম্মের ফল অপর কর্ম্মের দ্বারা সংশোধিত হইল।

স্তব স্তুতি, পূজন ভজন সকলই কর্ম্ম। যাহারই পূজা দাও, যাহারই স্তব স্তুতি কর, ঐরূপ কর্ম্ম মাত্রেই চরিত্র গঠনের পক্ষে উপকারী। স্বামীকে স্ত্রী পূজা করিলে স্বামী ঘৃণিত হইলেও স্ত্রীর মানসিক উন্নতি হয় তাহা কে সন্দেহ করিবে? বিল্বমঙ্গল যে বারবনিতা চিন্তামণিকে পূজা করিত, তাহা কি তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে উপকার করে নাই? বিল্বমঙ্গল ভাল বাসিতে জানিত বলিয়াই তাহার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ ওরূপ হৃদয়স্পর্শী মধুর ও সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল। যখন পার্থিব জীবের পূজা একটি সৎকর্ম্ম তখন দেবতার পূজার যে একটা মন্দ কর্ম্মের ফলকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আছে তাহাতে বিচিত্র কি? কাজেই গ্রহ পূজা একটি সৎকর্ম্ম। সেই কর্ম্মের প্রভাবে মন্দ কর্ম্মের কুফল আমাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া যাঁহারা বলেন পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহগণ উপাসককে যন্ত্রণা দিতে বিরত হয়েন, তাঁদের ধারণা কতদূর নির্ভুল তাহা আমি বলিতে পারি না। এ বিষয়ে কেহ কর্ম্মফল ও গ্রহদিগের আধিপত্যের বিষয় সামঞ্জস্য করিয়া শাস্ত্রীয় মত ব্যক্ত করিলে লেখক চরিতার্থ হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি, এল্।

মাধুরী।

(৪)

অষ্টমীর দিন তৃতীয় প্রহরে বিজনবিহারী দলবল সহ পাটলীর উত্তরে বাজনপুরের ঘাটে বজরা বাঁধিল। সে দিনটি হিন্দুর পবিত্র দিন। বেলা

পাঁচটার সময় সন্ধিপূজা। বিজনবিহারী উপবাস করিয়াছিলেন; মহামায়ার পূজার পর প্রসাদ খাইবেন এইরূপ ইচ্ছা। যাজনপুরের প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীতে অর্চ্চনা দেখিয়া তাহার পর সকলে পান ভোজন করিতে পারিবে, নৌকাস্বামীর এইরূপ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথা? পাপীর হৃদয়ে ধর্ম্মের বাহ্যিক আবরণগুলা আপনিই ক্ষমতা বিস্তার করিয়া লয়। অধর্ম্মের জীবনযাপন করিয়া কেহই একথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, দিন দিন তাহার পবিত্র অসীম অনন্ত জীবন প্রত্যাশী জীবাত্মার অধোগতি হইতেছে। ধর্ম্ম অর্থে সৎজীবন এ ধারণা আমাদের মস্তিকে অল্পই প্রবেশ করে।

এই দুই দিনে মুরলীমোহনের সরলতা ও তাহার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের গঠন দেখিয়া এবং তাহার বালকভাবে বিজনবিহারী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকবার মুরলী বিনীতভাবে অথচ তাহার সরল তেজস্বী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহার কর্ত্তব্য কি হইবে? বিজনবিহারী হাসিয়া বলিত, আপাততঃ আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহা ও আমার কনিষ্ঠের মত আমার নিকট থাকাই তোমার একমাত্র কার্য্য। মুরলী লজ্জিত হইত, তাহার নূতন প্রভুর উদারতায় তাহার হৃদয় সুখে ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া যাইত এবং স্বেচ্ছাচারী বিজনবিহারী তাহার ব্রীড়ানম্র সরল মুখ দেখিয়া হাসিত।

স্নানাদি সমাপন করিয়া মুরলী দেখিল বিজনবিহারীর ভৃত্য এক সুন্দর বহুমূল্য বেনারসী বস্ত্র লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মুরলী বলিল,—একি! এ বস্ত্র ত আমার নহে। ভৃত্য বলিল—হুজুরের হুকুম। গোলমাল শুনিয়া বিজনবিহারী হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিল, বলিল—মুরলী আজ মহাষ্টমী, আজ মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে হয়, পট্টবস্ত্র পরিধান কর।

সমস্ত সপ্তমীর দিন মাধুরীর সংজ্ঞা হইল না। সংজ্ঞা হইলে মাধুরী দেখিত একটি সুন্দরী যুবতী তাহার মস্তকের নিকট বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে; মাধুরীর আবার সেই কৃতান্ত দূতদ্বয়ের মূর্ত্তি মনে পড়িত; বালিকা আবার মূর্চ্ছিতা হইত।

অষ্টমীর প্রাতে মাধুরী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। বালিকা শুষ্ককণ্ঠে ক্ষীণস্বরে অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কোথায় যাইতেছি? আপনি কে?

অনুপমার চক্ষে জল আসিল। প্রথমে সাধ্বী ভাবিল স্বামীর অভিসন্ধি মাধুরীকে কিছু বলিবে না। কিন্তু সে ভাবিল সকল কথা বালিকাকে বুঝাইয়া বলা ভাল। তাহাকে একটা সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দুর্ব্বৃত্ত স্বেচ্ছাচারী নরপিশাচের বারবিলাসিনী হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্যে অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় কিম্বা ত্রিতাপনাশিনী পবিত্রোর্ম্মী জননী ভাগীরথীর ক্রোড় এরূপ দুর্দ্দশাপীড়িতা হিন্দুমহিলার উপযুক্ত বাসগৃহ, তাহা একবার অভাগিনীকে বিচার করিবার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বলা কিশোরী ভীতভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, বলিল—তবে কি হবে? আমি এখনই গঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া পবিত্রতা রক্ষা করি। এখন একদিনের বিপদে মাধুরী প্রজ্ঞামতী চিন্তাশীলা রমণী হইয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠীর রাত্রে ধনপতিসিংহের ক্রীড়াশীলা জ্ঞানবুদ্ধিহীনা বালিকা মরিয়াছিল।

অনুপমা বলিল—দেখ না বোন। শেষ অবধি অপেক্ষা কর। মা দুর্গা তোমার কাতরোক্তি শুনিয়া তোমার রক্ষণসাধনের জন্য কোনও দূত পাঠাইয়া দিবেন না, একথা কে বলিতে পারে?

যাজনপুরে নৌকার গবাক্ষ দিয়া বৈকালে যুবতী ও কিশোরী ঘাট দেখিতেছিল। একটি দাসী উভয়কে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছিল। সৌন্দর্য্যে অনুপমা মাধুরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না তাহা বলা সুকঠিন। একটি প্রস্ফুটিত বিকশিত লাবণ্যময়ী নলিনী। অপরটি ঈষৎ বিকশিত বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলস্থিতা দিনক্ষপামধ্যগতা সন্ধ্যা। মাধুরী দৃষ্টিসুখকর হৃদয় উষ্ণকারী স্নিগ্ধ মনোহর রক্তিম বালারুণ। অনুপমা বিকীর্ণরশ্মি তেজ তাপময় দগ্ধকারী মধ্যাহ্ন ভাস্কর। অনুপমার রূপ দগ্ধ করিবার। মাধুরীর লাবণ্য মজাইবার, দূরে থাকিয়া পূজা গ্রহণ করিবার। তাই দুর্ব্বৃত্ত বিজনবিহারী তাহাকে নৌকায় রাখিয়াই সুখী হইয়াছিল। তাহার রূপবহ্নিতে দগ্ধ হয় নাই।

(৫)

ধীরে, অতি ধীরে দিবসব্যাপী শাসনকার্য্য সমাধা করিয়া দিনমণি পশ্চিম গগনে অবতরণ করিতেছিলেন। নৈশ নিস্তব্ধতাকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিবার জন্য মহীরুহে মহীরুহে অসংখ্য ভিন্ন জাতীয় বিহঙ্গমকুল কূজন

করিতেছিল। যাজনপুরের নদী সৈকতে বসিয়া পট্টবস্ত্রধারী বিজনবিহারী ও মুরলীমোহন কথা বার্ত্তা হাস্যামোদে ব্যস্ত ছিলেন। একখানা ক্ষুদ্র মেঘ পশ্চিম হইতে কতকটা সিন্দুর অঙ্গে লেপন করিয়া দুইটা বৃহৎ বৃক্ষের মধ্যস্থল হইতে যুবক দুইটিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। উভয়েরই দেহ সুগঠিত, উভয়েই সমান উচ্চ। তবে ত্রিংশবর্ষীয় বিজনবিহারীর মুখে সেরূপ জ্যোতি ছিল না, তাহার কটাক্ষের সেরূপ কমনীয়তা ছিল না।

অনুপমা ও মাধুরী গল্প করিতেছিল। হঠাৎ যে স্থলে যুবকদ্বয় বসিয়াছিল মাধুরীর দৃষ্টি তথায় আকৃষ্ট হইল। তখন বিজনবিহারীর একটি রহস্যময় গল্প শুনিয়া যুবক মুরলীমোহন হাসিয়া লুটিয়া পড়িতেছিল। তাহার পরিচিত মুখ দেখিয়া এবং তাহার হাস্য শুনিয়া মাধুরী একটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে তাহার মস্তিষ্কে একটি রহস্যময় জটিল স্থানের কবাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বালিকার কৌতূহল মিটিয়া গেল। সে নিমেষে বুঝিল প্রকৃত ব্যাপারটা কি। ওঃ! বিভীষণ না থাকিলে কখনও রাবণ বধ হইত। গৃহের শত্রু না থাকিলে কি কখনও বিদেশী বিজনবিহারী তাহার সন্ধান পাইত, তাহাকে গৃহ হইতে চুরি করিয়া লইয়া আসিতে সমর্থ হইত? কই মুরলী যে এরূপ প্রতিহিংসার দাস তাহা পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না। ছি ছি! কেন বাবা উহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই ত এরূপ হইল।

বিজনবিহারী বলিল, মুরলী তোমার কালী উপাসনার আজ প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছ কি না দেখিবে আইস। অরি নিপাত করিতে মা চিরকালই অগ্রসর।

মুরলী এ বাক্যের ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিল না, পুত্তলিকার মত সে বিজনবিহারীর পশ্চাতে চলিতে লাগিল। তাহারা বজরার নিকটবর্ত্তী হইলে যুবতী দুইটি ভীত হইল। উভয়েই সকাতরে ডাকিতে লাগিল—লজ্জানিবারক দ্রৌপদীসখা! এইবার তোমার দয়া দেখিব।

বিজনবিহারী বলিল—আর এই সময় যদি ধনপতিসিংহকে হেথায় পাও কি কর?

মুরলী—কি করি? পাপাত্মার পাপের প্রতিফল দিই।

মাধুরী এ কথোপকথন শুনিতে পাইল। তাহার ধারণার সত্যের বিষয় তাহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। আমার এই সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাকে ডাকাতের হস্তে দিয়া নারকী অধর্ম্মী আবার পিতার প্রাণ নাশ করিতে চায়। এখন কি মতলবে এখানেই বা আসিতেছে। কি করিব? জলে লাফাইয়া পড়িব? ওঃ বাবারে! বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বিজনবিহারী নৌকায় উঠিল; দাসীকে ডাকিয়া বলিল, শ্যামা তোর মাঠাকুরাণীকে অপর কামরায় যাইতে বল্। অনুপমা সাহসে বুক বাঁধিয়াছিল, সে নড়িল না, ভাবিল, স্বামী চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন সেও ভাল, তবু তাঁহাকে অসহায়া মূর্চ্ছিতা বালিকার গাত্রস্পর্শ করিতে দিব না।

উভয়ে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মুরলীকে দেখিয়া লজ্জায় জড় সড় হইয়া অনুপমা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিল। কিন্তু সে তথা হইতে সরিতে পারিল না। সৎকার্য্য করিতে আবার লজ্জা কি?

বজরার কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া বিজনবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, মুরলী চিনিতে পার?

একটি বহুমূল্য সুবর্ণ বাতিদানে একটি আলোক জলিতেছিল; তাহার দ্বারা মাধুরীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া যুবক স্তম্ভিত হইল। বিস্ময়ে ভয়ে রহস্যে তাহার মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া আসিতেছিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, মাধুরি! মাধুরী নিমেষের জন্য চক্ষু খুলিল, আবার চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অভাগিনীর দন্তের পেষণ শব্দ নিস্তব্ধ বজরার প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। অনুপমা বিস্মিত ভীত যুবককে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল, এ যুবাই বা কে? ইহাকে ত পূর্ব্বে দেখি নাই? এ ব্যাপারে রহস্য আছে দেখিতেছি।

বিজনবিহারী বলিল—কেমন, বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা চরিতার্থ হইল ত? যাজনপুরের কালী জাগ্রত। তাঁহার অর্চ্চনা বৃথা হয় না।

মুরলী বলিল—বৈরনির্য্যাতন? কেন কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

বিজন। কেন, এ বালিকা কাহার কন্যা?

মুরলী। ধনপতিসিংহের।

বিজন। ধনপতি তোমার শত্রু না? তাহার দুঃখে ত তোমার সুখ।

কি, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে যে? তাহার কন্যাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছি। মাধুরী আমার বিলাস-ভবনে রক্ষিতা হইবে। কায়স্থের কন্যা না হইলে অমন কন্যাকে বিবাহও করিতে পারিতাম। পিশাচ হাসিতে লাগিল। অনুপমার হৃদপিণ্ড সূচিকাবিদ্ধ হইল। মুরলী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ভদ্রব্যবহারী মিষ্টভাষী অথচ পিশাচস্বভাব বিজনবিহারী কে?

(৬)

ললিত বলিল, কি করিব মা? তাহার মাতা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। এক পার্শ্বে বিবর্ণা মাধবী স্থির হইয়া স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট বদনখানি নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার সরল মস্তিষ্কে এ সকল কথা প্রবেশ লাভ করে নাই।

ললিতের মাতা বলিল, অগত্যা তাহাই করিতে হইবে। কাজীর হুকুম অমান্য করিবার নহে। চল সকলে মিলিয়া তোমার শ্বশুরগৃহে গিয়া বাস করি। বৃদ্ধ বয়সে এ লাঞ্ছনা অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত?

যখন ধনপতির প্রথম শোকের স্রোতটা কমিয়া গেল তখন তাহার প্রাণে প্রতিহিংসা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি আসিয়া জুটিল। যে শোক গভীর, যে শোক মোহজ তাহা মানবের মনকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, সে শোকের প্রভাবে মনুষ্য নিস্তব্ধ নিষ্কর্ম্ম হইয়া যায়। কিন্তু রাজসিক শোক অন্য প্রকার। সে শোকগ্রস্ত হইলে মানব মনের অগ্নিশিখা অপরের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিতে চেষ্টা করে। ইহাতে মনের গতি অপরদিকে চলিয়া যায়, তাহাতে কিঞ্চিৎ বেদনার ক্ষণিক লাঘব হয়। বিষয়ী ধনপতিসিংহের শোকটা এই শেষোক্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাই সে কাজীর নিকট নালিস করিয়া তাহার ঋণের জন্য ললিতমোহন ও তাহার মাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার দখল লইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

ললিতমোহনের শ্বশুর শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু উদ্যমপুরের নিকটবর্ত্তী মহেশ নগরের বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ঋণমুক্ত করিয়া জামাতাকে ধনপতিসিংহের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু মর্য্যাদার দায়ে ললিতমোহন কখনই শ্বশুরের নিকট হইতে কোনও রূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। শিবেন্দ্র বসুও বুঝিতেন উপযাচক

হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে যাইলে তাহার ও তাহার মাতার অমান্য করা হইবে। তিনি অপ্রত্যক্ষ ভাবে থাকিয়া যাহা সম্ভব তাহা করিতেন।

কিন্তু ললিতমোহন যখন দেখিল তাহাদের লাঞ্ছনার চরম দশা উপস্থিত হইল, যখন তাহারা পিতৃভবন হইতে বিতাড়িত হইল, তখন আর গত্যন্তর না দেখিয়া সকলে মহেশনগরে যাইতে প্রস্তুত হইল। ললিত ভাবিল, দুই এক দিবস তথায় অবস্থান করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে ঋণ স্বরূপ অর্থ লইয়া ধনপতির হস্ত হইতে বাটী উদ্ধার করিব তাহার পর নদীয়ায় হউক বা মুর্শিদাবাদে হউক, কার্য্য করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। সুতরাং তাহারা সদলবলে মহেশপুরে যাত্রা করিল।

ধনপতিসিংহ কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। সে উদ্যমপুরের কোতোয়ালের নিকট মুরলীমোহনের নামে কন্যাচুরি অপবাদে অভিযোগ করিল। কোতোয়াল সাহেব বিচক্ষণ ব্যক্তি, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত মুরলীর পিতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য ব্যতিরেকে আমি এ অভিযোগ লইতে পারি না। হতাশ হইয়া ধনপতি নবদ্বীপে ফৌজদার ইশালউল্লা মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি বলিলেন আসামীর অবর্ত্তমানে এবং বিশেষ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া সিংহমহাশয়কে ক্ষোভে, ঘৃণায়, ক্রোধে দগ্ধ হইয়া আপন হৃদয়ের বহ্নির ধূমশিখায় নিশ্বাসরোধ হইয়া মরিবার উপক্রম করিতে হইল।

এই ঘটনার দুই চারি দিবস পরে এক দিন এক দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল নবদ্বীপে একটি স্থানে একটি যুবক ও একটি বালিকা বাস করিতেছে। তাহাদের ব্যবহার বড়ই সন্দেহজনক, কিন্তু দূত তাহাদের স্বচক্ষে দর্শন করে নাই, লোকমুখে তাহাদের বর্ণনা শুনিয়া আসিয়াছে মাত্র। ধনপতি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন এ সংবাদ নিশ্চয় শুভ এবং তাহার কুটিল হৃদয় স্নেহের কন্যাকে দেখিতে পাইবার আমোদে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

ফৌজদারের লোক গিয়া নবদ্বীপের সে বাটীটি পরিবেষ্টন করিল কিন্তু তথাপি ভিতর হইতে কেহ দ্বার খুলিল না। শেষে রুদ্ধ কবাট ভাঙ্গিয়া

সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এ আর্ত্তনাদ কিসের। তাঁহাদের উপরে উঠিতে দেখিয়া একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"আস্তে—আস্তে! এখনও জীবন আছে। তোমরা কে?" বালিকা আবার ছুটিয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল।

সকলে আগ্রহ সহকারে গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তাহারা যাহা দেখিল তাহাতে সকলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ধনপতিসিংহ আপশোস করিতে লাগিল, বাতুলের কথা শুনিয়া কেন এস্থলে আসিয়াছিলাম। একটি শয্যার উপর বর্ষীয়সী একটি রমণী শায়িত, তাঁহার মস্তক একটি রোরুদ্যমান যুবকের ক্রোড়ে স্থাপিত। আর রমণীর পদতলে পড়িয়া সেই দ্বাদশ বর্ষীয়া রমণীটি ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। যুবক বলিল, মা জন্মের মত চলিলে! আমাদের আর কে রহিল মা!

রমণী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, তোমার দাদা গৌরাঙ্গ তাহাকে ক্ষমা করিবেন, আমার এসময়েও একবার আসিতে পারিল না। তোমাদের যা সম্পত্তি আছে রাজার হালে থাকিতে পারিবে কিন্তু বিপিন তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, ধর্ম্মে মতি রাখিও।

ক্রমশঃ।

রাঠোর বালক।

ষষ্ঠ সর্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রক্তসিক্ত রণভূমি প্রতিচ্ছায়া হৃদে
যবে উষা উদিলেন উদয় অচলে—
ভীমগড় দুর্গমধ্যে মহা সমারোহ
দুই শত রাজপুত ত্যজিয়া শয়ন
পরিধানে পট্টবস্ত্র, স্নাত সচন্দন—
শিবাণী মন্দিরনিম্নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে

সাজাইছে কাষ্ঠরাশি অগণন চিতা
জ্বলিতেছে ধূপ ধুনা সৌগন্ধি ইন্ধন—
সুশীতল সমীরণে প্রদোষ সময়
বামাকণ্ঠে শক্তিগান হতেছে উত্থিত।

নিঃশব্দে সৈনিকগণ সাজাইল চিতা—
নিঃশব্দে করিল তাহে অগ্নি সংযোজন;
তারপর শ্রেণীবদ্ধ দেবীর সম্মুখে—
ভূমিতলে নতদৃষ্টি—দণ্ডাইল সবে
প্রসারিয়া হুতাসন ক্ষুদ্র কলেবর
সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধীরে করিল ধারণ;
চন্দনসিংহের মাতা দেবীসিংহনারী—
সীমান্তে সিন্দুর তার এলাইত বেণী
যেন হায় মূর্ত্তিমতী স্বদেশ গরিমা—
বামাদলে সম্বোধিয়া কহিলা তখন;—

"ভগ্নিগণ! বীরকুলে সার্থক জনম
সার্থক জীবন এবে আমা সবাকার
দেশ তরে ধর্ম্ম তরে এ নশ্বর দেহ
দিব লো আহুতি মোরা। পতি, পুত্র, সুত
সেই দেশে কেহ রাজা কেহ বা সামন্ত—
ন্যায়বান, সুধার্ম্মিক, কাটাইল কাল
মোরা সবে গরিয়সী মাতা, জায়া, সুতা
সেই পুণ্য জন্মভূমি যবন শাসনে
বিখণ্ডিত জর্জ্জরিত দেখিবার তরে

বল, ভগ্নি বল, মোরা থাকিব বাঁচিয়া?
হয়ত যবন রাজা করুণা করিয়া
কাহাকেও দিবে স্থান অন্তঃপুরে তার
সামন্ত মহিলা কোন নেহারি অপাঙ্গে

বলিবে সাদরে তারে করিতে ব্যজন
কিংবা বেগমদল হাসিয়া হাসিয়া
বিনাইতে কেশ পাশ অনুজ্ঞা করিবে
রচিতে বলিবে শয্যা—গ্রন্থিতে কুসুম—
বহিবারে পানপাত্র সেবিতে চরণ—
এই সব মহৈশ্বর্য্য ভুঞ্জিবার তরে

বল ভগ্নি বল তোরা থাকিবি বাঁচিয়া?
রাজপুত নারীধর্ম্ম ভুলিব কি হায়!
সেই পুণ্য রাজস্থানে অনেক মহিলা
নহে রাণী, দুর্গেশ্বরী, সামন্ত রমণী—
নীচকুলে জন্ম তাঁর—রাজপুত্র ধাত্রী
মিবারের সিংহাসন—রাণাবংশ তরে—
আপনার হৃদ্পিণ্ড করিল ছেদন
রক্ষিল রাণার পুত্রে। নিজ তনয়েরে
নির্ব্বিকারে দিল বলি ঘাতকের করে—
সেই নীতি, স্বামীধর্ম্ম, নিষ্কলঙ্ক শশী—
প্রাণভয়ে আজি কিলো হবে কলঙ্কিত?

তদপেক্ষা হের রুদ্র দেব বৈশ্বানর
দিগ্বিদিকে সমুজ্জ্বল সহস্র শিখায়—
হিন্দুনারী ধর্ম্মরক্ষী, পতিত পাবন—
মহার্ণবে যেন হায় অকূলের ভেলা—
অই তপ্ত বহ্নিশয্যা—মোদের আশ্রয়
নির্ব্বাপিবে সব জ্বালা হৃদয় যাতনা"।
এত কহি সীমন্তিনী নারীবৃন্দ সহ
চিতামূলে অগ্রসর হইলেন ধীরে—
হস্তে বক্ষ দৃঢ় রোধি তখন চন্দন
মাতার চরণ পদ্মে করিল প্রণাম।

একবার বক্ষে ধরি চুম্বিয়া বদন
ভগ্নস্বরে তনয়েরে কহিলেন মাতা।
"আবার হইবে দেখা আমা সবাকার
দুই দণ্ড পরে পুত্র মিলিব আবার"
পতি পিতা ভ্রাতা সুত আপনার জনে
পঞ্চশত পুরনারী দেখিল বারেক—
কি যে আকুল দৃষ্টি কত বিহ্বলতা
এক বিন্দু নেত্রজলে কত না কাহিনী
নিঃশব্দে হেরিল সব রাঠোর সৈনিক—
মাতা, জায়া, ভগ্নি, সুতা—পড়িল অনলে।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমাচরণ ধর।

বাঙ্গালার প্রাচীন-পুঁথি-উদ্ধার।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' কল্যাণে এখন বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে বিস্তর প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বর্ত্তমান থাকিয়া অনাদরে ও কাল-প্রভাবে নষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই সে দিন মাত্র প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে উহার কত বিভবই যে আমরা আলস্যবশতঃ হারাইয়া ফেলিয়াছি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য বিরাট-কলেবর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যতগুলি পুঁথি বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, আবিষ্কৃত গ্রন্থরাজি তাহার সঙ্গে আদৌ তুলিত হইতেই পারে কি না সন্দেহ। বঙ্গের সর্ব্বত্র এখন প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণার হল চালিত হয় নাই। এখনো দেশমধ্যে অসংখ্য পুঁথি

লোক-লোচনের অগোচরে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বভুক্ কাল ও কীটরাজির আহার যোগাইতেছে! সে সমস্ত সংগ্রহের জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ-রূপে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক্ উদ্ধার না হইলে আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস যে অপূর্ণাঙ্গ থাকিবে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

কেবল পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, তাহা নহে; কিন্তু তৎসমস্তকে মুদ্রা-যন্ত্র-প্রভাবে স্থায়ীও করা চাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বৃহৎ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশের ভারগ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বিষয়ে 'সাহিত্য-সভার'ও কতকটা কার্য্য-কারিতা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, কেহ কেহ ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অল্প স্বল্প প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত আছেন। কিন্তু আবিষ্কৃত গ্রন্থরাজির তুলনায় এসকল উদ্যোগ আয়োজন নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান নিয়মে প্রকাশ, কার্য্য চলিতে থাকিলে কেবল আবিষ্কৃত গ্রন্থ-রাজি প্রকাশিত হইতেও অর্দ্ধ শতাব্দীর কমে কুলাইবে না! আমরা তৎকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও যমরাজ যে কিছুতেই স্বকার্য্য-সাধনে নিরস্ত থাকিবার নহেন! বিশেষতঃ অনেকগুলি পুঁথির অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাহাদের কোনরূপ আশু প্রতীকার না করিলেই নয়। সুতরাং উপায়ান্তর গ্রহণ না করিলে আমাদের এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারিবে না, নিশ্চয়। এস্থলে আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে সকল দিকই একরূপ রক্ষা করা যাইতে পারে, পরিদৃষ্ট হইবে।

বাঙ্গালায় এখন অসংখ্য মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল পত্রিকায় সহজেই প্রাচীন পুঁথিগুলির প্রকাশ হইতে পারে। প্রাচীন-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদির পাঠক ও লেখকও এখন নিতান্ত কম নহেন; সুতরাং উক্তরূপ প্রবন্ধরাজির বিশেষ অভাব হইবে না এবং তদ্রূপ প্রবন্ধাদি পত্রিকায় স্থান দিলে তাহাতে পত্রিকার কোন গুরুতর ক্ষতিরও সম্ভাবনা নাই। 'পরিষৎ' প্রভৃতি সভা বৃহৎ গ্রন্থগুলির প্রকাশ করিতে থাকুন, আর মাসিক পত্রিকাগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি প্রকাশিত হউক। আমা-দের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার হইতে

বেশী দিনের প্রয়োজন হইবে না। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়গণ আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইবেন না।

এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, যাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য নহে; অথচ সেগুলির প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে যিনি কেবল কাব্যাদির সৌন্দর্য্যানুসন্ধান করতঃ কাব্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার শ্রম অনেক স্থলেই পণ্ডশ্রম হইবে। প্রাচীন যে কোন কাব্য বা কবিতাই প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে, ভাষার উপকরণ আসিবে কোথা হইতে? এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আমরা অদ্য 'অর্চ্চনা'র কলেবরে একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়াছি।

পুঁথিখানির নাম 'শনির পাঁচালী'। উহাতে শনৈশ্চরের পূজা মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমরা নানা কবির নানা গ্রন্থ দেখিয়াছি, কিন্তু সকল গ্রন্থেরই মূল উপাখ্যান একই রূপ; নাম ও ভাষাভেদেই গ্রন্থের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় মাত্র। বাঙ্গালী প্রাচীন কবিগণ স্বাধীন পথে বিচরণ করিতে বড়ই ভয় করিতেন। তাই দেখা যায়, সকলেই গড্ডলিকা প্রবাহের মত একের পর একে একই গল্পের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে করিতে শেষে অস্থি-সার করিয়া তুলিয়াছেন। পরাধীন জাতির ইহা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। সুতরাং তাঁহাদিগকে দোষ দিয়া ফল নাই।

ইহার রচয়িতার নাম দ্বিজ রামদয়াল। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কোন পরিচয়ই পাইতে পারি নাই। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে কবিকে অন্ততঃ চট্টগ্রামবাসী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রন্থে হস্তলিপির তারিখ বা পুঁথির রচনা-কাল উল্লেখিত না থাকায় আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পাণ্ডুলিপিখানি প্রায় ৪০।৫০ বৎসরের প্রাচীন।

গ্রন্থের রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। রচনা সাধারণতঃ অনাড়ম্বর ও সরল। সেকালের অনেক কবিই এরূপ প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। যে রূপেই হউক, পুঁথিখানি যে রক্ষণ-যোগ্য, বোধ করি, সে বিষয়ে কেহ অন্যমত হইবেন না।

একাধিক পাণ্ডুলিপির সহায়তা ব্যতীত এরূপ প্রাচীন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। এই গ্রন্থেও তজ্জন্য কিছু কিছু প্রমাদ রহিয়া গেল। প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণ-বিন্যাস শোধন করা অনুচিত বোধে আমরা ইহার অনেক স্থলেই মূলের অনুযায়ী বানান বাহাল রাখিয়াছি। পুঁথিখানি এই:—

৺নমো গণেশায়।

অথ শণির পাচালিঃ বন্দনাঃঃ ত্রিপদীঃ ॥

সিদ্ধিপদ গণরায়, প্রণাম তোমার পায়,
ব্রহ্মময় বিভু সনাতন
সৃজন পালন হত, তোমার কটাক্ষ গত,
তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন ॥
হয়ে পঞ্চ মূর্ত্তি ধর, ব্রহ্মা বিষ্ণু দিবাকর,
দুর্গা শিব গণেশ আপনে।
শিবের সন্তান ছলে, দুর্গারে জননী বলে,
কত খেলা খেলহ ভুবনে ॥
বন্দ দেব নারায়ণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
সরস্বতী কমললোচনী।
কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান, শণির পাচালি গান,
গাইবারে বাসনা জননি ॥
শ্রীরামদয়াল দ্বিজে, গুরুপদ সরসিজে,
প্রণমিয়া গাইল বন্দনা।
কৃপা করি ভগবান, রাখ এ দাসের মান,
পূর্ণ কর দাসের কামনা ॥ ৪

নবগ্রহের স্তব।

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং
সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং॥ ১
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবং,
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণং॥ ২
ধরণিগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভং,
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥ ৩
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা শ্যামং রূপেনা প্রতিমং বুধং,
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥ ৪
দেবতানামৃষিণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং,
বন্দে ভক্ত্যা ত্রিলোকেশং ত্বং নমামি বৃহস্পতিং॥ ৫
হিম-কুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥ ৬
নীলাঞ্জনচয়প্রক্ষং রবিসুতং মহাগ্রহং
ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥ ৭
অর্দ্ধকায়াং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকং
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং ত্বং রাহুং প্রণমাম্যহং॥ ৮
পলাল ধূমসঙ্কাশং তারা গ্রহ বিমর্দ্দকং
রুদ্রং রৌদ্রাত্মজং ক্রূরং ত্বং কেতুং প্রণমাম্যহং॥ ৯

পয়ার।

শ্রীগুরু গোবিন্দ পদ (পদে) স্থির রাখি মন।
শণির পাচালী কথা শুন সর্ব্বজন॥

ত্রিপদী।

শুন সর্ব্ব জন, (কহি?) পূর্ব্ব বিবরণ,
নামে ছিল সুশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ?)।

দ্বিজ এক জন. দুঃখী সর্ব্বক্ষণ,
(করে ?) সদা ভিক্ষা উপাসনা ॥ ১৫
একদিন তায়, ভিক্ষা মাঙ্গি পায়,
নগরীর ঘরে ঘরে।
কি করিবে হায়, ভাবে অনুপায়,
চলেছেন (ধীরে ধীরে ?) ॥
রাজা সিংহজিত, কাছে উপনীত,
আশীর্ব্বাদ করি করে।
ওহে মহীপতি, মর্ম্ম যে দুর্গতি,
কহিতে না বাণী সরে ॥
স্বপত্নী সহিত, আহার ব্যতীত,
দেহত্যাগী হ'তে হয়।
তেই* উপনীত, করিতে উচিত,
ভিক্ষাদান মহাশয় ॥
শ্রীরামদয়ালে, হরি পদতলে,
কহে করিয়া মিনতি।
কি দোষে নিদয়, হও সদয়,
দীন হীন দ্বিজ প্রতি ॥

পয়ার।

ব্রাহ্মণের দুঃখ শুনি দয়া উপজিল।
ভিক্ষা (দান করিয়া যে) † নৃপতি কহিল ॥ ২০
শুন করি নিবেদন বিপ্র মহামতি।
আমার বালকদ্বয়ে পড়াও সংপ্রতি ॥
নিত্য ভিক্ষা দূর করি বিত্ত করি দিব।
তণ্ডুলাদি সর্ব্ব দ্রব্য প্রত্যহ জোগাব ॥

* তেই—তাই। † মূলে 'দানে করো' আছে।

বিদ্যাশিক্ষা দেহ প্রভু হরে দুঃখ দূর।
সত্বর করিয়া দিব ঐশ্বর্য্য প্রচুর॥
রাজাজ্ঞায় পুলকিত হৈয়া দ্বিজবর।
শিশু শিক্ষা দিয়া তবে চলে নিজ ঘর॥
শণির অদ্ভুত কার্য্য বুঝে সাধ্য কার।
অর্দ্ধাংশ তণ্ডুল হরি লইল ভিক্ষার॥ ২৫
নিজ বাসে গিয়ে বিপ্র দেখয়ে ঝুলিতে।
অর্দ্ধ পরিমাণ দ্রব্য আছয়ে সাক্ষাতে॥
কি হইল কে হরিল ভাবেন উপায়।
শণির কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে না পায়॥
এরূপে প্রত্যহ দ্বিজ বিদ্যালয় হইতে।
আসিবার কালে দ্রব্য হরয় শণিতে॥
আর দিন পাঠশালা হইতে ব্রাহ্মণ।
নিজ বাসে ধীরে ধীরে করিছে গমন॥
হেনকালে রাজপথে দেখে আচম্বিত।
ছদ্ম শিশু বেশে শণি হইল উপনীত॥ ৩০
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শণি করপুটে কয়।
বিদ্যা-আশী বটী, পাঠ দেহ মহাশয়॥
অদ্যাবধি নিত্য প্রভো, বিদ্যা দেহ দান।
পাঠান্তে দক্ষিণা দিয়া নিব তব নাম॥
শুনিয়া শণির বাক্য পুলকিত মনে।
পাঠ দান দিয়া চলে আপন ভবনে॥
স্বল্প দিন মধ্যেতে বিদ্যায় হইয়া বিভূষিত।
দক্ষিণা দিতে (শণি ?) হইল উপনীত॥
ব্রাহ্মণে বলেন শণি কিবা বর চাহ।
শীঘ্র করি লহ বিপ্র আমি যাব গৃহে (গেহ ?)॥ ৩৫
শণির কথায় বিপ্র মনে মনে ভাবে।
* * *॥

গুরুকে দক্ষিণা দিবে তাতে দেয় বর।
অবশ্য মনুষ্য নহে দেব কি কিন্নর॥
এত ভাবি পরিচয় জিজ্ঞাসে তাহাকে।
দেব কি গন্ধর্ব্ব সত্য বলহ আমাকে॥
শিশু বলে আমি বটি সূর্য্যের নন্দন।
শ্রীশণি আমার নাম বিখ্যাত ভুবনে॥
পরমর্থ ধন বিপ্র সাক্ষাতে দেখিআ।
স্তুতি স্তব করে কাতর হইয়া॥ ৪০
আর কত ভোগ বল আমার উপর।
শণি বলে আর সাড়ে সাত বৎসর॥
বিপ্র বলে মহাশয় কোপভোগ ছাড়ি।
বর দেহ ধনে পুত্রে সুখ ভোগ করি॥
শণি বলে সাড়ে সাত বৎসর মধ্যেতে।
সাড়ে সাত দিন ভোগ করিব তোমাতে॥
অদ্যাবধি সপ্তাহ রহিবে সাবধান।
সর্ব্বদা করিবে মম নাম গুণগান॥
ভক্তিভাবে শণিবারে আমারে পুজিবে।
তবে ধন পুত্র হবে মম কোপ যাবে॥ ৪৫

ক্রমশঃ

আবদুল করিম।

কবিতা-কুঞ্জ।

আবাহন।

এসগো দেবতা এসগো!
তুমি বহুদিন পরে আসিয়াছ ঘরে
বহু আয়াসের তুমি গো!
হৃদয়-মন্দির দেবতা বিহীন—
শুধু আশালতা অতীব মলিন—
পলকে পলকে ক্ষীণ প্রতিদিন—
শুষ্ক হিমানী শিশিরে।
বেজেছিল শুধু বাঁশী সুমঙ্গল—
ফুটেছিল স্মৃতি অতি সমুজ্জ্বল
—জুড়িয়া কেবল হৃদয় কমল—
মুছে নাই আঁখি নীরে।
সারাটা জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
তুলিয়াছি ফুল আঁচল ভরিয়া
গাঁথিয়াছি মালা পুজিব বলিয়া
কত না যতন করে—
পরাণের সাধ মিটা'ব আজিকে
ছাড়িয়া যেওনা আঁখির পলকে
এসহে বারেক দেখি অনিমিখে
মূর্ত্তি উজল, তিমিরে—
এস গো দেবতা এস গো।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

কমলে কামিনী।

এ কি ঘোর ভূমিকম্প-বাসুকির দোষে
থর থর করি ধরা কাঁপিলেন রোষে
পড়ি গেল ঘর মোর গেল আটচালা
সবে বলে প্রাণ নিয়ে পালা পালা পালা।
সরসীর ধারে আমি গালে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িনু আমি হইয়া অবাক,
নরনারী চারিধারে উঠে চীৎকারিয়া
অলক্ষ্মী বাজায় যেন অমঙ্গল শাঁক।
সহসা সরসী জলে কাঁপিল মৃণাল
হেরিনু কমলদলে কমলেকামিনী
হাসিয়া কহিলা মাতা আমি মহাকাল,
ভূতধাত্রী আমি পুনঃ লক্ষ্মী স্বরূপিণী
কি ভয় কর্ম্মের ক্ষয় হয়েছে বাছনি,
হৃদিপদ্মে রব এবে কমলে কামিনী।

উমাশশী।

কি ভীষণ বিভীষিকা হৃদয় বিদারি
বহিল আশ্বিনে ঝড় মাথার উপর
পড়ে গেল ঝঞ্ঝাবাতে বাড়ী আর ঘর
মুহূর্ত্তে হইনু আমি পথের ভিখারী।
পথমাঝে একপ্রান্তে মাথে হাত দিয়া
অবাক স্তম্ভিত আমি অর্দ্ধ অচেতন—
কতক্ষণে স্বপ্নে যেন করিনু শ্রবণ
ডাক্ সেই অভয়ারে সে নয় নিদয়া।
তখন তন্ময় হয়ে আকুল আহ্বানে
ডাকিলাম আয় মা গো আয় মুক্তকেশি।
সন্তানের একি দশা করিলি রাক্ষসি!
বুকে বাজিয়াছে শেল বাঁচিনা পরাণে
হাসি হাসি উমাশশী আসিয়া তখন
এলোকেশে মুছাইয়া দিলা দুনয়ন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

আত্ম প্রতিষ্ঠায়।

কই কোথা প্রতিদান প্রেমের আমার ?
ভাবিলাম জপিলাম এত নিশিদিন—
হে নির্ম্মম! হে নিষ্ঠুর! তুমি নির্ব্বিকার–
দূরে দূরে রহিলে গো দয়ামায়া হীন ?
আকাঙ্ক্ষা প্রবল বন্যা ভাঙ্গিল হৃদয়
এত সাধ এত আশা বৃথায় বৃথায়—
হৃদয়ের এ অনল, তুষানল সম
পোড়াইল ধিকি ধিকি সারাটা জীবন!
কোথা বারি কোথা বারি—কণ্ঠে তৃষা মম
অতৃপ্ত রহিয়া গেল হইল মরণ
এই প্রেম? এই লাভ? কোথা শান্তি তৃপ্তি—
কোথায় বসন্ত চির অমরার দীপ্তি ?
এ যে শত জনমের পাপ প্রতিফল
এ যে ব্যর্থ সাধনার—সাধন বিফল।

আত্ম বিসর্জ্জনে।

কি সে অমিয়স্রোত মন্দাকিনী ধার
স্বর্গীয় প্রসূনদামে সুবাস সম্ভার।
যবে দেব প্রাণনাথ হৃদাসনে বসি
লহ গো আমার পূজা শ্রীমুখে সুহাসি।
হে বাঞ্ছিত প্রিয়তম তোমার মুরতি
মধুর মোহন কান্ত প্রাণবিমোহন।
কি আনন্দে ভূমানন্দে আরাধ্য আরতি
চরণে অঞ্জলি নাথ সার্থক সাধন।
সেই সুখে সেই স্রোতে আমি আত্মহারা
নিরখি নিরখি মুগ্ধ পাগলের পারা।
কেবলি অন্তরে রাজে মুরতি তোমার
তব প্রেম তব দয়া করুণা অপার।
ভুঞ্জি শত জনমের তপস্যার ফল
ধরায় বৈকুণ্ঠ ধাম সাধনা সফল।

শ্রীউমাচরণ ধর।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সরযুবালা বা অপূর্ব্ব মিলন—গার্হস্থ্য উপন্যাস—শ্রীমতী ক্ষেত্রবালা দেবী প্রণীত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। লেখিকা নবীনা—সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রথম অবতীর্ণা হইয়াছেন; সংসার চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া সংসার ধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও কোন কোন ভদ্র বঙ্গমহিলাকে যখন আমরা সাহিত্যসেবায় ব্রতী দেখি, তখনই প্রাণে কেমন একটু আশার সঞ্চার হয়, হৃদয় আমোদে আপ্লুত হইয়া উঠে; বর্ত্তমান লেখিকা তাহার দৃষ্টান্ত, সমালোচ্য গ্রন্থখানি তাহার পরিচয়। স্থানে স্থানে গল্পাংশ অসংলগ্ন ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও ভাষার লালিত্যে ও চরিত্র বিকাশে গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। সরযুবালা—গিরিবালা—সুশীলা—অহল্যা—রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি কয়েকটী চরিত্রকে লেখিকা আদর্শ চরিত্ররূপে প্রকটিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। শেষাংশটুকু বড়ই সংক্ষেপ বলিয়া বোধ হইল। পুস্তকের "অপূর্ব্ব মিলন" নাম-

করণ না করিলেই ভাল হইত, কারণ তাহাতে পুস্তক-পাঠের কৌতুকাবেগ প্রশমিত করিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা ছবি কতকটা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

স্থানে স্থানে দুই একটী ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলেও কালে তিনি সুলেখিকা হইবেন আমাদের এরূপ ভরসা আছে। নবীনা লেখিকা সংসার ধর্ম্ম করিতে করিতে সাহিত্য সেবায় নিরত থাকুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রকৃতি—আশ্বিন, ১৩১১। "ঐন্দ্রিলা"—হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে বর্ণিত বৃত্ররাজ মহিষী ঐন্দ্রিলার চরিত্র বিশ্লেষণ। চরিত্র বিশ্লেষণ ভালই হইয়াছে। "ইংরাজ প্রতিভা"—ইহা ইংরাজজাতির মহিমা বর্ণনা। লেখকের মতে "আত্মপ্রশংসা মৃত্যুতুল্য" সুতরাং তিনি "আমাদের ধর্ম্ম, পুরাণ, সাহিত্য, বেদ বেদান্ত" প্রভৃতি আলোচনা না করিয়া জন বুলের "জড় শক্তির অভাব" "ধর্ম্মবৃত্তি" "স্বার্থত্যাগ" "সমাজনীতি" "বিবাহনীতি" প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়াছেন। লেখকের বিচারশক্তি যেরূপ প্রবল তাহার অনুবাদ করিবার ক্ষমতাও তদ্রূপ। তাঁহার মতে আবার ধর্ম্মবিষয়ে ইংরাজ আমাদের উপদেষ্টা! লেখক আবার বি, এ!!! লেখক কখনও আমাদের "বেদ বেদান্ত" প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের এক পৃষ্ঠাও পাঠ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। প্রকৃতি-সম্পাদক এরূপ প্রবন্ধ অপ্রকাশিত রাখিলেই ভাল করিতেন। "পূর্ণাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ"—ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ; শেষ হইলে শিক্ষাপ্রদ হইবে আশা করা যায়। "বিজয়া"—গল্পটী আদৌ ভাল লাগিল না। "জাহ্নবী" ও "ধূলি" শীর্ষক কবিতা দুইটী বেশ হইয়াছে।

জাহ্নবী—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩১১। এবার নবীনা সহযোগিনীর যুগ্ম সংখ্যা। মহাপূজা—(প্রবন্ধ) সেই একই পুরাতন সুরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। "ঈশোপনিষৎ"—বঙ্গানুবাদ, এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। "ঔরঙ্গজেবের শফর" প্রবন্ধটী সুললিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। "সমাজের ভিত্তি"—প্রবন্ধটী সারগর্ভ, ভাষা প্রাঞ্জল। "জাহ্নবী তীরে"—গল্পটী জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপোপযোগী—পত্রিকায় নহে! "লক্ষৌ ভ্রমণ"—সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের লেখনীপ্রসূত—এই সংখ্যায় বহু আয়াসে তিনি হাবড়া হইতে মধ্যম শ্রেণীতে স্থান পাইয়া গল্প করিতে করিতে বর্দ্ধমান পৌছিলেন, তাহার পর বর্দ্ধমান হইতে হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী ছাড়িল, পরে "ক্রমশঃ"! "ইন্দ্রধনু"—প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই। কবিতার মধ্যে "বিজয়া" "দধীচির অস্থিদান" কবিতা দুইটী আমাদের ভাল লাগিল। "মধ্যাহ্নে সমুদ্র" শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটী কবিতা। তাঁহার ন্যায়

সুলেখিকার লেখনী প্রসূত. এরূপ কবিতা পাঠ করিলে আমাদের দুঃখ হয়! নমুনা স্বরূপ নিম্নে আমরা দুই ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"উভয়ের মাঝে ভেদ— সূক্ষ্ম এক রেখাচ্ছেদ
নীল পেন্সিলের দাগ কে দেছে টানিয়া॥"

পমায় মৌলিকত্ব আছে!

নবনূর—অগ্রহায়ণ ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় "হারুণ-অল-রসিদ্" "ফটোচিত্র" প্রবন্ধ দুইটী বেশ হইয়াছে। "হিন্দু মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব?" অভিধেয় প্রবন্ধটীতে নূতন কথা কিছুই বলা হয় নাই। "কোরাণ শরীফের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধটী সুলিখিত ও গবেষণাপূর্ণ। কবিতাগুচ্ছের দুই একটী কবিতা চলনসই।

শ্রীবৈষ্ণব সন্দর্ভ—কার্ত্তিক ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় "শ্রীগৌরচন্দ্র" "বিবিধ" "প্রীতি—সাধ্য এবং সাধন" "অবতার" "শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত" "প্রেম সহচরী" "কেনোপনিষৎ" এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা শ্রীপত্রিকা পাঠে সুখী হইলাম।

সঙ্গীত প্রকাশিকা—অগ্রহায়ণ ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় রাগরাগিণী চিনিবার উপায় ও আটটী স্বরলিপির সহিত সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীত শাস্ত্র আরও একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইতে পারে।

বীরভূমি—পৌষ ১৩১১। পত্রিকাখানি সুলিখিত প্রবন্ধে পূর্ণ। "সিংহলে ইংরাজ" একটি সুখপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ ঐতিহাসিক তত্ত্ব। "প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা", মৌলভী আবদুল করিমের বঙ্গসাহিত্যের লুপ্ত সম্পদ রক্ষার একটি অন্যতম প্রয়াস। কবি কামরটি আলির একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটী মন্দ হয় নাই। "শাস্ত্র ও সাধনা" এক সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ। "বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক"—বঙ্গভাষার প্রাচীন ও "অধুনামৃত" যাবতীয় গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ নামের তালিকার প্রারম্ভ। অনুষ্ঠান প্রশংসাযোগ্য। লেখক যেন ইহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রণয়ণ করিতে কৃতচেষ্ট হয়েন। বীরভূমির অপর দুইটি প্রবন্ধও সুন্দর হইয়াছে। বীরভূমি পাঠে আমরা প্রীত হইলাম।

ধূমকেতু—পৌষ ১৩১১। এবার ধূমকেতুর কলেবর অনুবাদ ও পুরাতন ইতিহাসের আবৃত্তিতেই পূর্ণ। অপরের সমালোচনায় এত বেশী আগ্রহ না দেখাইয়া সহযোগী নূতন কিছু বলিলে আপনার পাঠকগণকে অধিকতর প্রীত করিতে পারিতেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মাসিক পত্রিকা ও
সমালোচনী।
(সুলভ সংস্করণ।)

প্রথম বর্ষ।] মাঘ ১৩১১। [দ্বাদশ সংখ্যা।

কত দূরে!

কতদূরে কতদূরে তোমার আলয়
বাঞ্ছিত ভবন চির সদা শান্তিময়!
পদে পদে লাগে বাধা
আঁখিতে লেগেছে ধাঁধাঁ
পশ্চাতে প্রবল অরি—ভীষণ দুর্জ্জয়!
কতদূরে কতদূরে অমৃত আলয়!

যুগ যুগান্তর ধরি,
দীর্ঘ পথে অগ্রসরি
চলেছি চরণ আশে—দাওহে আশ্রয়!
ঠেলিয়া ফেলোনা দূরে দীন দয়াময়!
বড় দীন এই পান্থ—
পথ শ্রমে বড় শ্রান্ত—
দাওহে চরণ প্রান্ত—আশ্বাস, অভয়—
কত দূরে কত দূরে অমৃত আলয়!

জনমে জনমে হায়
আসে কায়া চলে যায়
সাধিতে পারেনা কর্ম্ম— শুধু দিনক্ষয়
— যায় প্রাণ—যায় জন্ম—বৃথায় বৃথায়!
একস্বরে হাহাকার
আর সেই অশ্রুধার
নিতি উঠে মিশে যায় মরুভূমি মাঝে—
পুনঃ আসে পরজন্ম
পুনঃ ভুলে যাই কর্ম্ম
লাগেনা এ ক্ষুদ্র হৃদি তোমারই কাজে—
পূর্ব্বরীতি অনুসারে
এবারে (ও) কি যাব ফিরে
রবে দূরে তব মূর্ত্তি জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময়!

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

দ্বন্দ্ব ও জীবন।

ইংরাজ কবি গাহিয়াছিলেন—

From harmony, from heavenly harmony
This universal frame began.*

একতান, স্বর্গীয় একতান হইতে এ বিশ্বের আকার গঠিত হইয়াছিল। কল্পনার প্রসাদে, কবিত্বশক্তির আশীর্ব্বাদে কবি যাহা দেখিয়াছিলেন, যাহা বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাহা বোধ করিতে পারি কোথা? আমরা উপলব্ধি করি জগতব্যাপী কোলাহল, কেবল দ্বন্দ্ব, কলহ, স্বার্থপরতা, —ইহাতে একটা একতান আছে বা জগতের সকল ধ্বনি একসুর প্রকাশক, একথা শুনিলে যেন একটি বিষম উপহাস বলিয়া বোধ হয়। যদি এ বিশ্বের কোথাও ঐক্যতান শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে বলেন, তাহা দুঃখের একতান, দারুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারের সমস্বর। কিন্তু তাহাও জগৎব্যাপী নহে।

দ্বন্দ্বই জগতের নিয়ম। দ্বন্দ্ব ব্যতীত আগুয়ান হওয়া যায় না। জগৎ গতিশীল। প্রতি পলকে প্রতি নিমিষে জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মহাকবি সেক্ষপীর বলিয়াছিলেন—কেহ দুইবার একই নদীতে স্নাত হয় নাই। তুমিও মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে জগতে অবস্থান করিতেছিলে, যে ব্রহ্মাণ্ডে গতিবিধি করিতেছিলে, যে বিশ্বে লম্ফঝম্প আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিলে, এখনকার বিশ্ব সে বিশ্ব নহে। এক মুহূর্ত্তমধ্যে কত সাধ্বী পতিহারা হইয়া করুণ বিলাপগীতিতে অম্বরপথ ধ্বনিত করিতেছে, পুত্রস্নেহবিধুরা জননীর অঙ্ক শূন্য করিয়া, কত সুকুমার পৃথিবী ত্যজিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? প্রতি মুহূর্ত্তেই জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা লক্ষ্যের দিকে জগৎ ধাবমান হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড মন্দের দিকে ছুটিতেছে কি ইষ্টের দিকে ছুটিতেছে, স্বর্গীয় জ্যোতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রশ্মির দিকে অগ্রসর হইতেছে বা মূঢ়মতি পতঙ্গ সদৃশ নরকের বহ্নি

---

*Dryden. A song for St. Cicilia's Day. গ্রীক দার্শনিক পায়থাগোরসের মতের উপর এই সঙ্গীত স্থাপিত।

লক্ষ্য করিয়া পৃথিবী সেই দিকে ধাবমান হইতেছে তাহা বলা সুকঠিন। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সগদ্গদ ভীতমনা হইয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

যথা নদীনাং বহবম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলান্তি।

যেমন নদীসকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রমুখে ধাবমান হইতেছে তেমনি আপনার দেদীপ্যমান বদনে নরলোক বীর সমূহ প্রবেশ করিতেছে। এই যে প্রবেশ, ইহা মহাপ্রবেশ। জগৎ সেই দিকেই ছুটিতেছে।

যেমন সমগ্র পৃথিবী উন্নতির দিকে ধাবিত তেমনই জীবনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টিত। কর্ম্মই জীবের সাধারণ অবস্থা। পৃথিবী মধ্যে যে দশাতেই জীবন দেখিতে পাই বুঝি তাহা জড়ের মত অসার নিস্পন্দ ও অলস নহে। যেখানেই জীবন, সেইখানেই চেষ্টা, সেথাই উদ্যম। সৃষ্টির যে পদার্থেই জীবনের বহ্নি প্রদীপ্তমান, সেই পদার্থেই একটা প্রয়াস একটা শ্রম পরিলক্ষিত হয়। ইহা সমিধ সংগ্রহের প্রয়াস। এ চেষ্টা সেই পূত বহ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিবার প্রয়াস, জীবনপ্রদীপে ঘৃতদান করিয়া তাহার নির্ব্বাপন রোধ করিবার প্রয়াস।

জীবের যেমন প্রাণধারণ করিবার বৃত্তি ও উদ্যম স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি জীবনের সফলতা ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার বাসনা ও প্রবৃত্তিও চিরকাল সকল অবস্থায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। সকল জীবেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, জীবমাত্রেরই একটা গন্তব্য স্থান আছে। তাহা কি সে কথা জীব ঠিক বুঝে না। কিন্তু সকলেরই প্রাণের ভিতর একটা অজানা বৃত্তি আছে তাহা জীবকে আগুয়ান হইতে প্রবৃত্ত করিতেছে। যে আগুয়ান হইতেছে সে ঠিক বুঝে না কোথায় যাইতে হইবে। কিন্তু গতিরোধও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঘোর তিমিরাবৃত অন্ধকারময় স্থানে পথ হারাইয়া আমরা যেমন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াই, মনের মধ্যে অশান্তি লইয়া নিজের শক্তিগুলাকে কার্য্য করিতে দিবার অবসরের জন্য যেমন হাঁফাইয়া মরি, ভাবি কিসে এমন স্থলে পঁহুছিব যে স্থলে আমার চক্ষু তাহার কার্য্য করিতে

পারিবে তাহার সহায়তায় পদদ্বয় আমার অভিলষিত স্থানে পঁহুছাইয়া দিবে, অপরাপর ইন্দ্রিয় সকল আমার বাসনার অনুরূপ কার্য্য করিয়া আমার ইষ্ট সাধন করিবে। সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৃক্ষ শামুক প্রভৃতি জড়বৎ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য অবধি সকল জীবই তাহাদের অন্তরের বৃত্তির তাড়নায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলেই আপনাআপনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে চেষ্টা করে কিসে তাহার জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইবে, কোন পথে যাইলে সে তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। জীব মাত্রেই এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, জীবন বলিলেই জীবনকে ধারণ করিবার ও তাহার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার উদ্যম বুঝায়। অসীম জগতের অসংখ্য অসংখ্য জীবের এই চেষ্টার ধ্বনিতে যে ব্যোমপথ একসুরে মুখরিত একতানে পূর্ণ তাহা কিরূপে বলিব। এই জীবনরক্ষার্থ যে সকল কার্য্য করিতে হয় তাহা শান্তিময় বা তাহা "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নীতির অনুসরক একথা বিশ্বাসযোগ্য কিরূপে ?

এই যে আদর্শের দিকে ধাবন, এই যে স্বতঃপ্রবৃত্ত উন্নতির প্রয়াস ইহা দ্বন্দ্ব বা সমর ব্যতিরেকে কিরূপে হইতে পারে ? আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদিগের পরিশ্রমের ফলে এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে (Environment) * পরিবেষ্টনীর সাহায্য লইতে পারাই জীবন সংগ্রামের রহস্য। আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে প্রকৃতির বদান্যতায় সকল প্রকার ক্ষেত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। যে শক্তিরই সম্পূর্ণতা বা উন্নতি করিতে চেষ্টা কর, স্বভাবের সাহায্য ব্যতীত তাহা করিতে পারা অসম্ভব। সকল শক্তির বিকাশোপযোগী উপকরণ সকলও প্রকৃতি তাঁহার বক্ষে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। জীবের কার্য্য সেইগুলিকে বাছিয়া লওয়া এবং তাহাদিগকে আপন আয়ত্তাধীন করা। বৃক্ষের পুষ্টির জন্য জল বায়ু ও আলোক একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং ঐ তিন উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিবার বৃত্তি বৃক্ষের মধ্যে স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। যে বৃক্ষ এই তিনের দ্বারা আপন শরীর গঠন করিতে পারিবে সেই বৃক্ষই তাহার জীবন প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিবার অধি-

* "Potentiality within the germ depends for its action upon potentiality operating beyond itself."—Calderwood.

কারী হইবে। যে পাদপ তাহাতে অক্ষম হইবে সে বৃক্ষের জীবনেরও আশা অতি অল্প। সকল বৃক্ষেরই স্বাভাবিক বৃত্তি এক কিন্তু কোন কোন জাতীয় বৃক্ষের কর্ম্মশক্তি অধিক। সুতরাং যখন একস্থানে রোপিত দুইটি তরুর ভিতর একটি তরু অপর পাদপাপেক্ষা জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে অধিক সমর্থ হয় তখন তথাকার সকল জল বায়ু আলোক সেই বৃক্ষটিই অপহরণ করিয়া লয়। অপর তরুও চেষ্টা করে বটে, দুই বৃক্ষে জীবনবহ্নির ইন্ধন আহরণের দ্বন্দ্ব হয় সত্য, কিন্তু যাহার বল অধিক রণে সেই জয়ী, যাহার অস্ত্রচালনা শক্তি অধিক, সমরকালে বিজয়লক্ষ্মী তাহারই আনুকূল্য করে, সুতরাং যে বৃক্ষটি আহার সংগ্রহে অধিক সক্ষম সেই বৃক্ষটিই সমরে বাঁচিয়া যায়, যে বৃক্ষটি অপারক তাহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে তিরোহিত হয়। পৃথিবীতে যত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বৃক্ষজাতি অপেক্ষা নীরিহ জাতি ভূমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু জীবনসংগ্রামেও ইহাদের যাহা কার্য্য তাহা শান্তিময় একথা কে বলিতে পারে?

প্রকৃতির একটি করুণ জীবহিতকর বিধান অনুসারে যে সকল জীব পরস্পরকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করিতে পারে তাহারা একত্রিত হইয়া যায় এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।* কিন্তু এই স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। এক (Environment) ক্ষেত্র বা পরিবেষ্টনী যদি দুই জাতীয় জীবের পক্ষে উপকারী হয় তাহা হইলে এই দুই জাতীয় জীবে আবার এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। তৃণভোজী দুই জাতীয় জীবেই তৃণময় ক্ষেত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে তৎপর। যখন পৃথিবীর অঙ্কটি শস্য শ্যামল থাকিবে তখন এই দুই জাতীয় জীবের সমরের আশঙ্কা অধিক নহে। উভয়েই আপন ইচ্ছা প্রয়োজন মত অবলীলাক্রমে তৃণ ভক্ষণ করিবে রোমন্থন করিবে ও তজ্জাতীয় জন্তু সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবে। তখন সেই জীবের মধ্যে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল। এ অবস্থায় যে সকল শাবক জন্মগ্রহণ করিবে সকলেই ধরিত্রীর দানশীলতার অনুগ্রহে প্রচুর আহার পাইবে। সুতরাং তখনকার

* Darwin প্রভৃতি Evolution অভিব্যক্তিবাদিগণ ইহাকে Natural Selection বলেন।

সময়ে অজয়ী হইলেও কাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না। অধিক বলশালী পশু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শাবক বা অল্প বলশালী পশুগণ ঈষৎ দূরে গিয়া আহার করিবে মাত্র। কিন্তু এরূপ অবস্থা চিরকাল থাকিতে পারে না। পৃথিবীর শস্যোৎপাদিকা শক্তির একটা সীমা আছে, এশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যখন তৃণভোজী জীবের বহুল পরিমাণে জন্ম হইবে তখন অনায়াস-গন্তব্য স্থানের তৃণরাশি ভুক্ত হইয়া যাইবে, জীবনধারণ করিবার বৃত্তির উত্তেজনায় জীবসকলকে অধিক কষ্টগম্য স্থানে তৃণাহারের জন্য ছুটতে হইবে। সকলেই প্রয়াস পাইবে, সকলেই ছুটিবে একটা মহা ঠেলা ঠেলি মারামারি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে। জীবনসংগ্রামের এই অধিক কষ্টসাধ্য বিপজ্জনক অভিযান। কেহ পঁহুছিতে পারিবে কেহ পারিবে না। যাহার ক্ষমতা অধিক, যে জীবের বল অধিক সামর্থ্য অধিক সেই জীব কষ্ট করিয়া তৃণশ্যামল স্থান বাছিয়া লইবে সকলেই সকলকে বঞ্চিত করিয়া আপন উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। সেই সময়ে জীব পরিব্রাজক দিগকে যথাযোগ্য যত্ন করিতে পারিবে না। জীব সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইবে যে যোগ্যতম সেই বাঁচিবে যে অযোগ্য সে তাহার জীবন প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিতে পারিবে না, তাহাকে কালের অনন্ত স্রোতে অসহায়ে তৃণের মত ভাসিয়া যাইতে হইবে। তাহার আর সে দফায় জীবন যাত্রায় অগ্রসর হওয়া হইল না। তাহার তীর্থযাত্রা স্থগিত করিতে হইল।

জীবনসংগ্রামে আবার যে যে অস্ত্রের অধিক আবশ্যক হইবে ব্যবহারের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র বা শরীরের যন্ত্রও উন্নত ও অধিক কর্ম্মশালী হইয়া যায়। যে সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয় না, যে সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ব্যতিরেকেও জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া যায়,সে সকল যন্ত্র অব্যবহৃত হইয়া লোপ পাইয়া যায়। ব্যবহারই উন্নতির সোপান অব্যবহৃত অস্ত্র বহুমূল্য হইলেও কালে তাহার শক্তি লোপ পাইয়া যায়। আবার সাধারণ অস্ত্রকেও ব্যবহার করিতে করিতে তাহার কাটিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহা জগতের নিয়ম, ইহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কেণ্টাকীর (Kentucky) অন্ধকারময় গুহায় যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের দৃষ্টির ব্যবহার নাই বলিয়া তাহাদের চক্ষু চর্ম্মাবৃত হইয়া যায়।

সুতরাং জীবনসংগ্রামে যে যে প্রাণী যোগ্যতম তাহারা শেষ পৃথিবীতে রহিয়া যায়।* অবশ্য যোগ্যতম অর্থে প্রাণধারণে যোগ্যতম, পরিবেষ্টনীর সাহায্য লইতে ও পরিবেষ্টনীকে সাহায্য করিতে যোগ্যতম। কিন্তু এই যোগ্যতম জীবের বাঁচিয়া যাওয়ায় কত অযোগ্য, সমরে অপটু জীবের মরণ হইয়াছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? সমরে যোগ্যতম হইবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীকে কতক শক্তির উন্নতি করিতে হইয়াছে। মৃগ প্রভৃতির দ্রুতগমন ক্ষমতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। ‡ কিন্তু পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় তাহাদের শক্তি কিরূপ ছিল তাহা বলিতে পারা কঠিন। তাহাদের জীবন সংগ্রামের জন্য চলৎশক্তিরই প্রধান আবশ্যক, সুতরাং সহস্র সহস্র বৎসরের দ্বন্দ্বে তাহাদের চলৎশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া † এখন মৃগকুল ক্ষিপ্রগতিতে অদ্বিতীয়। এই গুণটি বিচার করিলে পুরাতন হরিণজাতি অপেক্ষা এখনকার হরিণজাতি উন্নত একথা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের চলৎশক্তি উন্নত করিতে গিয়া কত জীবের জাতি উন্মূল হইয়া গিয়াছে, Darwin, Wallace প্রভৃতি প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কত লুপ্তনাম পশুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের অস্তিত্ব ভূমণ্ডলে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। § এই বধকার্য্য এখনকার যোগ্যতম জীবদিগের দ্বারাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে হইয়াছে। এই বিশাল সমর ক্ষেত্রের ঐ সকল কঙ্কাল আধুনিক জীবদিগের বিজয় চিহ্ন।

যেমন জীবগণের মধ্যে অযোগ্য জাতির ধ্বংশাবশেষ হইতে যোগ্যতর জাতির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যেও জীবনসংগ্রামে অযোগ্য জাতির উচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে জীবনসমরে অধিক নিপুণ জাতির অস্তিত্ব রহিয়া যায়। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই ইহা অবগত। এমন কি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ও মনুষ্য রচিত কার্য্যেও এ নিতির কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। দুইটি

* ইহাকে Survival of the fittest বলে।

‡ তৃণভোজী ও সমাজপ্রিয় (Graminivorous, gregarious) সকল জীবের সাধারণ বৃত্তি, বিপদের সময় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে।

† Law of Heredity. জনকের গুণ পুত্রে পরিলক্ষিত হয়।

§ যথা ডোডো, ম্যামথ, প্রভৃতি।

কারবারের মধ্যে যেটি অধিক দ্বন্দ্বকুশল সেই কারবারই রহিয়া যায় একগ্রামে দুইটি দোকান করিলে যে দোকানের অধিস্বামী অধিক বাণিজ্য কুশল যে তাহার পণ্য দ্রব্য আপন চেষ্টায় বহুআয়াসে অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারে, শেষে তাহারই দোকান রহিয়া যায়।

তাই বলি জগত দ্বন্দ্বময়; জীবন বলিলেই দ্বন্দ্ব বুঝায় পৃথিবীর মধ্যে বাস করিয়া পৃথিবীর জীব হইতে গেলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে দ্বন্দ্ব করিতেই হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবনসংগ্রামে যোগ্যতম বাঁচিয়া যায়। এই যোগ্যতম জীব পার্থিব অর্থে যোগ্যতম, জীবন-প্রদীপে ঘৃত দান করিবার যোগ্যতম। জীবনধারণে যোগ্যতম যে নৈতিক জগতে যোগ্যতম একথা কেহ বলিতে পারে না। জীবনোপায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেই হইবে। কায়িক জীবনের উদ্দেশ্য নৈতিক বা পরমার্থিক জীবন প্রাপ্তহ ওয়া, অথচ কায়িক বা Physical জীবন ধারণ করিতে গেলে পার্থিব দ্বন্দ্ব করিতেই হইবে। সুতরাং এই পার্থিব সংগ্রাম অনিবার্য্য। তাহা করিতেই হইবে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এইগুলিকে মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু কিরূপে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহার শিক্ষাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ও নীতিবিজ্ঞানের শিক্ষা। জাতীয় আদর্শ অনুসারে এই শিক্ষার বিভিন্ন নিয়মাবলী।

আমাদের আদর্শ অনুসারে অস্মদ্দেশে এ সংগ্রামে যে প্রণালীর বিধান আছে তাহার মতে কার্য্য করিলে আমাদের এত কষ্ট থাকিত না বা জীবনসংগ্রামের স্রোতে পড়িয়া আমরাও উচ্ছেদের তীরে আসিয়া দাঁড়াইতাম না। যে দেশে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, আপন প্রিয় শিষ্যকে আপনার অনুগৃহীত জীবকে স্বজন বধস্বরূপ ভীষণ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন সেই দেশের জীব কিরূপে এ তুচ্ছ জীবনসংগ্রাম করিতে পশ্চাদপদ হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন "কর্ম্মং ব্রহ্মোদ্ভবং" তবু আমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া বসিয়া আছি আর অপর জাতি আসিয়া আমাদিগের দুর্গে অনর্গল স্রোতে গুলিবর্ষণ করিতেছে। দ্বন্দ্বই জগতের নিয়ম, দ্বন্দ্ব আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, তবে কেন আমরা

দ্বন্দ্ব করিতে ভীত? অবশ্য পশুর মত কেবল পাশবিক দ্বন্দ্ব করিবার বিধান আমাদের দেশে অজ্ঞাত। নিষ্কাম কর্ম্ম করি, কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া আবশ্যকমত সংগ্রাম করি। তাহা না হইলে যে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব স্বল্পদিন মাত্রই ভূমণ্ডলে থাকিবে, পৃথিবীতে সনাতন ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার লোক-জনও থাকিবে না। মেদিনী পশু বলে পূর্ণ হইবে, জীবনসংগ্রামে অযোগ্য হিন্দুজাতির উচ্ছেদের সহিত নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিবার যোগ্যতম জাতির নরকঙ্কাল লুপ্তনাম উচ্ছেদিত জাতি সমূহের নরকঙ্কালের সহিত একস্তূপে মিশিয়া যাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূজার বিধান বলি আতপ তণ্ডুল।
দুগ্ধ রম্ভা শর্করাদি কর্পূর তাম্বুল॥
তিলের তণ্ডুল গুড়ে করিয়া মিশ্রিত।
আটা আদি সব দ্রব্য সওয়া পরিমিত॥
ধূপ দীপে লৌহাসন নৈবেদ্য রচনা।
পঞ্চবিধ ফল দিয়া করিবে অর্চ্চনা॥
ষোড়শ উপচারে পূজা যে করে আমার।
নীল বস্ত্র লৌহাঙ্গুরী বিধান তাহার॥
সন্ধ্যাকালে পূজা করি দক্ষিণা করিবে।
ভক্তি করি মম গুণ কাহিনী কহিবে॥৫০
নিমন্ত্রণ না করিয়া সবে জানাইবে।
শনি পূজা মম গৃহে এই মাত্র কবে॥
গৃহে নাহি নিবে প্রসাদ বাহিরে খাইবে।
অহঙ্কারে যে না আইসে কোপেতে পড়িবে॥

সাধ্য অনুরূপ যাহা ভক্তির সহিত।
পূজিলে পাইব আমি জানিও নিশ্চিত ॥
ব্রত বলি শণি ঠাকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
তদন্তর দ্বিজের হইল দিব্য জ্ঞান ॥
শণি পূজা মনন করিয়া গুণগান।
নিজ বাসে গিয়া করে পূজার অনুষ্ঠান ॥৫৫
ইতি মধ্যে পত্নী তার অন্তর্ব্বত্নী ছিল।
আসিয়া বিপ্রের পাশে নিবেদিত হইল ॥
রোহিত মৎস্যের মুণ্ড খেতে হইল সাধ।
শীঘ্র আনি পাক করি পাইব প্রসাদ ॥
বিপ্র বলে দুঃখ যাবে শণির আজ্ঞাতে।
তাঁর পূজা নৈলে নিষেধ বাহির হইতে ॥
অতএব নাথ ভার্য্যা মম এই কথা।
দুই দিন পরে মুণ্ড আনিব সর্ব্বথা ॥
পতির বাক্য শুনি পত্নী ক্রোধানলে জ্বলে।
নারীর কপালে সুখ নাহি কোন কালে ॥৬০
গর্ভিনীর কত সাধ খাইতে সাধ হয়।
প্রণমে চাহিতে সাধ বিবাদ উদয় ॥
মর্ম্মী বিনে মর্ম্ম কথা অন্যে নাহি বুঝে।
মর্ম্মিক না হইলে মর্ম্ম মনে মনে মজে ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্রের দয়া উপজিল।
মৎস্য মুণ্ড আনিবারে বাজারে চলিল ॥
শ্রীরামদয়াল বলে পত্নী বাক্য যাবে।
পাছে কিন্তু পদে পদে বিপদ ঘটিবে ॥

একাবলী ছন্দ।

বাজারে বিপ্র হইয়ে উপনীত।
মৎস্যমুণ্ড ক্রয় করিল ত্বরিত ॥৬৫
দেখি ক্রোধানলে জ্বলে শনৈশ্চর।
বিপ্র বেশে যায় রাজার গোচর ॥

যষ্টি করে করি থরে কাঁপিছে।
আশীর্ব্বাদ করি বিনয়ে কহিছে॥
শুন নরপতি তব যে কুমার।
গিয়াছিল কালি মৃগ বধিবার॥
তারে রত্নময় ভূষা দেখিয়া।
লোভে বধে এক বিপ্র আসিয়া॥
বালক মস্তক সত আভরণ।
বস্ত্র বান্ধি নিয়ে করিছে গমন॥৭০
বাজারেতে সেই বিপ্র উপনীত।
আনাইয়ে শীঘ্র কর এ উচিত॥
এত শুনি খেদে কহেন ভূপাল।
বিপ্রে বান্ধি শীঘ্র আনো কোটাল॥
রাজার আদেশে বান্ধিয়া হাতে।
বিপ্রবর আনে সভা সাক্ষাতে॥
রবিসুত বাক্য দেখ অখণ্ড।
মৎস্যমুণ্ড হইল মনুষ্যমুণ্ড॥
পুত্র মুণ্ড বিপ্রবর ঝুলিতে।
দেখিয়া নৃপতি পড়ে ভূমিতে॥৭৫
রাজরাণী আর তার ঘরগণ।
শিরে করাঘাতে করিছে রোদন॥
কোটাল ডাকিয়া কহিছে রাজন।
বনে নিয়ে বিপ্র করহ নিধন॥
আজ্ঞা মাত্র কোটাল বিপ্র লইয়া।
বধিবারে বনে যায় চলিয়া॥
কান্দিয়া ব্রাহ্মণে কোটালে কয়।
আজি রাত্রি প্রাণ রাখ মহাশয়॥
বিপ্রের ক্রন্দনে দয়া হইল।
নিজ বাসে কোটাল নিয়ে রাখিল॥ ৮০

সন্ধ্যাদি করিয়া কোটাল ঘরে।
বিনয়ে শনির স্তবাদি করে॥
শ্রীরাম দয়াল বলে কাতরে।
রাখ প্রভু প্রাণ এ দ্বিজবরে॥

স্তুতি।

ত্বং নমামি দিবাকরনন্দনং। ধুয়া॥
কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ গৃধপক্ষ বাহনং।১
ছায়াগর্ভে সম্ভূতং উর্দ্ধদৃষ্টিনয়নং।২
বামহস্তে ধনুর্দ্ধারি বরাভয় কারণং।
গ্রহরূপী নারায়ণ বিপত্ত্য বারণং ৪
সঙ্কট উদ্ধার করি রক্ষা কর জীবনং॥৫

ত্রিপদী।

কাতর হইয়া দ্বিজে, শনির পদ সরোজে,
কহিতেছে ক্রন্দন করিয়া।
শুন প্রভু গ্রহপতি, তুমি জগতেরই গতি,
রক্ষা কর করুণা করিয়া॥
তুমি মুকুন্দ মুরারি, তুমি চতুর্ভুজধারী,
তুমি প্রভু সংসারের সার।
যাতে তব দয়াবিন্দু, সুখে তারে ভবসিন্ধু,
পদ-তরি দিয়া কর পার॥
তুমি অভক্তের অরি, তুমি মুক্তিদাতা হরি,
তুমি প্রভু দুর্ব্বলের বল।
তুমি কোপ কর যারে, সর্ব্বত্যাগী কর তারে,
সাক্ষী তার নরপতি নল॥
তোমার স্বভাব রীতি, কিছু জানে গণপতি,
মুণ্ডচ্ছেদ করিলে যাহায়।

তব বীর্য্য পরাক্রম, ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন,
কহিতে নাহিক পারাপার॥
ওহে প্রভু দয়াময়, দিয়া দীনে পদাশ্রয়,
পরে কি নির্দয় হইতে হয়।
তোমার চরণ বিনে, গতি নাহি দ্বিজ দীনে,
মম প্রাণ রাখ কৃপাময়॥ ১০
দিয়াছি চরণে ভার, কর এ বিপদুদ্ধার,
ঘরে গিয়া পূজিব চরণ।
শ্রীরাম দয়াল ভণে, দয়া কর দীন হীনে,
পাদপদ্ম লইলুম্ শরণ॥

পয়ার।

দ্বিজের ক্রন্দনে শনির করুণা জন্মিল।
বিপ্রের সদনে আসি দয়া প্রকাশিল॥
স্থির হও বিপ্রবর নাহি কিছু ভয়।
রজনী প্রভাতে মুক্ত জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি শনৈশ্চর অন্তর্দ্ধান হইল।
বিপ্র বেশ ধরি প্রাতে রাজাকে কহিল॥
কোন দুষ্ট লোকে আসি বলিছে তোমারে।
তব পুত্র মৃত্যু হইয়াছে মৃগহারা (?)॥ ১৫
তোমার কুমার আমি কানন ভ্রমণে।
কালি দেখি আছি অদ্য আসিবে এখানে॥
ব্রাহ্মণেতে শনির সপ্তাহ ভোগাতীত।
আচম্বিত রাজপুত্র পুরে উপনীত॥
পুত্র মুখ দেখি রাজা সহাস্য বদনে।
আকাশের চন্দ্র যেন পাইল রাজন॥
মহারাণী সুতমুখ করি নিরক্ষণ।
অবিলম্বে কোলে করি হৃদয়ের ধন॥

সুশোভিত মুখপদ্মে চুম্বন দিয়াছে।
কত কত শত শত নিছনি নিয়েছে॥ ১০০
পুরবাসী সবে আসি আশ্চর্য্য ভাবিছে।
জীবন ত্যজিয়ে প্রাণ কি মতে পাইছে॥
এদিকে ভূপাল কত ভাবিছে উপায়।
ঘটিয়াছে ব্রহ্মবধ পাতকের দায়॥
এই পাপ হতে মুক্ত নাহি কদাচিৎ।
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করণ উচিত॥
এত ভাবি কোটালেরে ডাকাইয়া কয়।
কহ দেখি ব্রহ্মবধ কোন স্থানে হয়॥
কোটালে কহিছে দ্বিজ ক্রন্দন দেখিয়া।
জীবমানে রাখিয়াছি নিজ বাসে নিয়া॥ ১০৫
শুনি রাজা হরসিতে কহে কোটালেরে।
শীঘ্র নিয়ে আইস বিপ্রে আমার সাক্ষাতে
(গোচরে ?)
আজ্ঞামাত্র বিপ্রে আনে রাজার গোচর।
দেখি রাজা প্রণমিয়া কহিছে বিস্তর॥
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ধরি হে চরণ।
সর্ব্ব রক্ষা হেতু কর কৃপাবলোকন॥
বিপ্র বলে রাজা তুমি না করিও ভয়।
শনি কোপে হেন কার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
পূর্ব্ব বিবরণ সব কহি দ্বিজবর।
সেই মৎস্য মুণ্ড দিল রাজার গোচর॥
কোথা বা শিশুর মুণ্ড দেখিতে না পায়।
মৎস্যমুণ্ড দেখি রাজা ভাবিতেছে উপায়॥
শনির অদ্ভুত কার্য্য বুঝিয়া নিশ্চয়।
দেখাইতে রবিসুত বিপ্রপাশে কয়॥
এত শুনি দ্বিজ পুনঃ স্তব আরম্ভিল।
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি সাক্ষাত হইল॥

বিপ্রের কৃপায় রাজার পাইয়া দরশন ।
নানা দ্রব্য দিয়া পূজে গ্রহ নারায়ণ ॥
বহু রত্ন ধন দিয়া ব্রাহ্মণের পায় ।
আশীর্ব্বাদ কর বলি করিল বিদায় ॥ ১১৫
শণির কৃপায় বিপ্রের দুঃখ গেল দূর ।
মৎস্যমুণ্ড ধন সহ গেল নিজ পুর ॥
শণির কর্ত্তব্য কার্য্য পত্নীকে কহিল ।
শনিবার পাইয়া শণির পূজা আরম্ভিল ॥
সন্ধ্যাকালে আটা রম্ভা শর্করাদি যত ।
নৈবিদ্য তাম্বুল দুগ্ধ দিল রাশীকৃত ॥
ফল ফুল ধূপ দীপ যতনে সাজায় ।
প্রতিবাসী সবে আসি দেখিবারে পায় ॥
কৃত সাধ্যে ভক্তিভাবে পূজিছে ব্রাহ্মণ ।
পূজা সমাপনে করে পাচালি পঠন ॥ ১২০
প্রণমিয়া সর্ব্বলোকে প্রসাদ পাইল ।
তদবধি দ্বিজবরের ঐশ্বর্য্য বাড়িল ॥
এইরূপে পূজা করে প্রতি শনিবার ।
পুত্র কন্যা হইল দ্বিজের ঐশ্বর্য্য অপার ॥
শণির প্রভাবে দেখি এক ডোম নারী ।
মানস করিল সেই স্তুতি ভক্তি করি ॥
আমার দুহিতা সহ সাধু সদাগরে ।
বিবাহ হইলে শণি পূজিব সত্বরে ॥
শণির কর্ত্তব্য কার্য্য অতীব অদ্ভুত ।
বাণিজ্যে আইল এক সদাগর সুত ॥ ১২৫
বিবাহ করিআ সেই ডোমের কুমারী ।
বাণিজ্যে চলিল পুনঃ শুভদিন করি ॥
শণি পূজা করিবারে শাশুড়ি কহিল ।
বাণিজ্যে পূজিব বলি সাধু চলি গেল ॥

দক্ষিণ রাজার দেশে হইল উপনীত।
বিকি কিনি করে সদা রাজার বিদিত॥
বহু বিধ লভ্য হয় ধনরত্ন হার।
নাহি পূজি শনৈশ্চর সদা অহঙ্কার॥
দেখিয়া সাধুর রীতি শনি কোপে জ্বলে।
নিশি যোগে রাজাকে বলিল স্বপ্নছলে॥১৩০
তব ভাণ্ডারের সব চুনি মুক্তা ধন।
চুরি করি নিয়া যায় সাধু মহাজন॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কহে কোটালেতে।
সদাগর বান্ধি আনো আমার সাক্ষাতে॥
আজ্ঞামাত্র সদাগর বান্ধিআ আনিলো।
কারাগারে রাখিবারে রাজা আজ্ঞা দিল।
কান্দিয়া সাধুর সুত বন্দী ঘরে যায়।
মনে ভাবে শনির সেবার আছি দায়॥
এত ভাবি শনৈশ্চর করে আরাধন।
বন্ধন মোচন কর পূজিব চরণ॥ ১৩৫
অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু নিজদাসে।
তব পূজা করি নৌকা ভাসাইব দেশে॥
তুষ্ঠ হইআ শনি পুনঃ ভূপে আদেশিল।
সাধু সুত চোর নয় মম কোপ ছিল॥
স্বপ্ন দেখি করে রাজা সাধুকে বিদায়।
পূজা করি সদাগর নিজ বাসে যায়॥
শাশুড়িকে প্রণামিয়া ধন ঘরে নিল।
বহুবিধ মতে তবে শনিকে পূজিল।
এই মতে শনি পূজা যেই জনে করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দূরে॥ ১৪০
অভক্তের যম প্রভু ভক্তেরে দয়াময়।
পূজিলে শনির পদ নাহি কোন ভয়॥

সূর্য্যসুত শণি পদ ভাবি চিরকাল।
রচিল পাঁচালি ছন্দ শ্রীরাম দয়াল॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষণ॥ ১৪৩

"শণির পাঁচালী সমাপ্তঃ দুঃখেন লিখিত গ্রহস্ত চোরেন নিয়তা জদি সুকার তস্য মাতা চ পিতা তস্য সগর্দ্দব॥ শ্রীযুক্ত গিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি সোয়ক্ষরং শ্রীস্বরেসতি মাতরং॥"*

আবদুল করিম।

মাধুরী।

(৭)

অনুপমা মাধুরীর নিকট মুরলী সম্বন্ধে সকল কথা শুনিল বটে কিন্তু সে একথা বিশ্বাস করিতে পারিল না যে মাধুরীর বজরায় আগমনের সহিত মুরলীর কোনও সংশ্রব আছে। অনুপমা যখন তাহাকে স্বামীর সহিত বজরার প্রকোষ্ঠে দেখিয়াছিল তখন তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ দেখিয়া তাহার স্পষ্ট বিশ্বাস লইল যে মাধুরীর বজরায় অবস্থিতির কথা মুরলী সেই দিবস প্রথম জানিতে পারিয়াছিল। তবে কি যুবক সমস্ত ভান করিল? তাহা-দিগকে আপনার নির্দ্দোষিতা দেখাইবার জন্য এরূপ নিরীহ ভাব ধারণ করিল? না, তাহাত সম্ভবপর নহে। নিশ্চয় মুরলী নির্দ্দোষী।

এ সমস্যা ভঞ্জনের জন্য সেই ঘটনার দুই এক দিন পরে অনুপমা শ্যামাকে বলিলেন, বাবুকে একবার ডাকিয়া আন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বভাবতঃ বারনারীরত হইলেও বিজনবিহারী স্ত্রীকে অবমাননা বা লাঞ্ছনা

* বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি আনোয়ারাবাসী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। লেখক।

জ্ঞানতঃ করিত না। আপনার অট্টালিকার একপার্শ্বে রক্ষিতা বারবিলাসিনী রাখিয়া দিলে যে স্ত্রী অবমানিতা হইতে পারে তাহা তাহার মনে হইত না বা তাহার স্ত্রীও তাহাতে প্রকাশ্যে কোনও আপত্তি করিত না। অনুপমা যখন যাহা অনুরোধ করিত বিজনবিহারী তাহারই ব্যবস্থা করিত বটে কিন্তু স্বয়ং কখনও স্ত্রীর নিকট অধিকক্ষণ থাকিত না। যখন থাকিত তখন তাহার মিষ্ট কথা শুনিলে হঠাৎ অজ্ঞ লোকও ধারণা করিতে পারিত যে এরূপ দয়ালু স্বামী কলিযুগে দর্শন পাওয়া দুরূহ। যাহা হউক, অনুপমার আহ্বানে বিজনবিহারী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কম্পিতা মাধুরী বজরার স্ত্রীলোকদিগের অংশের অপর একটি ক্ষুদ্র কামরায় লুকাইয়া রহিল।

বিজনবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল—"স্মরণ করিয়াছ কেন?"

অনুপমাও ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। আজ তেরদিন তোমার সহিত যে যুবকটিকে দেখিতেছি ওটি কে?"

বিজনবিহারী বলিল, "কেন উহার বিষয় এত কথা জানিয়া তোমার লাভ কি?"

বিজনবিহারীর মুখে একটা জঘন্য উত্তর আসিতেছিল, সে সামলাইয়া লইয়া আদ্যোপান্ত মুরলীর ইতিহাস বিবৃত করিল। পার্শ্বের গৃহে মাধুরী এ সকল কথা শুনিতে পায় নাই, হয়ত ইচ্ছা করিলে শুনিতে পাইত কিন্তু সে জানিত দম্পতীর গুপ্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করা অন্যায়।

অনুপমা হাসিয়া বলিল, "উহার বুদ্ধি দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছি। যুবক যখন দেখিল তাহার দেশে থাকা অসম্ভব, তখন আপনি আসিল, আর যে বালিকাটির উপর চক্ষু ছিল তাহাকেও তোমার সাহায্যে সঙ্গে লইয়া আসিল।"

বিজনবিহারী বলিল, "না না, এ কথা তোমাকে কে বলিল? ও বালিকা এখানে থাকে তাহা যুবক অষ্টমীর পূর্ব্বে আদৌ জানিত না।"

অনুপমা জানিত স্বামী সত্য কহিতে ভয় করে না। তাহার বিশ্বাস হইল মুরলী মাধুরী হরণ ব্যাপারে নির্দ্দোষী।

মাধুরীকে বজরায় দেখিয়া ও বিজনবিহারীর তৎসম্বন্ধীয় অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহার প্রভুর উপর মুরলীর যে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল

খানিকক্ষণ স্থির চিন্তার পর সে তাহা সযত্নে হৃদয়মধ্যে গোপন করিয়া রাখিল। সে দেখিল এখন বিজনবিহারীর বিশ্বাসী হইতে পারিলে মাধুরীর পরিত্রাণ বিষয়ে সে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে। মাধুরীর পরিত্রাণ? কেন তাহার বংশের শত্রু ধনপতি সিংহের, উপকার করিয়া তাহার লাভ কি। তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসা বৃত্তি তাহাকে একবার বলিল, না না, তোমার কি মাথাব্যথা। তুমি কেন উহার উপকার করিতে যাইবে? কিন্তু যে স্বভাবতঃ মহৎ তাহার হৃদয়ে সুবুদ্ধিই চিরকাল জয়ী হইয়া থাকে। তাই মুরলী স্থির করিল সতীর সতীত্ব রক্ষা করা হিন্দুর ধর্ম্মের অংশ, ইহাতে শত্রুর উপকার করা হয় তাহা হউক, বৈর নির্য্যাতনের অন্য অনেক উপায় আছে।

কক্ষান্তরে মাধুরীকে যখন অনুপমা বুঝাইয়া দিল যে তাহার অনিষ্টের সহিত মুরলীমোহনের কোনও সংস্রব নাই এবং মাধুরীর উদ্ধারের জন্য, ভগবানই তাহাকে বিজনবিহারীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তখন মাধুরীর ক্রোধ কিয়দ্-পরিমাণে হ্রাস হইল বটে কিন্তু সে তাহার দ্বারা উদ্ধারের সম্ভাবনাকে ঈশ্বরদত্ত মুক্তির উপায় বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। ফল কথা তাহাদের উভয়ের পরিবার মধ্যে মনোমালিন্য থাকা হেতু মাধুরী তাহাকে দেখিতে পারিত না। বিজনবিহারীর হস্ত হইতে তাহার হস্তে পড়া, এক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অপর এক বিপদের হস্তে পতিত হওয়া মাত্র। আর প্রথমতঃ সেই বা তাহাকে উদ্ধার করিতে সম্মত হইবে কেন? আর সম্মত হইলেই বা সে তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইবে কেন? মাধুরী ভাবিল, এখানে তবুও অনুপমার সহায়তা লাভের অনেকটা আশা আছে।

(৮)

ইস্‌লামবাগে পৌঁছিয়াই বিজনবিহারী দেখিল নবাব সরফরাজ খাঁর নিকট হইতে পরওয়ানা আসিয়াছে, বিশেষ কার্য্যবশতঃ নবাব বাহাদুর তাঁহাকে তলব করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ প্রকার তলব সে সময় সমস্ত ক্ষমতাবান জমিদারই পাইয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃঃ নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ মুর্শীদাবাদের নবাব হইলেন। দিল্লী সম্রাট কিন্তু এ নিয়োগে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আলিবর্দ্দী

খাঁকে একখানি সনন্দ দিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসন ভার প্রদান করিলেন। যখন সুরফরাজ খাঁ সংবাদ পাইলেন আলীবর্দ্দী খাঁ বাদসাহের সনন্দ লইয়া একদল সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছেন তখন তিনি ভাবিলেন যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া একেবারে সিংহাসন ত্যাগ করা হইতে পারে না। সুতরাং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত জমীদারদিগকে মুর্শীদাবাদে একত্রিত করিলেন। বলা বাহুল্য, নবাবের পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়া বিজনবিহারী ইসলামবাগে অবস্থান না করিয়াই মুর্শীদাবাদে ছুটিল। যাইবার সময় একবার বলিল, মুরলা তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে। কিন্তু তাহার পর মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, কাজ নাই, তুমি এখানে কাজ কর্ম্ম শিক্ষা কর।

বিজনবিহারী যাইবার সময় তাহার বিশ্বস্ত একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে মাধুরী তাঁহার বিলাস মন্দিরে অবস্থান করিবে। অনুপমা কিন্তু সে হুকুম গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি তাহাকে নিজ মহলে রাখিয়াছিলেন। তাহাদের পঁহুছিবার ৫।৭ দিন পরে একদিন অনুপমা বলিল—মাধুরী এই সুযোগে এক্ষণে যদি পলাইতে পার তাহা হইলেই পারিবে, নচেৎ চিরকাল এখানে বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইবে।

মাধুরী বলিল, তুমি বন্দোবস্ত করিয়া দাও।

অনুপমা—আমি এ সকল বন্দোবস্ত করিতে পারিব না। আমার প্রভুর ক্রোধে পতিত হইবার ভয়ে এখানকার কোনও ভৃত্য এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যিনি করিবেন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়।

মাধুরী—তবে কি হবে?

অনুপমা—কেন মুরলাকে বলিয়া দেখি যদি সম্মত করিতে পারি। তাহা ভিন্ন আর অন্য উপায় দেখি না।

মাধুরী—মুরলীর সহিত পলায়ন করিতে হইবে? যাহাদের সহিত চিরদিনের শত্রুতা তাহারা কখনও কি আমাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবে? এ কথা অসম্ভব। ইহা অপেক্ষা আপনার আশ্রয়ই শ্রেয়ঃ।

অনুপমা হতাশ হইয়া বলিলেন, তবে তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক। অনুপমা বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল বিধিলিপির বিপরীত কার্য্য করি,সামান্যা

স্ত্রীলোক এমন ক্ষমতা আমার নাই। চেষ্টা করিব স্বামী যাহাতে বালিকাকে সুখে রাখিতে পারে। স্বামীর কন্দর্পবিনিন্দিত শ্রী দেখিয়া কি মাধুরী তাহার উপর আকৃষ্ট হইয়াছে? তাহাই হইবে। তাহাতে আমার কি প্রয়োজন?

মুরলীমোহনের কথাবার্ত্তায়, তাহার সরল আচরণে সহজেই লোকে মুগ্ধ হইতে পারিত। অল্পদিন ইস্‌লামবাগে থাকিয়াই তাই মুরলী-মোহন সকলের সহিত বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল। সকলেই তাহাকে আদর করিত, সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত। অবশ্য যে প্রভুর প্রিয় তাহাকে যত্ন করিলে প্রভুরও প্রিয় হওয়া যায় একথা যে বিজনবিহারীর কর্ম্মচারীদিগের মনে ছিল না তাহা বলিতে চাহিনা, কিন্তু তাহা হইলেও মুরলীর আচরণে মুগ্ধ হইয়াও অনেকে তাহাকে ভাল বাসিত।

তখনও প্রকৃতি সাজসজ্জা করে নাই, তখনও গাছের ঝোঁপগুলিতে অন্ধকার লুকাইয়া ছিল, নদীর জল নাচিতেছিল বটে কিন্তু তখনও তাহার দেহটীতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় নাই। তখন পাখিগুলির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তাহারা অলস ভাবে গ্রীবা বাড়াইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল এবং প্রভাতে-সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মুরলীর এই সময় নদীর তীরে ভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল। সে এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল।

আজ পক্ষাধিক কাল মুরলী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, এই সময়ের মধ্যে কি ধনপতি তাহার মাতা ও অগ্রজের সহিত কোনরূপ কলহ করিতে-ছিল? না, এখন উভয় পরিবারই বিপদগ্রস্ত—হয়ত প্রিয়জন বিরহে কাতর হইয়া উভয় পরিবারে সংস্থাপিত সদ্ভাব তাহাত হইয়াছে। না, সদ্ভাব ত হইবার নয়। আচ্ছা আমি যদি ধনপতি কন্যাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারি? উদ্ধারই বা করিব কি প্রকারে? এতদূর হইতে অজানা পথে যুবতী সমভিব্যাহারে ভ্রমণই বা করিব কি প্রকারে?

যখন মুরলীমোহন ভাবিতেছিল, তখন পূর্ব্বগগন ক্রমশঃ লোহিতবর্ণ ধারণ করিতেছিল। আলো দেখিয়া পাখিগুলা ডানা ঝাড়িয়া একটু উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কতপাখী ডাকিয়া উঠিল, কতগরু কত গোশাবক প্রভাতে গলা ছাড়িয়া বিকট গান গাহিল, কুকুর ডাকিল, নদী বহিতেছিল, এইরূপে মধুরে কর্কশে কোকিলের ঝঙ্কারে, বায়সের রবে, মাছরাঙার শব্দে ও দোয়েলের নবীন উৎসাহ-

ময় তানে পৃথিবী পুরিয়া উঠিল। মুরলী দেখিল পলায়নের এক উপায় আছে। যদি কোনও সওদাগরী নৌকার আশ্রয় লইয়া পলাইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলেই সুবিধা। কিন্তু তাহাতে অর্থের আবশ্যক। তাহার পর মাধুরীকেই বা অন্দরমহল হইতে কাহার সাহায্যে লইয়া আসিব? কেন শ্যামাদাসী দেখিতে বুদ্ধিমতী, তাহার দ্বারা প্রথমে সকল কথা ঠিক করিয়া রাখিতে ক্ষতি কি? তাহার পর যাহা হয় দেখিব।

ঠিক সেই সময় ম্লানমুখী মাধুরীও একাকিনী গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া ভাগীরথীর হিল্লোল দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল, তাইত পিতাকে কোনরূপে সংবাদ দেওয়া যায় না? অনুপমা আমার উপর যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে তিনিও কি পিতার নিকট কোন সমাচার প্রেরণ করিতে পারেন না। আর খবর পাইলেই বা পিতা করিবেন কি? এই সুরক্ষিত অট্টালিকার ভিতর হইতে পিতা আমায় কি প্রকারেই বা লইয়া যাইবেন? কিন্তু এস্থলে আর কতদিন থাকিব, দুষ্ট বিজনবিহারী প্রত্যাগত হইলে তখন ত আত্মরক্ষা করা দায় হইবে।

(৯)

এক একটি সময় আছে, এক একটি অবস্থা আছে যখন পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। নবদ্বীপে দুহিতার সংবাদ পাইতে আসিয়া ধনপতিসিংহ যেরূপ দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহাতে তাহারও হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছিল। কতক আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা প্রয়াসে, কতক সেই করুণ দৃশ্যে অভিভূত হইয়া এবং বিশেষ মাতৃহীনা সেই রোরুদ্যমানা বালিকার কাতরোক্তি শুনিয়া ধনপতি সেই দিন বৃদ্ধার সৎকার কার্য্যে এবং তাহার পর তাহার পুত্রকন্যাকে আশ্বাস দিয়া, তাহাদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছিল। ধনপতিসিংহের এরূপ কারুণিকতা দর্শন করিয়া অনেকে বলিয়াছিল বিপিনকৃষ্ণের বেশ সম্পত্তি ছিল একথা জানিতে পারিয়া সে তাহার উপকার করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ইহা নিন্দুকদিগের নীচবাক্য।

বিপিনকৃষ্ণের ভ্রাতাই দেশে থাকিয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। বিপিনের অগ্রজ মন্দলোক ছিলেন না, তবে তাঁহার প্রধান দুর্ব্বলতা ছিল

এই যে, তিনি বড়ই স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও মুখরা, এতৎ কারণে তাঁহার মাতা তাঁহার উপর প্রসন্না ছিলেন না। একদিন পুত্রবধূর সহিত কলহ করিয়া তাঁহার জননী কন্যাটি সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে বিপিনকৃষ্ণের নিকট চলিয়া আসিলেন।

বিপিনকৃষ্ণ অত্যন্ত মেধাবী ছিল। সে নবদ্বীপে প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট ন্যায়াধ্যয়ন করিতেন। মাতা পুত্রী তথায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর বিপিনকৃষ্ণ ধনপতি সিংহকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। ধনপতি তাহার বংশ পরিচয় পাইয়া এবং তাহার স্বভাব ও বিদ্যাতে মুগ্ধ হইয়া ভাবিলেন—বিধাতা আজ যদি আমার কন্যা গৃহে থাকিত তাহা হইলে এমন সুন্দর যুবকটিকে জামাতা করিয়া কত আনন্দ পাইতাম। কিন্তু মনুষ্য যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা যদি সকল সময় পাইত তাহা হইলে এ পৃথিবী স্বর্গ হইয়া যাইত।

ললিতমোহনের শ্বশুর শিবেন্দ্র বসু ধনপতি সিংহের সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া জামাতাকে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাহাকে ও তাহার মাতাকে সহসা গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেন নাই। মুরলীর সংবাদ পাইলে, মুরলী ফিরিয়া আসিলে, দুই ভাই একত্রে দেশে গিয়া অবস্থান করে শিবেন্দ্রের এই ইচ্ছা। কি জানি মন্দলোক অসহায় যুবককে অনেক বিপথে ফেলিতে পারে, সুতরাং আর কিছু দিন ললিতের শ্বশুরবাড়ী থাকিতে দোষ কি? তাহারা ত তাহার অনুগ্রহজীবি নহে। এমন ত আত্মীয়ের বাটীতে লোকে থাকে, তাহাতে লজ্জা কি? এ বন্দোবস্তে অবশ্য ললিত সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী মাধবী ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছিল। একসঙ্গে পিতৃগৃহে বাসসুখ কি বিশেষ পুণ্য না করিলে অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? সুতরাং মাধবীর যথাসম্ভব সুখ হইয়াছিল। সে ভাবিত ইহার উপর যদ্যপি মাহেশপুরে ঠাকুরপো থাকিত!

ধনপতি সিংহের গৃহিণী বিষণ্ণবদনে কত ঠাকুর দেবতার পূজার মানসিক করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। একদিন তিনি স্পষ্টই কর্ত্তাকে বলি —তোমার পাপেই ত আমাদের এরূপ সর্ব্বনাশ হইল তুমি যদি মুরলীদের উত্তেজিত না করিতে, তুমি যদি বিধবার পতির ঋণের জন্য সর্ব্বদা তাহার

সহিত কলহ বিবাদ না করিতে, তুমি যদি মুরলীকে শত্রু না করিতে তাহা হইলে ত এরূপ ঘটিত না। কি কুক্ষণেই তুমি তাহার সহিত কলহ করিয়াছিলে!

ধনপতি ও বুঝিত। এক একবার ভাবিত এই ঐশ্বর্য্য, এই সব বিভব কাহার জন্য করিতেছি? প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া তাহার চক্ষুজল পরিবর্দ্ধিত শস্য হইতে আমার নিজ অংশ লইয়া তাহাকে ও তাহার পরিবারকে অনশনে রাখিয়া, অধর্ম্ম উপার্জ্জন দ্বারা এত ধন সঞ্চয় করিতেছি কিসের জন্য? মুখে সে যতই মিষ্টবাক্য বলুক আমার শত্রুর সংখ্যা বাস্তবিকই অনেক। এই ত এক শত্রু বৈরনির্য্যাতন করিয়া আমায় নয়নজলে ভাসাইয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে কলা অপর কেহ আমার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিবে না। ধনপতি সিংহ একথা এক একবার চিন্তা করিত বটে কিন্তু "স্বভাবঃ মূর্দ্ধি বর্ত্ততে।" ধনপতি সিংহের মনে যে একথা সময়ে সময়ে উত্থাপিত হইত বটে কিন্তু তাহার বাহ্যিক আচরণ দেখিলে বড় বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যাইত না।

ক্রমশঃ।

রাঠোর বালক।

ষষ্ঠ সর্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেখিল সৈনিকদল—নিশ্চল নির্ব্বাক--
হৃদয়ে আরাধ্যা দেবী নয়নের তারা—
স্নেহের কুসুম ফুল্ল ধরার মন্দার—
ভস্মীভূত একে একে, অনল উত্তাপে—
স্নেহ প্রস্রবণ মুক্ত—মন্দাকিনী ধারা
শুকাইল চিরতরে। দেখিল নীরবে
সংসারের মরুভূমে যে কয়টী তরু—
যার তলে, শ্যামচ্ছায়ে, ক্লান্তি অবসাদে—
ধরায় ত্রিদিব সম লভিত বিশ্রাম
সর্ব্বধ্বংসী হুতাশন সমূলে ধ্বংসিল।

দেখিল গগনপথে অনন্ত আকাশ—
দূরে দূরে মিশিয়াছে—দিগন্তের সনে—
শূন্য শূন্য মহাশূন্য—বেষ্টিয়া মেদিনী
অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, এক হাহা বিজড়িত!
সম্মুখে দুর্গের কক্ষ পরিত্যক্ত গেহ
কত দিন কি আনন্দে স্ব-জন বেষ্টিত
স্নেহে, প্রেমে, আশীর্ব্বাদে—করিল যাপন
এবে শুধু শূন্যময়—কিছু নাই আর
হৃদিবীণে নিশি নিশি সে কম ঝঙ্কার
অবসান চিরতরে—ছিন্ন ভিন্ন তার।

একটী মৃগের শিশু নাচিতে নাচিতে—
চন্দনের অতিপ্রিয়—আসিল নিকটে
কোষস্থিত তরবারি করি আকর্ষণ—
দ্বিখণ্ডিত করি তারে, কহিল বালক—
"মৃত্যু ভাল মৃগ তোর" যবনের দানে—
আমার পালিত তুই—হবিনা বর্দ্ধিত"।
কয় বার পদ মৃগ করি সঞ্চালন
অর্দ্ধস্ফুট স্বর কণ্ঠে—ত্যজিল জীবন
সেনাপতি দৃঢ়হস্ত হইল শিথিল
নেত্র তার কয় বিন্দু করিল বর্ষণ।

ক্ষণেক রহিল স্তব্ধ, প্রকৃতি নীরব—
যথা সৃষ্টি মহাবায়ু অবসান শেষে—
নিরথয়ে স্বীয় কীর্ত্তি ভগ্ন বৃক্ষ চূড়া—
বিধ্বস্তঃ সে মহীতল ছিন্ন ভিন্ন ধরা—
তার পর সুগম্ভীরে অরিসিংহ স্বর
ধ্বনিল জীমূতমন্দ্রে—"আর কেন বীর!
কেন এ শ্মশান ভূমে? দিয়াছি ত সব—
মাতৃ পূজা হেমানলে—এবে এস ভাই!
পূর্ণাহুতি দেহদানে করি সমাপন
স্রষ্টার সে পুণ্য ইচ্ছা হউক পূরণ!

এস এস যোদ্ধাবর্গ! এস ভ্রাতৃগণ!
জননীর পাশে যাচি অন্তিম প্রার্থনা

প্রাণের এ অতি তীব্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা
পুরিলনা এই জন্মে। ঘৃণ্য ম্লেচ্ছকরে—
গরিয়সী জন্মভূমি করি সমর্পণ
যেতে হল ধরা ত্যজি। যবন দানব করে
পৃথ্বিতলে এ অমরা দিনু বিসর্জ্জন!
এই বর দেমা শিবে! যেন জন্মান্তরে
এই দেশে জন্ম লভি বিচুরি যবনে—
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই পারিগো মিটাতে।"

দুইশত রাজপুত কহিল আবেগে
"এই বর দেমা শিবে! যেন জন্মান্তরে
এই দেশে জন্ম লভি বিচুরি যবনে
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই পারিগো মিটাতে!"
সে প্রার্থনা প্রতিধ্বনি—পবনে পবনে
হাহাময় শূন্যদেশে—দেবীর মন্দিরে—
সাগর গর্জ্জনসম হইল ধ্বনিত—
তারপর স্তরে স্তরে আরও উর্দ্ধে উঠি
কোন দেশ লক্ষ্য করি নীল নভঃপথে
ধীরে অগ্রসরি গেল কাহার উদ্দেশে!

বন্ধুবর্গে, পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়—
মরণের উপকূলে শেষ আলিঙ্গন—
মোহন মদিরাময় স্পর্শ অনুভূতি
নীরবে নীরবে হায় হল সমাপন!
অনন্তর দুর্গদ্বার করি উদ্ঘাটন
"হর হর মহাদেও" বদনে হুঙ্কারি
আক্রমিল শত্রুদলে দুই শতবীর
উলঙ্গি শাণিত খড়্গ উত্তোলি বরষা—
শতেক বন্যার স্রোত যথা জনপদে—
কিম্বা বজ্রাঘাত, শত হইল বিপিনে!

অসংখ্য যবন বধি রাঠোর সৈনিক
একে একে রণভূমে করিল শয়ন—
রাখিয়া অনন্ত স্মৃতি অনন্ত হৃদয়ে—
আভাময়, তেজস্মান, অক্ষয়, অব্যয়—
ধরাতলে পুণ্যকীর্ত্তি জাতীয় গৌরব

যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রহিবে কাহিনী
যত দিন রবে নর করিবে কীর্ত্তন—
প্রতিগৃহে প্রতিদেশে পর্ব্বতে মন্দিরে।
দিল্লির যবন রাজা কয় দিন তরে
জনশূন্য মরুদেশ করিল শাসন।

সমাপ্ত।

শ্রীউমাচরণ ধর।

কবিতা-কুঞ্জ।

আহ্বান।

জীবন-মরুভূ মাঝে সাবধানে আয় চলে
শান্তির আলোক কুঞ্জে আঁধার জীবন তলে!
অনন্ত-বিস্তৃত ছায়া যদি কভু তোরে ঘিরে,
ঢেকে ফেলে হৃদিটুকু ভয়ে নাহি চাস্ ফিরে!
অসার কণ্টক যদি বিঁধে তোর পায় পায়,
সুখের প্রদীপ যদি বার বার নিভে যায়,
অবসন্ন হিয়া যদি অপূর্ণ বাসনা-ভরে,
কাঁদিয়ে না চাস্ ফিরে, হতাশে যাস্ না দূরে!
স্পন্দহীন, শব্দহীন নিরানন্দ ভাষাহীন
গম্ভীর নীলিমা যদি শূন্যে জাগে রাতিদিন,
তারো কোলে শত তারা কত গান গেয়ে যায়,
তাদের হাসির স্রোত ছায়াপথে বহে যায়!
গম্ভীর সংসার-কোলে ধর্ম্মের সে ছায়াপথে
কত তারা উজলিবে সেই পথ দূর হতে!
জীবন-সঙ্গিনী মোর, আয় মোর সাথে চলে
শান্তির আলোক-কুঞ্জে আধার জীবনতলে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

তুমি সর্ব্বময়।

ঝঞ্ঝাবাতে বজ্রাঘাতে
পবন বিজলী সাথে
প্রকৃতির ভীমখেলা
বিশ্ব বিনাশন!

তারি মাঝে তুমি কেন
অভয় দিতেছ হেন
প্রিয় দরশন?

আবার গো মরুভূমে
আচ্ছন্ন বালুকাধূমে
আন্দোলিত ক্ষিতি ব্যোমে
তাণ্ডব নর্ত্তন,

তারি মাঝে দূর্ব্বাদল
তব মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল
হৃদয় নন্দন!

সফেন ভীষণ জল
ঘূর্ণিপাকে ঢেউদল
এই ডোবে এই ডোবে
জীর্ণ ভগ্ন তরি—

অনুকূল বায়ু হয়ে
কোথা হতে এলে ধেয়ে
দয়াময় হরি?

মৃত্যু ঘোর অন্ধকার
ঘেরিয়াছে চারিধার
এই নিভে এই নিভে
জীবন আলোক—

এখনও দয়াময়!
তব মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়
পুরিল দ্যুলোক!

শ্রীউমাচরণ ধর।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা।*

জাহ্নবী।—পৌষ, ১৩১১। "নববধূর প্রার্থনা"—একটী কবিতা, জাহ্নবী-সম্পাদকের শুভ পরিণয়োপলক্ষে জাহ্নবীর অঙ্কে স্থান পাইয়াছে—আমরাও নব দম্পতীর শুভাকাঙ্ক্ষী। "প্রপঞ্চ"—প্রবন্ধটী গবেষণাপূর্ণ। "ছদ্মবেশী"—সেই কৌতুকাবহ ডিটেক্‌টীভ্ গল্পটী বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। সাধারণে ইহা পাঠে বেশ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। "সন্ধ্যায়"—শীর্ষক কবিতাটী মর্ম্মস্পর্শী। "লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ"—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায়, বর্দ্ধমান হইতে মেল গাড়ী ছাড়িল—লেখক অনেক কষ্টে মোগলসরাই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলে পুনরায় "ক্রমশঃ" লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। "রূপতৃষ্ণা" চলনসই কবিতা। "আমিত্ব-লোপ" শীর্ষক কবিতাটী ভক্তকবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন বিরচিত।

প্রকৃতি।—কার্ত্তিক, ১৩১১। "পূর্ণাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ"—ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ—সুন্দর যুক্তি-পূর্ণ; আমাদের বড় ভাল লাগিল।" ভুল" (গল্প)—গল্পটিতে নূতনত্ব ত কিছু পাইলাম না। "ফুল ভাসান" ও "ছল"—দুইটী কবিতাই চলনসই, তবে শেষোক্ত কবিতায় "ঙ্গ"র ছড়া ছড়িটা বড় বেশী রকমই হইয়াছে। "বাসুদেব সার্ব্বভৌম"—তাঁহার জীবনের যে কথাগুলি ও ঘটনাগুলি আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র—"অলস-চিন্তা" (প্রবন্ধ) লেখার বেশ বাঁধুনী আছে, পাঠে পরিতৃপ্ত হইলাম।

নববিকাশ।—পৌষ, ১৩১১। "শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাধাম"—রেলওয়ে টাইম্ টেবল্ (Time Table) পাঠে ও সামান্য দুই একটী জনশ্রুতি শ্রবণে আমরা শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ও মথুরাধামের যে বিবরণ জানিতে পারি, ইহাতে তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল না। "ভিক্ষুগীতা"—সারগর্ভ প্রবন্ধ। "বুদ্ধ ও বাইবেল" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত বাইবেলের কিরূপ সামঞ্জস্য তাহাই দেখাইতেছেন। "আদর্শ ও উদ্বোধন" প্রবন্ধটী যুক্তিপূর্ণ। কবিতার মধ্যে" ক্ষুদ্র কিছু নয়" শীর্ষক কবিতাটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। "অভিশাপ" কবিতাটী চলনসই। "মিলনে" কবিতায় কবি গাহিয়াছেন— "হায় এ সকল শুধু, শুধুই ছেলেমি
এ ছাড়া কিছুই নয়।"

এই কবিতাটীর উদ্দেশ্যে কবির উক্তিই প্রযোজ্য।

নবনূর।—পৌষ ১৩১১। বর্ত্তমান সংখ্যায় "ঈদ", শীর্ষক কবিতাটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। "ঋষিকল্প ফজিল আয়াজ"—ফজিল আয়াজের দস্যুজীবন হইতে সাধু জীবনে পরিবর্ত্তনের একটী আখ্যায়িকা। "তরুলতা" গাথা; মন্দ নহে। "মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত"—ক্রমশঃ চলিতেছে। "কাঞ্চনজঙ্ঘা কবিতা"—মন্দ নহে। "বাঁদী ও স্ত্রী" (গল্প) এমন অসংলগ্ন ও অস্বাভাবিক গল্প আমরা খুব কমই পাঠ করিয়াছি। এরূপ গল্প প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। "জুলী" কবিতাটী ভাল লাগিল না।

---

* স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এবার অনেকগুলি মাসিক পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অঃ সং।